শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

প্রথম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—
মহেশ লাইব্রেরী।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা।
ও অন্যান্য ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীকালীপদ মৈত্র
৭৭, যতীন দাস রোড,
কলিকাতা-২৯

মূল্য চারি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

১।	প্রস্তাবনা	...	...	।/০
২।	স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র (পূর্ব্বাংশ)	...	...	১
৩।	স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র (শেষাংশ)	...	...	৩৫
৪।	স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র	...	...	৬২
৫।	জপ	...	...	৮৫
৬।	জপ-রহস্য	...	...	৯৩
৭।	শেষে দুটো গোড়ার কথা	...	...	১২০
৮।	শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্	...	...	১২৫
৯।	উপোদ্ঘাতঃ	...	...	১৩৩
১০।	জপসূত্রোপক্রমণী	...	...	২০২
১১।	জপসূত্রম্	...	...	২২৭

প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা

যে অভিনব গ্রন্থের প্রকাশনে আমরা ব্রতী হইয়াছি, তাহার ভূমিকার কিছু প্রয়োজন নাই। মূল গ্রন্থের বিস্তারিত ভূমিকারূপে পূজ্যপাদ স্বামিজীরই জপ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ একত্র সংকলিত করিয়া নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তবুও গ্রন্থের অভিনবত্বের দরুণ পাঠকবর্গের কাছে ইহা দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় মনে হইতে পারে ভাবিয়াই মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এখানে দু চার কথা বলার চেষ্টা করা যাইতেছে। এখানে এত বিভিন্ন বিচিত্র ও গভীর বিষয়ের সমাবেশ ও অবতারণা করা হইয়াছে যে মূল চিন্তাধারার সন্ধান না পাইলে অনেকেই লক্ষ্যে 'অপারগ' হইয়া পড়িতে পারেন। এজন্য সংক্ষেপে সেই মূল ধারাটির অনুসরণের বা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যাইতেছে।

গ্রন্থের নামকরণ হইতেই ইহা সুস্পষ্ট যে ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে—জপ। অধ্যাত্মসাধনার গতি বহুমুখী ও বিচিত্র হইলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের পরস্পর বিরোধিতা থাকিলেও কোনো ধর্ম্মমতই এই জপরূপ মহাকর্ম্মকে পরিত্যাগ বা অবহেলা করিতে পারেন নাই। ইহা সকল সাধনারই অপরিহার্য অঙ্গরূপে চিরদিন গৃহীত ও সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দু-সাধনার ইহাই মূল ভিত্তি। এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে এই যে জপরূপ সনাতন সাধনধারা, এ তো চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, নানা সাধক মহাজন ইহার অনুশীলনে তৎপর হইয়াছেন, সিদ্ধির শিখরে উঠিয়া কৃতার্থতাও লাভ করিয়াছেন,—তবে এ বিষয় লইয়া এরূপ বিশাল গ্রন্থের অবতারণার কি প্রয়োজন পড়িল? প্রয়োজন—এই চির-প্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত জপরূপ অনুষ্ঠানের যাহা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য তৎসম্বন্ধে আমাদের যে গভীর অজ্ঞতা সেটি দূর করা। এই গ্রন্থ

লেখার প্রেরণা এইজন্যই জাগিয়াছে যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় এই পরম প্রয়োজনীয় ও রহস্যময় কর্ম্মটি সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতা বিদ্যমান। জপ বলিতে কি বুঝায়, কিভাবে জপ করিতে হয়, কেমন করিলে জপ যথার্থ 'সমর্থ' বা ফলবান্ হয়, কেনই বা সাধারণতঃ জপাদি করিয়া কোনো ফল বুঝা যায়না—এ সব বিষয়ে আমাদের কোনো অনুসন্ধানই করা হয়না, এমন কি যথার্থ জিজ্ঞাসারও উদয় হয়না। যদি বা জিজ্ঞাসা জাগে তো সদুত্তর মিলেনা। আমরা কেবল যান্ত্রিকভাবে, mechanically, জপ করিয়া চলি, মালা ঘুরাইয়া যাই, শেষে হয় তো বিরক্ত বা হতাশ হইয়া এই অনর্থক কর্ম্মের অর্থহীন আবর্ত্তন হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লই। সাধনা সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসাই মৌলিক বা মর্ম্মী জিজ্ঞাসা: যথার্থ কোন্ পদ্ধতিতে, right technique অনুসারে জপকর্ম্ম করা উচিত? ইহারই সদুত্তর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। এখানে তাই দেখান হইয়াছে যে জপকর্ম্ম কিন্তু অন্ধকারের কর্ম্ম নয়, কুসংস্কারের অর্থহীন আচরণ নয়—ইহা আলোকের কর্ম্ম, তমসা হইতে জ্যোতিতে উত্তরণের কর্ম্ম। তাই উপনিষদ্ ইহার সার্থক নাম দিয়াছেন—"অভ্যারোহ জপ"। সুতরাং জপকর্ম্মের পিছনে এক পরিপূর্ণ মহা-বিজ্ঞান রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞানে নয়, দিব্য বিজ্ঞানে। আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রসমূহে—বেদে, উপনিষদে, তন্ত্রে—সর্ব্বত্র এই পরম বিজ্ঞানের রহস্যময় ইঙ্গিত ছড়ান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী এই নিখিল শাস্ত্রমহোদধি মন্থন করিয়া সেই বিজ্ঞানামৃত সমুদ্ধরণে তৎপর হইয়াছেন এবং নিজের অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকে, সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের 'দ্রাবকে' তাহা পরখ করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

মূল জপসূত্রটি স্বামিজী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তসূত্রের ন্যায় ইহারও চারি অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে চারিটি

করিয়া পাদ আছে। এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের কয়েকটি মাত্র সূত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সূত্রের আবার সংস্কৃত শ্লোক বা কারিকায় ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন এবং সেই শ্লোকগুলির আবার বাংলায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সূত্রসংখ্যা পাঁচ-শতের অধিক এবং শ্লোক সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র। গ্রন্থটি সুবিশাল, এজন্য খণ্ডে খণ্ডে ইহার প্রকাশের আয়োজন করা হইয়াছে। মূল জপসূত্রের উপোদ্ঘাত বা ভূমিকারূপে স্বামিজী শতাধিক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং সেগুলির বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই খণ্ডে সেইগুলিই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। তাছাড়া, উপক্রমণী নামক অংশে আরও কতকগুলি শ্লোকও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জপসূত্রের এই উপোদ্ঘাত ও উপক্রমণিকায় যে শ্লোকগুলি এবং তা'র ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, তাহা বিশেষ অবধানপূর্ব্বক এবং অত্যন্ত ধীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানে নানা গূঢ়তত্ত্বের অব-তারণা করা হইয়াছে—যেমন, প্রারম্ভেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপের তত্ত্ব, তারপর তিনটি ঋক্ বা ঋক্‌ত্রয়ের তত্ত্ব, তারপর পঞ্চভূতের তত্ত্ব, তারপর পঞ্চ অবতারতত্ত্ব, তারপর পঞ্চগঙ্গাতত্ত্ব, পঞ্চশুদ্ধিতত্ত্ব, পঞ্চ-রূপতত্ত্ব ইত্যাদি। আরম্ভেই সাধারণ পাঠকের মনে শঙ্কা জাগিতে পারে যে জপসূত্রের মধ্যে এ সব তত্ত্বের অবতারণা তো অবান্তর। জপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জগতের মূলতত্ত্ব, বা তার সৃষ্টি-তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? জপের প্রসঙ্গে এ সব আলোচনার উপযোগিতা কোথায়? এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক এবং তাই ইহার নিরসনের জন্য গোড়াতেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে জপকর্ম্মটি একান্ত বহিরঙ্গ যান্ত্রিক কর্ম্ম নয়। ইহা কেবল মন্ত্র আওড়াইয়া যাওয়া মাত্র নয়। জপের দু'টি অঙ্গ শাস্ত্র সর্ব্বত্র বলিয়া-ছেন—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'—ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ। এই অর্থভাবন

না হইলে জপ একান্ত ব্যর্থ না হইলেও যথার্থ 'সমর্থ' হয় না; কারণ, মন্ত্রাক্ষরের শুধু উচ্চারণ বা আবৃত্তিরও অবশ্য একটা ফল আছে, কিন্তু তাহা আংশিক, গৌণ। ইহার মুখ্য, সমগ্র ফল লাভ হয় মন্ত্রাক্ষর-গুলির মধ্যে যে অগাধ রহস্য নিহিত আছে, তাহাতে ডুবিতে পারিলে। মন্ত্র হইল রত্নাকরস্থানীয়—ইহার মূলে ডুব দিতে পারিলে অনন্ত রহস্যময় তাৎপর্য্যের মণিমুক্তা আমরা আহরণ করিয়া আনিতে পারি। শুধু একবার ডুব দিয়া নিজের মুঠার মধ্যে যা' কিছু তুলিয়া আনিলাম তাহাতেই যেন আবার মন্ত্রের সমগ্র তত্ত্ব ছাঁকিয়া তুলিয়া আনিয়াছি বলিয়া ভুল না করি। বারম্বার যতই ডুবিব, ততই নিত্য নব নব অর্থের ও ভাবের অনুভূতি আমাদের আলোকে পুলকে ভরিয়া দিবে। এখানে তাই এই অগাধ রহস্য-সাগরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই, মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানোর জন্যই এই সব তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, কারণ বেদের প্রতিটি মন্ত্র, প্রতিটি বর্ণই রহস্যের খনি। সেইজন্য প্রয়োজন পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত অভিনিবেশ সহকারে বেদা-গমের বাঙ্‌ময় মহোদধিতে অবগাহন। বেদবাণী হইতেছেন বাক্‌রূপিণী কামধেনু; ইহা হইতে আমাদের অমৃতের ধারা দোহন করিতে হইবে—'দুহানা অমৃতস্য ধারাম্'। এই গ্রন্থে তাই প্রসঙ্গক্রমে বেদের কোন কোন মন্ত্রের (যেমন সৃষ্টিসূক্তের) রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে সুধী পাঠকের মধ্যে অনুরূপ রহস্য উদ্ভেদের প্রেরণা জাগে। অনেকস্থলে মাত্র দিগ্‌দর্শন করান হইয়াছে—সবিশেষ বিস্তার করা হয় নাই। তন্ত্রের বা পুরাণের রহস্য সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

উপোদ্‌ঘাতের শ্লোকগুলির মধ্যে যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে হইলে একটি বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন এবং তাহার দিকে পাঠকদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পূজ্যপাদ স্বামিজী যেখানে যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সেগুলি কিন্তু সর্ব্বত্রই বিশ্বজনীন সার্ব্ব-ভৌম তত্ত্ব বা Universal Principles, সেগুলিকে পরিচ্ছিন্নভাবে মাত্র তাহাতেই পরিসমাপ্ত ভাবিলে চলিবেনা। যেমন প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীগুরুপাদবন্দনায় যে শ্রীগুরুতত্ত্বকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা শুধু কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ গুরুর তত্ত্ব নয়, কিন্তু যে গুরু-শক্তি বিভিন্ন গুরুমূর্ত্তির মধ্য দিয়া বিশ্বের আর্ত্ত, দীন, দুঃস্থ জীবকে সর্ব্বদাই সমুদ্ধরণের পথে লইয়া চলিয়াছেন সেই মৌলিক 'মহাকরুণা-শক্তি বা উদ্ধারশক্তিরই তত্ত্ব। এইরূপ তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে পঞ্চ অবতারের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা কিন্তু মাত্র সেই সেই পরিচ্ছিন্ন কূর্ম্ম, বরাহাদি মূর্ত্তিতেই পরিসমাপ্ত নয় বা কেবল জপাদির ক্ষেত্রেই ঐ সকল শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধ হয় তাহাও নহে, কিন্তু বিশ্বের সর্ব্বত্র ঐ অবতারতত্ত্ব মৌলিক শক্তিরূপে সক্রিয় রহিয়াছে। যেমন সাধারণ স্থূল ভৌতিক পরিণামেও আমরা ঐ শক্তিগুলির সক্রিয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। একটা বৃক্ষের বীজ যখন তার সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া ঘুমাইয়া আছে, তখন তার মধ্যে ঐ মীনশক্তির ক্রিয়া। তারপর, তাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে কূর্ম্মশক্তি; এই শক্তির সাহায্যেই সে নিজের সত্তাকে অন্যান্য সব কিছু হইতে পৃথক্ করিয়া ধরিয়া আছে। এখন সে বিকশিত হইবে—এই বিকাশের মুখে তাকে ঠেলিয়া দিতেছে, তুলিয়া ধরিতেছে ঐ বারাহী শক্তি। তারপর, বিকাশের পথে তা'র যে সমস্ত বাধা, তাহা অপনয়ন করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে ঐ নৃসিংহশক্তি। আবার, যে 'উরুক্রমের' প্রভাবে বীজাদি সমস্ত কিছুই আপন প্রাকৃতিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদ্‌বর্ত্তন (Evolution) প্রাপ্ত হয়, সেটি হইল বামনশক্তি। সুতরাং এইরূপে একটি স্থূল বীজও এই কয়টি শক্তির আশ্রয়েই ক্রমশঃ অঙ্কুরাদিরূপে বিকাশ

পাইতেছে। সৃষ্টির সর্বত্রই এইরূপ। দৃষ্টি ফুটিলে একটি ক্ষুদ্র বীজের জীবন-ইতিহাসের মধ্যেও আমরা এই পঞ্চ অবতারতত্ত্বের প্রকট লীলা দেখিতে পারি। প্রণবের অকারাদি পঞ্চ অবয়বও এইভাবে একটা বীজের জীবনে উদাহৃত হইতেছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে চাহিয়াছেন। শ্রীগণেশাদি দেবতার তত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন এই যে যেহেতু ঐ তত্ত্বগুলি সর্ব্বত্রই সার্ব্বজনীন বা Universal, সেইজন্য যে কোনো আধারের মধ্য দিয়াই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। তাই পাঠকের মনে হয় তো খট্‌কা জাগিতে পারে যে শ্রীগুরুর যেরূপ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইল, শ্রীগণেশের বেলাতেও তো দেখিতেছি মূলতঃ তদনুরূপ। ইহা কি পুনরুক্তি? বাস্তবিক কিন্তু ইহা পুনরুক্তি নয়। মনে রাখিতে হইবে যে সর্ব্বত্র একই পরম তত্ত্ব বা পরম দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। কিন্তু আধারের এবং আধেয়ের ভেদ তো আছে—শ্রীগুরুর মূর্ত্তি ও শ্রীগণেশের মূর্ত্তি এক নয়। গ্রহণ ও গ্রহীতার ভেদ নিবন্ধন গ্রাহ্যও বিভিন্ন হন। তাই অনুভূতির বা আস্বাদনের তারতম্য আছেই, যদিও লক্ষ্য বা গম্যস্থল একই। শ্রীগুরুর দিব্যঅঙ্গ-গন্ধাদি যাহার ইঙ্গিত দিতেছে, শ্রীগণেশের রক্তবর্ণ, গজমুণ্ডাদিও হয় তো প্রকারান্তরে সেই তত্ত্বেরই সন্ধান দিতেছে—তাই 'নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'। অন্যান্য দেবতাতত্ত্বের বেলাতেও ঐ একই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা বিভ্রমের সম্ভাবনা। বিভিন্ন দেবতাদি-তত্ত্ব আর্যদৃষ্টিতে এই ভাবেই তো প্রতিভাত হইয়াছে! একই সব, একেতেই সব। একই 'বহুধা' ভাবিত ও কীর্ত্তিত হয়েন। অথচ ব্রহ্মের এবম্প্রকার বহুধা 'কল্পনা' তাঁর নিজেরই 'একোঽহং বহু স্যাম্,' ইত্যাদি।

মর্ম্মী দৃষ্টি ফুটিলে এইরূপেই দেবতার মূর্ত্তি সাধকের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই পূজ্যপাদ স্বামিজীর তত্ত্ব-বিশ্লেষণে গণেশের ক্ষুদ্র মূষিক বাহনটি বা ধূমাবতীর রথস্থ কাকটিও বাদ যায় নাই। দেবতার প্রত্যেক অবয়বই যেন নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়া চলে। তাই নানাভাবে সেই তত্ত্বের পরিচয় পাইয়া ও বর্ণনা করিয়াও সাধকের যেন আশ মিটে না। শ্রীশ্রীকালীতত্ত্বের বর্ণনায় পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারহস্যবারিধির অসীমতার সঙ্গে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন দেখি। শ্রীশ্রীকালিকার কৃষ্ণবর্ণ, এলায়িত কেশ, বিস্তীর্ণ জিহ্বা, কণ্ঠস্থ মুণ্ডমালা, করস্থ একটি ব্যস্তমুণ্ড প্রভৃতি সব কিছু রহস্যই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তারা মূর্ত্তিতে মন্ত্রোদ্ধার মন্ত্রচৈতন্য ইত্যাদি রহস্য; ছিন্নমস্তায় মহাবাক্যচতুষ্টয় এবং নাদানু-সন্ধানরহস্য; ধূমাবতীতে মহাব্যাহৃতিরহস্য—ইত্যাদিও স্বামিজী আমাদের দৃষ্টিতে ফুটিতে দিয়াছেন। এইগুলি পড়িবার সময় অত্যন্ত সাবধানে ও স্থিরচিত্তে তত্ত্বগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। যিনি এইরূপে এক একটি তত্ত্বের ধ্যানে ডুবিতে পারিবেন, তিনিই এই গ্রন্থে যে সকল তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নতুবা হয়তো এসব কবির কল্পনা বা উচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে হইতে পারে, যেমন শাস্ত্রে দেবতাদির ধ্যান, রহস্য, স্তোত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকের মনে হইয়াছে। সেইজন্য সর্ব্বশেষে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এ সব তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিবে কিন্তু কেবল জপাশ্রয়ে। তাই ইহা সাধনার ধন, কল্পনার জালবয়ন নয়। সেই সাধনার এক যুক্তিযুক্ত, নির্ভরযোগ্য আধার এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ-সমন্বয়-মুখে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সাধকমাত্রের কাছেই এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এ গ্রন্থে (১।১।১,২,৩ ইত্যাদি) জপের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাতে জপকে মানবের অধ্যাত্ম-যোগের একটা গৌণী শাখা বা অববাহিকা মনে করা যায় না;

ইহাই মুখ্যধারা, ধ্যানধারণা, মননবিচার, ভাবভক্তি—সব কিছুই ইহার ক্রোড়ীকৃত। সুতরাং জপের যে অনুবন্ধচতুষ্টয়, অর্থাৎ বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকার, তার সম্যক্ আলোচনার নিমিত্ত একটা পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ক্রিয়াতান্ত্রিক (practical) আধার প্রস্তুতির অপেক্ষা আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেইরূপ আধারই লক্ষ্য হইয়াছে।

তারপর, পূজনীয় গ্রন্থকর্ত্তা স্বামিজীর পরিচয়? একদিক দিয়া এই বিশাল অনুপম গ্রন্থই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু পরিচায়ক। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি সে-যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সহকর্ম্মী ছিলেন। তন্ত্রানুশীলনে এবং তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানে স্যার জন্ উডরফের সঙ্গে ইঁহার সহযোগিতা সুধীসমাজে প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। বেদ, তন্ত্র, দর্শনাদি বিষয়ে ইঁহার নিজের অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং মৌলিক গ্রন্থও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ তিনি আর ইতিপূর্ব্বে রচনা করেন নাই। ইহার বিরচন কর্ম্মটিতেও কিছু অসাধারণত্ব রহিয়াছে। জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া তিনি যেন এই গ্রন্থে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিয়াছেন। আশা করি সাধকমণ্ডলীর মধ্যে ও সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি সমুচিত সমাদর লাভ করিবে।

এই গ্রন্থের প্রকাশে পূজ্যপাদ স্বামিজীর বিশেষ অনুরাগী কয়েকজন ভদ্রলোক অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। ভোলানাথ দত্ত কোম্পানীর শ্রীরঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স, এই কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে বিশেষ তৎপরতার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। আমরা শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশে তৎপর হইব।

পরিশেষে, উপোদ্ঘাতের শ্লোকগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ-সূত্র দেওয়া যাইতেছে—

প্রথমেই শ্রীগুরুরহস্যপ্রকাশিকা শ্লোকাবলী—শ্রীশ্রীগুরুপাদব্জ-দলপঞ্চকম্। তৎপরে—

১। স্বরূপ তিন বা Triune **সৎ-চিৎ-আনন্দ**।

২। সাধন তিনঃ—

(i) **হংসবতী ঋক্** (ii) **গায়ত্রী ঋক্** (iii) **মধুমতী ঋক্**

অথবা

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

৩। প্রাণরূপে Triune অভিব্যক্ত—ইহা প্রকাশ ও আকাশের মিলনকেন্দ্র বা মিথুনভাব, **আবিঃ ও নাদের মিলিত রূপ,** জ্ঞান ও গতির সন্ধি।

৪। ইহা হইতে প্রাণ, কাল, বায়ু—অগ্নি, সলিল, ধরিত্রী—এই তিন তিন বিভাগ।

৫। তিন হইতে পাঁচ—হংযংআদি প্রাণের ধারা বা **হংসের সঞ্চরমানতা**।

৬। ছন্দের বা গায়ত্রীর ধারা—**মীনশক্তি, কূর্ম্মশক্তি, বারাহীশক্তি, নারসিংহীশক্তি**।

তাহার পর **পঞ্চধারা** বা **পঞ্চগঙ্গা**—ওঁকারে এই পঞ্চের মিলন।

৭। **পঞ্চশুদ্ধি ও ত্রিমল**—অণু, তনু ও পৃথু। এই ত্রিমল শুদ্ধ হয় প্রণবজপে। এই প্রণবের মধ্যেই পঞ্চগঙ্গা ও পঞ্চগব্য—একের দ্বারা বাক্‌শুদ্ধি, অপর দ্বারা তনুশুদ্ধি। শুদ্ধি হইল স্বচ্ছন্দতা ও স্বাভাবিকতা।

৮। ছন্দ দুই প্রকার—**অরিচ্ছন্দ, মিত্রচ্ছন্দ**। এই মিত্র ও মধুচ্ছন্দের সাহায্যে বিরূপতা নিবারণ ও একরূপতা স্থাপন।

৯। ঘনীভূত কেন্দ্রীভূত ছন্দই হইল **প্রণব,** সুতরাং **প্রণব** আশ্রয়েই সাধন।

১০। প্রণবরূপ ঈশ্বরের আশ্রয়ে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিকে বিকাশ করিয়া তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইবে।

১১। সেইরূপ তাঁর প্রসন্না বরদা শক্তির মূর্ত্তি যে কালীতারাদি তাহাও দর্শন করিতে হইবে এবং তাঁর **মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহা-সরস্বতী**—এই রূপত্রয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিতে হইবে।

১২। তেমনি তিনি আবার একদিকে **মৃত্যুরূপিণী,** অপরদিকে **অমৃতস্বরূপিণী**।

১৩। ঋতচ্ছন্দে সত্য বোধ বা **প্রমা জ্ঞান,** আর মধুচ্ছন্দে **আনন্দবোধ**। বোধরূপে সত্য, অনৃতাদি সকল বোধই একরূপ হইলেও তাহাদের সত্যত্ব ও আনন্দত্ব দেয় এই ছন্দ।

১৪। উভয় ছন্দের মিলনে হয় **ভূমাবোধ**—অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে।

১৫। সমাবৃত্তি হইল গায়ত্রী ঋক্, মধুমতী ঋক্ ও হংসবতী ঋকের সম্মিলিত রূপ সেইজন্য **সমাবৃত্তির মন্ত্র হইল হৌং সঃ**।

১৬। **অভ্যারোহ** সমাবৃত্তি ছাড়া হয়না।

১৭। সমাবৃত্তিতেই **জানা** বা **দেখা ও প্রবেশ হওয়া**—এই তিনবৃত্তি থাকে। তারপর সমাবৃত্তির লক্ষ্য ও অঙ্গটাও জানা প্রয়োজন।

১৮। শুদ্ধ প্রণবে, অনাহত ধ্বনিতে বা নাদে **জপের লয়** বা শান্তভাব। ইহা সত্ত্বোদ্রেকেরই ফল। সমাবৃত্তিই নিরুপদ্রব সমতা। প্রাণমনের সংযম দ্বারা ব্যাস বিষমতা পরিহারপূর্ব্বক সমাস-সমতায়, ওঁকারের শান্ত সমতায় স্থিতি—ইহাকেই **সমাবৃত্তি** বলিয়া জানিবে।

১৯। এই সঙ্গে সমাবৃত্তির মূর্ত্তি হিসাবে **শ্রীগণেশ** ও তাঁর মূষিকরূপ বাহন ও আয়ুধাদি তত্ত্বও বুঝা প্রয়োজন।

২০। এই সমাবৃত্তি ছাড়া প্রত্যাবৃত্তি ও পরাবৃত্তিও বুঝা আবশ্যক

এবং বৃত্তির পঞ্চ বিভাগের উপরও ধ্যান দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে সমাবৃত্তিটা ঠিক বুঝা যাইবে। অনুবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এই চরম পরাবৃত্তি পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি যদ্দ্বারা সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাই সমাবৃত্তি।

২১। ওঁকারের দ্বারা সমাবৃত্তি বিচার—ওঁকারের কোন্ মাত্রায় কি কাজ হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ মীন, বারাহী ও কূর্ম্মশক্তির বিকাশ ও পরে তাহা হইতে নাদ ও বিন্দু আকারে নৃসিংহ ও বামনের উদয়।

২২। অন্তঃ বা জল হইল অজ্ঞান বা অবিদ্যা, আর উর্ব্বী হইতেছে তত্ত্বসমূহের ব্যক্তরূপ। ইহাই ত্রয়ী—**নাদবিন্দুকলাত্মিকা, সোম-সূর্য্য-অগ্নিরূপা**।

২৩। সৃষ্টিকল্পনা—নাসদীয় সূক্ত ও সৃষ্টিসূক্ত। আবিঃ ও রাত্রি, ঋত ও সত্য, বায়ু ও ব্যোম, গতি ও জ্ঞান, আকাশ ও প্রকাশ —ইহাদের মিলিত রূপ ওঁকার বা প্রণব হইতে সৃষ্টি। সেইরূপ **সমুদ্র ও অর্ণব**।

২৪। তারপর আসিল কাল ও সংবৎসর, সূর্য্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণ। তাহা হইতে এই সূর্য্যকে, এই তেজোরূপ ভর্গকে কেন্দ্র করিয়া **ভুবনচক্র ও কালচক্র**। এই কাল ও কলনবৃত্তিই হইল **ঈক্ষণ**—ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অকাল বৌদ্ধ পরিণাম। এখানে **সমুদ্র ও অর্ণবে ভেদ বিভাবনীয়**।

২৫। তারপর আসিল কালের rhythmic গতি cyclic গতি, শুক্ল-কৃষ্ণ গতি, ধন ও ঋণ গতি।

২৬। এই ভুবনকোষের নাভিতে সবিতা ও পূষা—ইহার **নাভি, নেমি ও অর**।

২৭। **চতুর্ব্ব্যূহ ও ছন্দ**।

২৮। চক্রচিন্তা—তাহার **শঙ্খাবর্ত্ত গতি**, ও Axis of Ascent.

২৯। **জপরূপী রহস্য খগ**। নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রাম।

৩০। পঞ্চোপাসনার অঙ্গরূপে শিবতত্ত্ব, অঘোরাদি পঞ্চমূর্ত্তির মন্ত্রবর্ণে সম্মিলিতরূপ, এবং আদিত্যতত্ত্ব।

৩১। তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও শ্রীশ্রীকালিকাতত্ত্ব। তারা—প্রণবাদি মন্ত্রচৈতন্য-পূর্ব্বক পরম উপলব্ধি, ছিন্নমস্তা নাদানুসন্ধান এবং মহাবাক্য ভাবনা দ্বারা, ধূমাবতী মহাব্যাহৃতি সহকারে, কালী নিখিল তত্ত্বের ব্যাকলন এবং সঙ্কলন এবং নিষ্কলন দ্বারা।

উপোদ্‌ঘাতের পর উপক্রমণী। এ অংশেরও জপের তত্ত্বাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক দুই দিকেই উপযোগিতা।

ক্রান্ত এবং শান্ত এই দুটি 'দৃষ্টি' হইতে সূচনা। আবরক-আবরণীয়, প্রকাশক-প্রকাশ্য, সঙ্কোচক-সঙ্কোচ্য, নিয়ামক-নিয়ন্তব্য, হ্লাদক-হ্লাদ্য—ইত্যাদি বিশ্বে বহমান কয়টি ধারার অনুসরণ পূর্ব্বক পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার পক্ষে যে যে সূত্র ও সঙ্কেতগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়, সে গুলি এই উপক্রমণীতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যথা—জপাদি সাধনে সন্ধি, সেতু এবং মেরু এই ত্রিসূত্রী। বিভিন্ন বিচিত্র ধারায় পতিত জীবের 'সমাবৃত্তি'র নিমিত্ত বুদ্ধিযোগ এবং একান্ত শরণাগতিযোগের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এই অংশের উপসংহার।

তৎপরে মূল সূত্রাংশ এবং তাদের কারিকা। **জপের লক্ষণ, ঋত এবং সত্যের লক্ষণ; ছন্দের লক্ষণ, ব্যাজ এবং বিঘ্নের লক্ষণ, ছন্দের মান্দ্যস্থানগুলি** এবং সেই মান্দ্যস্থানগুলিকে মুখ্য **প্রাণাগ্নিতে হবন**—এই পর্য্যন্ত বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের কতিপয় সূত্রমাত্র।

এই গ্রন্থের অনুশীলনে আমাদের ভ্রান্ত ও শ্রান্ত দৃষ্টি ক্রান্ত এবং শান্ত দৃষ্টি হবার ভরসাটুকুও যদি পায় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

দশহরা। }
সম্বৎ ২০০৭ }

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

("Natural Name")

ঐ নাম দিয়া তুইটি বক্তৃতা সাধারণ শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বহু বর্ষ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল। আজ মনে হইতেছে, বক্তৃতাদু'টি অনেকদিন আগেকার হইলেও, বর্ত্তমান গ্রন্থের যেটি মুখ্য প্রয়োজন তৎসাধনে কিছু সহায়তা করিতে পারে। সেই কারণে বক্তৃতাদু'টি গ্রন্থের ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত আকারে অন্তর্নিবিষ্ট হইল। আগে যে ভাবে ছিল প্রায় সেভাবেই এখানে দেওয়া হইল। ব্যাখ্যানের প্রাঞ্জলতা, এবং সম্ভবতঃ একটুখানি সরসতাও, তাতে বজায় থাকিল মনে হয়। তবে পুরানো জিনিস নূতনের মধ্যে ঠাঁই করিয়া দিতে গেলে সব দিকে এবং সব কিছুতে মিল করিয়া দেওয়া শক্ত। পরিভাষায় এবং বিবৃতিভঙ্গীতে সেটা আর এটার মাঝে কিছু তফাৎ থাকিলেও, মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ কোনও অমিল নেই। জপবিজ্ঞানের মুখ্যতঃ মন্ত্র লইয়া কারবার। এই "মন্ত্র" বস্তুটি কি, সেটা বোঝার পক্ষে এ বক্তৃতাদু'টা কাজে লাগিতে পারে।

এখানে, এবং প্রয়োজনমত অন্যত্রও, প্রস্তাবিত আলোচনায় আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) এর "সহযোগিতা" নেওয়া হইয়াছে। কিভাবে এবং কতদূর, তা আলোচনাক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। জপবিজ্ঞান মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বলা হইয়াছে, বাক্, প্রাণ আর মন জপকর্ম্মের নির্ব্বাহয়িতা। জপকর্ম্ম এই "স্থূল" শারীরযন্ত্র এবং এটার অবস্থিতি পরিস্থিতি "অমান্য" করিয়া হয় না। সুতরাং যেটাকে "স্থূল" ভাবিতেছি, তাতেই জপের অন্ততঃ গোড়াকার "পাদটি" ন্যস্ত রহিয়াছে। এখানকার আইনকানুন জপের অন্ততঃ সেই পাদটি সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ কথাকয়টি ভূমিকার অন্যত্র এবং মূলগ্রন্থে খোলসা করিয়া বলা হইয়াছে। জপকর্ম্ম প্রাণপ্রযত্নবিশেষসাধ্য। এই প্রযত্নবিশেষে "সৌষ্ঠব" (symmetry, harmony) থাকা আবশ্যক। সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসে যেমন। সৌষ্ঠব না থাকিলে জপকর্ম্মটি সুষ্ঠুভাবে হইবে না; ফলে কর্ম্মটি "সমর্থ" হইবে না, সিদ্ধও হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত। "কৃষ্ণ" এই নামটি কেহ কেহ "ক্ স্ ন" (ষ কারটি

দন্ত্য স এর মত উচ্চারণ করিয়া) "গ্রহণ" করেন দেখিতেছি। এতে সত্যই যে "অপরাধ" হয়, তা বোঝা যায় বাহ্যতঃ এই লক্ষণে যে—এরূপ অবৈধ উচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষসৌষ্ঠবটি নষ্ট হইতেছে। Harmonic function এর স্থলে discordant function সৃষ্টি হইতেছে। 'ক' বর্ণের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল; ঋ, ষ, ণ এই তিন বর্ণের স্থান মূর্দ্ধা। কাজেই, মূল থেকে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত সুষম, সজাতীয় তিনটি "ধারা" পাইতেছি। এতে বিষম বক্রগতা নাই। এর ভিতর 'স'-কে প্রবিষ্ট করাইলে বিষম, বিজাতীয় একটা "স্বরশেল" যেন আসিয়া প্রবিষ্ট হইল; গানে যেমনধারা বিবাদী স্বর। মূর্দ্ধা আর দন্তের মাঝে কেবলমাত্র "স্থানিক" তফাৎ নয়, "ব্যবহারিক" (functional) ভেদ বর্ত্তমান। দন্তাভিঘাতবৃত্তিনিমিত্ত যে স্বরবৃত্তি (phonetic function or moment) উৎপন্ন হয়, সেটিকে যত্র তত্র, বিনা বিচারে, অন্য জাতীয় স্বরবৃত্তির সঙ্গে "মিত্রচ্ছন্দে" গাঁথিয়া দেওয়া চলে না। তাতে "স্বরসঙ্কর" (incompatible confusion of sounds) হবার আশঙ্কা থাকে। সমজাতীয় ধ্বনিগুলির পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা (affinity) থাকে মনে রাখিতে হইবে। ব্যাকরণে সন্ধি এবং ষত্ব-ণত্ব বিধানের মূলে অনেকস্থলেই এই যুক্তি।

তন্ত্রের দিক্ থেকেও "স্বরশঙ্কর" আবশ্যক, "স্বরসঙ্কর" নয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে সৎ=চিৎ=আনন্দ='ক' ভাবিলে, ঐ অদ্বৈত বস্তুটি নিজ "স্বরূপশক্তি"তে ত্রিধা অভিব্যক্ত হইতেছেন—এই "হৃল্লেখা"টি মেলে ঐ "কৃষ্ণ" নামেতেই, অথবা প্রকারান্তরে, "ক্লীঁ" এই বীজে। "ষণ" স্থলে "সন" করিলে হৃল্লেখাটি আর ঠিক মিলিল না। এইরূপ "শিবায়" স্থলে "সিবায়" উচ্চারণ অবৈধ। কেবল যে বিষম বিজাতীয় বর্ণ (পূর্ব্বোক্ত স্বরশেল) বর্জ্জন করিলেই হইল, এমন নয়। ধ্বনিগত (intonation সম্পর্কে) অরি-মিত্র ভেদও আছে। যেমন, বেদে প্রসিদ্ধ "ইন্দ্রশত্রু"। কোন্‌টা উদাত্ত, কোন্‌টা অনুদাত্ত ইত্যাদি বিচার প্রাসঙ্গিক। যেমন, "হরি বোল" স্থলে "বোল" এই ধ্বনি প্লুতভাবে উচ্চারিত হওয়াই প্রশস্ত। "গোবিন্দ" নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রথমটায় "নাদে" (ওঙ্কারে) পর্য্যবসান, এবং দ্বিতীয়টিতে নাদে উত্থান অভীপ্সিত। এ সব ছাড়াও, নাম গ্রহণের বা জপের সংখ্যাদি বিচার আছে; পুরশ্চরণ আছে, আরও কত কি আছে। এ সবের মূলে যে যুক্তি সেটা "অবৈজ্ঞানিক" নয়, হবার কথাও নয়।

জপ অথবা অন্য যে কোনও কর্ম্ম হউক, তার সামর্থ্যসিদ্ধির (efficacy) নিমিত্ত এই তিনের অপেক্ষা রাখে—(১) বিদ্যা (correct technique), (২) শ্রদ্ধা (working belief and interest থেকে সুরু করিয়া), এবং উপনিষৎ (রহস্যজ্ঞান—grasp of basic principles)। বিদ্যাটির জন্য "বিজ্ঞানসম্মত" অভিজ্ঞ উপদেশ মেলা চাই এবং সে বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান (জড়, প্রাণ ও মন বিষয়ে) এর কোনই "ধার" ধারিবে না—এ বায়না একান্তই অচল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের বৈজাত্যও নেই ; কোন বিজ্ঞানই অন্ত্যজ নয়, অব্যবহার্য্য বা অস্পৃশ্য নয়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানই অবশ্য পূর্ণ বিজ্ঞান হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। স্থূলের ক্ষেত্রে সমন্বয়, সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই তাকে পূর্ণতা লাভ করিতে হয়। স্থূলের তথ্য এবং তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াই তাদের সমাধান সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ করার যত্ন করিতে হয়। এ প্রয়াসে জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দুইএরই শ্রেয়োলাভ। ভূত-বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব অধ্রুব ; অথচ তার গতি বা পদ্ধতি ক্রমেই অগ্রগা। কিন্তু তার প্রয়োগ কোথাও ভদ্র, কোথাও বা ভীষণ। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হইবে—যেটি অধ্রুব তাকে ধ্রুবের সন্ধান মিলাইয়া দেওয়া ; যেটি অগ্রগা, সেটিকে ঋতাধ্বগা করা ; যেটা কখনও ভয়াল কখনও "কৃপাল" তাকে সর্ব্বতোভদ্রভাবে পাওয়া। জপ (যে উদার অর্থে এখানে গৃহীত হইয়াছে) অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্তর্গত সাধন সন্দেহ নাই। তথাপি, পূর্ব্বোক্ত বিচারে, ধ্বনি সম্বন্ধে, প্রাণপ্রযত্ন ও প্রবাহ সম্বন্ধে, এবং আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক অনেক কিছু সম্বন্ধে, জপকে ভূত-বিজ্ঞানের আইনগুলি মানিয়া চলিতে হয়। জপকারীর পক্ষে লেবরেটরির যন্ত্রপাতি সহকারে পরীক্ষায় সাক্ষাৎভাবে প্রবৃত্ত হইতে হয় না বটে (যেমন স্বরশিল্পী অথবা বর্ণশিল্পীকে হয় না), কিন্তু সে পরীক্ষালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে অবশ্য অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মার গভীর ভূমি থেকে উত্থিত শক্তিপ্রবাহেরই মুখ্যতা। "বাহিরের" যেগুলো, সেগুলো "বাহ্য" বটে, কিন্তু ত্যাজ্য নয় অগ্রাহ্যও নয়। জীবের সত্তার সর্ব্ব-স্তরের একটা "মন্থন" আবশ্যক।

বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা—জগৎ শব্দপ্রভব। এ শব্দ কোন্ শব্দ? আমরা কাণে যে শব্দ শুনিয়া থাকি সেই শব্দ কি? আমরা কাণে যে শব্দ শুনি তাহা কতকগুলি উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলে কোনও এক স্থান হইতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি

হওয়া চাই। সুস্থির জলরাশির মধ্যে একটা লোষ্ট্র ফেলিয়া দিলে যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মোটামুটি সেইরূপ। সেই উত্তেজনা আবার তরঙ্গের মত চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আমাদের কাণে, স্নায়ুগুলিতে এবং মস্তিষ্কের কোনও কোনও কেন্দ্রে ধাক্কা না দিলে আমাদের চেতনা সাড়া দেয় না, আমরা শব্দ শুনি না। উত্তেজনা আবার অতিমৃদু বা অতিতীব্র হইলেও আমাদের শব্দ শোনা হয় না। স্পন্দনের বেগের (rate of vibration) একটা নিম্নসংখ্যা ও একটা ঊর্দ্ধসংখ্যা (lower-limit and upper-limit) আছে, এবং সেই দুইটি সীমার মধ্যের কোন অবস্থা না থাকিলে বাতাসের ঢেউগুলি সাধারণতঃ আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মাইবে না। অথচ, আমাদের চোখে দেখা বর্ণালি বা বর্ণগ্রামের অধঃ (infra) এবং ঊর্দ্ধ (ultra) ভূমিতে আলোক তরঙ্গের নানা গ্রামে অস্তিত্ব যেমনধারা প্রমাণিত, আমাদের কাণে শোনা ধ্বনিগ্রামের "অতীত" ভূমিতে শব্দতরঙ্গের নানা গ্রামে অস্তিত্বও তেমনিধারা সিদ্ধ। বিজ্ঞানের Supersonics বা Ultrasonics পাদ এই সকল "অতীন্দ্রিয়" ধ্বনিতরঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত আছে। এই সকল ধ্বনিরও আবার অঘটন-ঘটন-পাটব দেখিতেছি। যৌগিক পদার্থগুলির সংযোগ-বিয়োগে, "আণবিক কেন্দ্র" বা ব্যূহ বিদারণে, শারীরিক ও মানসিক সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণে এই সূক্ষ্মগ্রাম ধ্বনিতরঙ্গগুলির প্রভাব ক্রমশঃ অঙ্গীকৃত হইতে চলিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা কথাগুলির প্রমাণ মেলান যায়। যেমন সহজ শব্দজ্ঞানে—একটি বড় কাচের পাত্রের ভিতর বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিতেছে, আমি শুনিতেছি। যন্ত্র-সাহায্যে সেই পাত্রের বাতাস ধীরে ধীরে বাহির করিয়া যেমন ফেলা হইবে, আমি ততই শব্দ কম শুনিতে থাকিব। পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইয়া আসিলে আর আমি শব্দ শুনিতে পাইব না। অথচ ঘণ্টা তখনও পূর্ব্ববৎ দুলিতেছে। আবার ধীরে ধীরে বাতাস ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হউক ; আমিও আবার ক্রমশঃ বেশী বেশী শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অতএব বাতাস শব্দের বাহন ইহাই সাব্যস্ত হইল। অন্বয়-ব্যতিরেকে আমরা দেখিলাম যে ঘণ্টা-সঞ্চালন-সঞ্জাত স্পন্দনগুলি বাতাস বহিয়া আনিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌছাইয়া না দিলে আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাই না। শুধু দ্বারে পৌছাইয়া দিলেই তার খালাস নাই। শ্রবণযন্ত্র, স্নায়ুসূত্রসমূহ এবং মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্র-গুচ্ছ-বিশেষ রীতিমত-ভাবে ধাক্কা দিতে না পারিলে আমার শব্দজ্ঞান হয় না। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন

হইয়াছে। আবার, এ সকল উপাদান ও নিমিত্ত ছাড়া আরও একটা জিনিষের অপেক্ষা রহিয়াছে—সেটা অল্প বিস্তর মনঃসংযোগ। একটার তোপে যেদিন আমার ঘড়ি মিলাইতে হইবে সেদিন আমায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। ইহা হইল ইচ্ছাকৃত-মনঃসংযোগ। অন্ধকারে কুটীরের গবাক্ষে বসিয়া শ্রাবণের বর্ষার স্বরের মূর্চ্ছনা ও লয়গুলি শুনিতেছি এবং প্রথামত 'বাতায়নিকের কথা'ই ভাবিতেছি, এমন সময়ে চপলা ঘনীভূত অন্ধকাররাশি 'শকলানি' করিয়া দিয়া চমকিল, এবং একটু পরেই গুরুগম্ভীর মেঘমল্লারের একটা ছন্দঃ বিপুল উচ্ছ্বাসে নামিয়া আসিয়া বর্ষার সকল কোমল স্বরগুলিকে মগ্ন করিয়া দিল। সকল ভাবনার মধ্য হইতে জাগিয়া আমার এ শব্দ শুনিতেই হইয়াছে। ইহা হইল অনিচ্ছাকৃত-মনঃসংযোগ। এস্থলে ধাক্কা এতই প্রবল যে আমায় শুনিতেই হয়। কিন্তু চাহিয়া দেখি এই অমাবস্যায়, 'ঘোর বাদরে' আমার কুটীরে যিনি আজ অতিথি, তাঁহার নাসাগর্জ্জন পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। ধাক্কা তাঁহাকে জাগাইতে পারে নাই। তাঁহার মনঃসংযোগ হয় নাই। অতএব শুধু বাহিরে বাতাসের স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে।

একটা ধাতুপাত্রে বাড়ি দিলাম। ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ কিন্তু শব্দটা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া চলিয়াছে। শেষকালে আর কিছুই আমি শুনিতে পাইতেছি না। ধাতুপাত্রের কণিকাগুলি কিন্তু তখনও প্রহারের বেদনা ভুলিতে পারে নাই; তাহারা তখনও কাঁপিতেছে। কিন্তু কাঁপিলে কি হয়, সে কম্পন এত মৃদু, যে তজ্জনিত বাতাসের কম্পন আমার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। কম্পন বেগের একটা নিম্নসংখ্যা আছে যার নীচে নামিয়া গেলে সাধারণতঃ আর আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু শুনিতে পাই না বলিয়া কম্পন বা স্পন্দনও যে থামিয়া গিয়াছে এমন নহে। কোনও একটা স্পন্দনের বেগ পূর্ব্বোক্ত অধঃসীমা (lower limit) ছাড়াইয়া উঠিলে তবে সাধারণতঃ আমাদের শোনার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ ছাড়া কাণের ও মস্তিষ্কের রীতিমত উত্তেজনা চাই এবং অল্পবিস্তর মনঃসংযোগ চাই। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোজা কথায়, এক ক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ বারকতক বায়ুকণিকাগুলির স্পন্দন না হইলে আমরা শুনি না। যেমন একটা অধঃসীমা আছে, তেমনি একটা ঊর্দ্ধসীমাও (upper limit) আছে; এক ক্ষণের মধ্যে

স্পন্দন কয়েক সহস্রের চেয়ে বেশী দ্রুত হইলে হয়ত আমরা শুনিতে পাইব না। এই দুইটা সীমার মধ্যে অবশ্য নানান্ থাক্, সুতরাং শব্দের নানান্ পরদা, নানান্ বৈচিত্র্য। ঐ দুই সীমার মধ্যে কোন একটা বিশিষ্ট বায়ুস্পন্দনের ফল একটা বিশিষ্ট শব্দজ্ঞান। কোকিলের ডাক বাহিরে একপ্রকার বায়ুস্পন্দন; কাকের ডাক আর এক প্রকার।

আমাদের শব্দজ্ঞানের মোটামুটি-বিবৃতি এইরূপ। আপাততঃ আর বেশী তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। শব্দের এই বিবরণ হইতে একটা কথা পরিষ্কার হইল যে, এইরূপ শব্দ সৃষ্টির মূল বা জগতের আদি বলিয়া মনে করা চলিতে পারে না। এইরূপ শব্দের জন্য বায়ুস্পন্দন দরকার, কিন্তু গোড়ায় বায়ু কোথায়? ইহার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক চাই, কিন্তু গোড়ায় সেগুলি আছে কি? মনঃসংযোগ, শব্দসংস্কার প্রভৃতি অপরাপর নিমিত্তেরও অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু জগতের যখন সবে আরম্ভ, তখন এগুলিই বা পাইতেছি কোথায়? আমরা যেটাকে শব্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি সেটা সৃষ্টিপ্রবাহের মূলে ছিল না, পরে দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন কারণের সহকারিতায় এবং বিবিধ অবস্থার যোগাযোগে পরে বিকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম উপক্রম যাহা হইতে তাহাকে যদি 'প্রাথমিকস্পন্দ' (primordial causal movement) এই নাম আমরা দিই, তবে আমরা যেটাকে শব্দ বলিতেছি সেটা প্রাথমিক স্পন্দ নহে। সেই প্রাথমিক স্পন্দের মূল উৎস হইতে নানা দিকে নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতেছে—নানা ধারায় সৃষ্টির প্রবাহ হইতেছে। এই ধারাগুলিকে 'কার্য্যাভিব্যক্তি-ধারা' (lines or streams of effectual manifestation) বলা চলিতে পারে। আমরা যে সকল রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সুখ দুঃখের বেদনা পাইতেছি—সে সকল এইরূপ একটা একটা অভিব্যক্তির ধারা। মূল উৎসে যাহা রহিয়াছে তাহা রূপ, শব্দ, রস প্রভৃতি নহে, তাহাদের করণ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতিও নহে, তাহাদের গ্রহীতা মন বা বুদ্ধিও নহে; তাহা প্রাথমিক স্পন্দ মাত্র।

সৃষ্টির গোড়ার কথা অথবা শেষের কথা এখন আমরা আলোচনা করিব না। সৃষ্টির কি কোনও আদি আছে ও অন্ত আছে, অথবা তাহা অনাদি ও অনন্ত—এ সমস্যারও সমাধানের প্রয়াস আমরা আপাততঃ করিব না। বোধ হয় এ সমস্যার সন্তোষজনক কোন সমাধান নাই-ও। সৃষ্টি ও লয়ের কথা বাদ দিলে

'প্রাথমিক স্পন্দ'কে শুধুই 'স্পন্দ' বলিতে হয়। আপাততঃ ইহা বলিয়া কাজ নাই যে, কোন একপ্রকার জাগতিক-সুষুপ্তির পর এই জাগতিক-জাগরণ, কোন একটা মহামৌনের পর এই বিশ্বকলরব, কোন একরূপ সাম্যাবস্থার পর এই বিচিত্র বৈষম্যের উন্মেষ। সোজাসুজি ভাবে বুঝিতে গেলেও আমাদের সকল প্রকার জানার (experience) মূলে যে ব্যাপারটা রহিয়াছে, সেটা স্পন্দ বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। আমাদের রূপজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি সকল জানা ব্যাপারের গোড়ার কথা স্পন্দ—চাঞ্চল্য (stressing)। ঈথারে কোন স্থানে একটা চাঞ্চল্য জন্মিল। সেটা তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়া আমার চক্ষু ও মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া দিল; এই চাঞ্চল্যের (stress) আমার চেতনায় যে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি (resultant manifestation), তাহাই ত আমার বস্তুর রূপজ্ঞান। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি সকল রকম অভিব্যক্তি সম্বন্ধেই এই বিবরণ খাটে। কোন একটি দ্রব্যের অণুগুলি অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে; ঈথার বা তজ্জাতীয় কোন একটা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বাহন (medum) সে স্পন্দন বহন করিয়া আনিয়া আমার স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিল; এই উত্তেজনার যে চেতনায় সাড়া (response), তাহাই ত আমার তাপের অনুভব। বাগবাজারের রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দিলাম; রসের সঙ্গে মুখামৃতের রাসায়নিক সংযোগ হইল; সেই রাসায়নিক ক্রিয়া দেখিতে গেলে শক্তির আদান প্রদান; তলাইয়া দেখিলে তাহা স্পন্দেরই ব্যাপার। রসনার স্নায়ুগুলি সেই শক্তির খেলায় চঞ্চল হইল। চেতনায় ইহারই যে ছাপ তাহাই আমার রসগোল্লার রসাস্বাদ। বাহন ঈথারই হউক, আর বায়ুই হউক, অথবা আর যাহাই হউক, তাহা লইয়া মারামারি করিয়া লাভ নাই। সকল প্রকার অনুভূতির উৎপত্তি যে চাঞ্চল্যে (stir, agitationএ) সে পক্ষে আমরা সন্দেহ না রাখিলেও পারি।

অনুভূতি বা প্রত্যয়ের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে, অর্থ বা বিষয়ের দিক্ হইতেও সেই সিদ্ধান্তই আমরা পাই। কেমন করিয়া জানিতেছি শুনিতেছি, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক্; জিনিষটা বস্তুতঃ কি? দৃষ্টান্তের জন্য অপর আর একটা বাগবাজারের রসগোল্লা অদৃষ্টে যদি নিতান্ত নাই-ই জুটে, তবে না হয় এই নীরস খড়ির টুক্‌রাটি লইয়াই অগত্যা নাড়া চাড়া করা যাক্। দেখিতে এই খড়িটা বেশ জমাট বাঁধা একটা

জিনিষ ; কিন্তু এখনি আমি ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারি। এই চূর্ণগুলি আবার আরও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে ; রাসায়নিক বিদ্যা যাহাকে পরমাণু বলে সেইখানে গিয়া এইরূপ বিভাগের আপাততঃ বিরাম। কিন্তু আপাততঃ বিরাম, বস্তুতঃ নহে। কারণ, রাসায়নিক অণু পরমাণুগুলিও যৌগিক-দ্রব্য, তাহাদের গঠন প্রণালী জটিল। যে সূক্ষ্মতর উপাদানে সেগুলি গঠিত, সেগুলিকে বিজ্ঞান ইলেক্‌ট্রন (electron) ইত্যাদি বলিতেছে ; এগুলি তাড়িতের অণু ; ইহাদেরও মাপ পরিমাণ আছে, কিন্তু তাহা রাসায়নিক অণু (atoms) গুলির মাপের তুলনায় ঢের কম। একটা অণুর গঠন ব্যবস্থাও আবার কত জটিল, কত অদ্ভুত ! এক একটা অণুকে এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌরজগতে যেমন গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আণবিক জগতে (atomic world) ও অনেকটা সেইরূপ। অণুতে পৌছিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম এইখানে বুঝি গতির বিশ্রাম, ছুটাছুটির শেষ ; বাহিরে অণু যতই চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াক না কেন, তার ভিতরটা সুস্থির। এই খড়িটার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশগুলি নিয়ত দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে—আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইলেও হইতেছে। অণুগুলিতে পৌছিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এগুলি পরস্পরের সম্পর্কে যতই চঞ্চল হউক না কেন, নিজের-নিজের ভিতরে সুস্থির। কিন্তু ইলেক্‌ট্রণের গোষ্ঠী দেখা দিয়া আমাদের সে আশা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যেগুলিকে অণু বলিতেছি সেগুলিও যে এক একটা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, এক-একটা জগৎ। স্থূল জগতে যেরূপ সঞ্চলন আবর্ত্তন, কম্পন স্পন্দন চলিতেছে, অণুর ভিতরকার জগতেও সেইরূপ। এ চলা-ফেরার বিশ্রান্তি কোথায় ? সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া কোথায় আবিষ্কার করিব একটা ধ্রুবলোক, একটা অচলায়তন ? ইলেক্‌ট্রণে কি ? ইলেক্‌ট্রনগুলি বাহিরে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কে, বড়ই অশান্ত, চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; সময়ে সময়ে তাদের গতি এতই ভীষণ হয় যে তাহা আলোক-তরঙ্গের-গতির কাছাকাছি আসিয়া থাকে—অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। ইহাই হইল বাহিরের ব্যাপার। ইলেক্‌ট্রণের ভিতরটা কিরূপ ? ইলেক্‌ট্রণের ভিতরের কথা ভাবিতে কিছুদিন আগেও বিজ্ঞান সাহস পায় নাই ;

তাড়িত-অণুতে ব্রহ্মের 'অণো রণীয়ান্' মূর্ত্তির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে আমাদের কল্পনাশক্তি মুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়াছিল; আরও সূক্ষ্ম, আরও ছোট ভাবিবার মত অবস্থা তখনও আমাদের হয় নাই। কিন্তু সত্যসত্যই ইলেক্‌ট্রনকে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা (absolute limit) মনে করা চলিতে পারে কি? উর্ম্মিবিজ্ঞান (Wave Mechanics) ইলেক্‌ট্রণেরও 'হৃল্লেখা' (inner pattern) দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইলেক্‌ট্রনও ত সাবয়ব-দ্রব্য এবং তাহার একটা মাপও আছে; সুতরাং তার চেয়েও ছোট অংশ থাকারই সম্ভব; তাহারও কোন একরকম 'কলা' এবং 'বর্ণ' (partial and element) থাকারই কথা। যদি থাকে, তবে তাহারাও কি অস্থির, চঞ্চল নহে? এক একটা ইলেক্‌ট্রনকে এক একটা ঈথারের আবর্ত্ত ভাবিব কি? যদি তাহাই হয়, তবে ঈথারের সেই সূক্ষ্মতম অবয়বগুলি (ether-elements) ত চঞ্চল হইয়া পাক দিতেছে। পুনশ্চ, ঈথারই বা কি এবং তাহার সূক্ষ্ম অবয়বগুলিই বা কি এ সমস্যায় গণিত পরাভব স্বীকার না করিলেও আমাদের কল্পনা ভয়ে নিরস্ত হইয়া আসে। অথবা 'অবাস্তব' ঈথারকে বাদ দিয়া বিজ্ঞানের নূতন 'কাঠামো' (আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি) ধরিলে গণাগাথার অনাবশ্যক 'জঞ্জাল' অনেক পরিমাণে দূর হয় বটে, কিন্তু তাতে জগতের একটা সরল 'চিত্র' অবশ্য মিলে না। এই ধর না কেন 'সম্ভাব্যতা-উর্ম্মিগুচ্ছ' দ্বারা বুঝিতে চাহিলে গণাগাথার দিকে যতই সুরাহা হোক, কল্পনার দিক থেকে কিছু আসান হইল কি? অবশ্য, জগতের যেটি হৃল্লেখা (মূল কাঠামো) সেটি একটা 'কল্পনাযোগ্য' চিত্র হইতে হইবে —এ ধারণা বিজ্ঞান প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে, অণুর ক্ষেত্রেও বটে, বিপুলের ক্ষেত্রেও বটে। এ বিজ্ঞানের বাতিক—সব কিছু হিসাব মাফিক, হিসাব দুরস্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু এ সাধেও বাদ—গোড়ায় হিসাবকে ঠকিয়া আসিতে হইতেছে—মানিতে হইতেছে অনিশ্চিত সম্ভাবনামাত্রকে।

গণিতের কল্পনা বস্তুতন্ত্রতার নাগপাশে বদ্ধ নয়; গণিত ঈথারকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া যে সকল সূক্ষ্মতর অবয়ব (elements) তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, এবং যেগুলির সাহায্যে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সেগুলিকে গণিতের পরিভাষা (mathematical concepts)র ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব, অথবা

বাস্তব বলিয়া মনে করিব—এ সম্বন্ধে আপাততঃ বিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই। সোজা কথায়, সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিতে গিয়া আমরা শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘোরা-ফেরা, দোলাকাঁপাই পাইলাম। সূক্ষ্মের দিক দিয়া দেখিতে গিয়া পাইলাম স্পন্দ, চাঞ্চল্য। জগতে এমন কিছু ছোট নাই যার ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি নাই। যে চলিতেছে সেই জগৎ; অণুও চলিতেছে, সুতরাং অণুও জগৎ; ইলেকট্রনও চলিতেছে, সুতরাং সেও জগৎ; ব্যোমাংশ (ether-elements) গুলিও চলিতেছে, সুতরাং তারাও জগৎ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা এই চলাফেরা ব্যাপার! এই চলাফেরার নাম দিয়েছি স্পন্দ—ইহাকে সঞ্চলন (translation)ই বল, আর আবর্ত্তন (rotation)ই বল, অথবা ইহাদের বিবিধ সংমিশ্রণই বল। ছোটর দিক হইতে যে কথাটা পাইলাম, বড়র দিক্ হইতেও সেই কথাটাই পাই। আমাদের বসুন্ধরা চঞ্চলা; আমাদের সবিতা চঞ্চল; আমাদের ধ্রুবলোক চঞ্চল। কেহ বা বেশী, কেহ বা কম। বিশ্ব বর্দ্ধিষ্ণু। যাহাকে স্থির ভাবিতেছি সে কেবল মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলেই স্থির, বস্তুতঃ নহে। কোন স্থানেই বিশ্রান্তি ঐকান্তিক নহে, কোথাও নিরতিশয় ভাবে সুস্থিরতা (absolute rest) নাই। ব্রহ্মের যে 'মহতো মহীয়ান্' মূর্ত্তি সেও যে মহানটরাজের মূর্ত্তি, শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি নহে। জগতের সংহারের ভার যে ঠাকুরটির উপর, তাঁর ভাঙ্গের নেশা করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করার একটা বাতিক আছে শুনিয়াছি; কিন্তু যে দেবতা আধারকমলে বসিয়া শব্দব্রহ্মরূপে এই নিখিল সৃষ্টিটাকে—বেদ ও বেদ্য উভয়কেই—'নিঃশ্বসিত' করিতেছেন, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ' শুনিয়া ভাবিতা-ছিলাম, বুঝি বা বিশ্বাত্মার সমাধির শান্ত, মগ্ন ভাবই এ সৃষ্টির গোড়ার কথা; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে ত বাহিরকে গুটাইয়া আনিয়া ভিতরে আত্মস্থ করিবার সমাধি নয়, সে যে ভিতরের বাহিরে নিজেকে ছড়াইয়া দিবার বিপুল প্রয়াস, বিরাট আয়োজন; সে যে একেবারে বহু হইবার জন্য গভীর প্রসব-চাঞ্চল্য! তাই সৃষ্টিকর্ত্তার অক্ষয়সূত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি তপস্যার স্থূত আয়োজন দেখিয়া সৃষ্টির গোড়ার কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই। আর যে দেবতাটি এই 'আজব কারখানা' তদারক করার ভার লইয়াছেন, তাঁর হাতে নিয়ত চলিষ্ণু চক্রটার পানে তাকাইলে আর আমাদের ভুল হইবে না, কেমন করিয়া ও কিসের জোরে এতবড় কারখানাটা চলিতেছে। তাই বলিতে-

ছিলাম, চলাই জগতের গোড়ায়, চলাই জগতের মাঝে এবং চলাই জগতের শেষে।

জগতে সবই চলিতেছে, কিন্তু অচল কি কিছুই নাই? অচলের সঙ্গে না মিলাইলে কি সচলকে সচল বলিয়া ধরা যায়? চলিতেছি যে, ইহা বুঝিতে ও মনে করিতে কোন কিছু একটা অচলায়তন আমাদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। সকল সচলকে বুকে ধরিয়া নিজে অচল রহিয়াছে এমন কোন ভূমি বা আয়তন (absolute frame of reference) আছে কি? যদি থাকে, তবে সেটা কি? বেদ যাহাকে অক্ষর পরম বলিয়াছেন তাহাই কি? অথবা অপর কিছু? এ প্রশ্নেরও আপাততঃ জবাব দিবার চেষ্টা করিব না। তবে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে শ্রুতি বা আর্যবিজ্ঞান এই বিপুল-চঞ্চল জগৎটাকে একটা শাশ্বত, সুস্থির ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং এ হিসাবে আমাদের অনুভূতির অচল (quiescent), সচল (stressing) এই দুইটা দিক্ রহিয়াছে। এই দুইটা দিক্ জড়াইয়া লইয়া তত্ত্ব (Fact); একটা দিক্ বাদ দিয়া অপর দিক্‌টা লইলে তত্ত্বের ভগ্নাংশ মাত্র আমরা পাই (Fact-section)। তবে আপাততঃ এ কথার এই পর্য্যন্তই।

অপিচ, স্পন্দ বলিতে শুধু জড়ের চলাফেরাই যেন না বুঝি। জড় মানে এস্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্ত দ্রব্য (matter)। গ্রহ নক্ষত্রগুলি ছুটিতেছে, ঈথারে বা আকাশে অণুগুলি, ইলেকট্রনগুলি দৌড়াইতেছে—এ সমস্ত চলাফেরা জড়ের চলাফেরা (motion)। কিন্তু বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়ার পর মনে এক ঘটি জল খাইবার ইচ্ছা হইল; মন একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় পরিণত হইতেছে; মনের যে এই প্রকার পরিণতি (becoming) তাহা ত রসগোল্লার হাত হইতে মুখবিবরে আসার মত ঠিক নহে; মন একদেশ হইতে অপরদেশে ঠিক যাইতেছে না; ইহা ঠিক দৈশিক বা স্থানিক পরিবর্ত্তন (change of configuration) নহে। বালকের মন দ্বিতীয় ভাগের 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' ছাড়িয়া রাস্তায় যে লাটিম ঘুরিতেছে বা আকাশে যে ঘুড়ি উড়িতেছে তার দিকে গেল; এ যাওয়া কিন্তু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের সন্নিধানে বসিয়াই হইতেছে। জড়দ্রব্যের মত মনেরও চলাফেরা হয় কি না, সে কথার এখানে আলোচনা করায় লাভ নাই। ভাবের বহিঃসঞ্চার

(thought-transference) যথার্থ হইতেও পারে, তবে এখানে আমরা যে পার্থক্যের কথা বলিতেছি তাহা স্মরণ রাখাই ভাল। জড় মানে যদি দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই হয়, তবে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য জড়েরই ধর্ম্ম, চৈতন্যের নয়, এ কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু জড় মানে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দ্রব্য হয়, তবে 'স্পন্দ' শব্দটাকে শুধু জড়েতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না; জগতের গোড়ার কথা যে স্পন্দ তাহা শুধু জড়েরই স্পন্দ নহে। জগতের গোড়ায় একটা বিরাট নীহার-সমুদ্রের (nebulæ) কণিকাগুলি কাঁপিতেছিল, ছুটিতেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না—শুধু ইহা আমরা বলিতেছি না। আমরা অমনধারা জড়বাদী হইতে বাধ্য নই।

এই স্পন্দ, চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভই শব্দ, যে শব্দ হইতে জগৎ চলিয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে শব্দ বলি তাহা এই মৌলিক ও বিশ্বপ্রসূ বাকেরই এক প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি (one stream of effectual manifestation)। এই প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হইতে হইলে যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মৌলিক, স্পন্দাত্মক শব্দের নাম দেওয়া হউক পরশব্দ; আর যে শব্দ আমরা বা আমাদের মত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবেরা কাণে শুনিতেছি, সেটার নাম দেওয়া হউক অপরশব্দ, অথবা শুধুই শব্দ। পরশব্দ হেতুভূত, অপর শব্দ কার্য্যভূত; পরশব্দ বা চাঞ্চল্য হইতেছে বলিয়াই আমরা শব্দ শুনিতেছি—ট্রামের ঘণ্টার রেণুগুলি কাঁপিতেছে, বাতাসকে কাঁপাইতেছে এবং আমাদের স্নায়ুগুলীকে কাঁপাইতেছে বলিয়াই আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। অপরশব্দ অভিব্যক্ত শব্দ; কতকগুলি সহকারী কারণ ও অবস্থার যোগাযোগ হইলে তবে পরশব্দ অপরশব্দরূপে অভিব্যক্ত হইবে, নতুবা হইবে না। কিন্তু সেরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হউক আর নাই হউক, পরশব্দের পরশব্দত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় না। হিমালয়ের কোন জন-সম্পর্ক-শূন্য এক স্থানে একটা জলপ্রপাত শিলার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পর্ব্বতমালাকে হয়ত চির-সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; এ ক্ষেত্রে জলকণিকাগুলির কম্পন, বাতাসের কম্পন প্রভৃতিতে সচলতার, স্পন্দনের আয়োজন খুবই প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুনিবার কাণ যদি সেখানে না থাকে তবে সে বিপুল চাঞ্চল্য ভৈরবগর্জ্জনরূপে আর নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। এ স্থলে পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু

অপরশব্দ বা শ্রাব্যশব্দ নাই। বাতাস, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনঃসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্ত বা সহকারী কারণ না পাইলে পরশব্দ শুধু চাঞ্চল্যরূপেই থাকিয়া যায়, শ্রবণগ্রাহ্য-শব্দরূপে উপস্থিত হয় না। চন্দ্রমণ্ডলে নাকি বায়ু নাই; অগ্ন্যুৎপাতে চন্দ্রমণ্ডলের কোন অংশ ভীষণ ভাবে ফাটিয়া গেল; আমাদের পৃথিবীর অথবা মঙ্গলগ্রহের কোন বৈজ্ঞানিক কাণ খাড়া করিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কারণ, শব্দ এতই অভিজাত ব্যক্তি যে বাহন ছাড়া এক পাও চলেন না; এ ক্ষেত্রে বাহনের, অর্থাৎ বাতাসের অভাব। এ দৃষ্টান্তেও পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু অপরশব্দ নাই। অতএব অপরশব্দ ও পরশব্দ এ দুটা আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। অপরশব্দ বা ধ্বনি যেখানে রহিয়াছে সেখানে পরশব্দ বা চাঞ্চল্য মূলে থাকিবেই; কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই যে আমরা বা অপর কেহ ধ্বনি শুনিতে পাইব, এমন কোন ধরাবাঁধা ব্যবস্থা নাই। যেখানে শুনিতে পাই সেখানে সহকারী কারণগুলি বিদ্যমান; যেখানে পাই না, সেখানে স্পন্দ হয় ত রহিয়াছে, কিন্তু সহকারী কারণগুলি রীতিমত ভাবে নাই।

সহকারী কারণগুলি শুধু থাকিলেই হইল না, রীতিমতভাবে থাকা চাই। কারণ বা হেতুগুলির রীতিমত ভাবে থাকার নাম আমাদের দেশী পরিভাষায় যোগ্যতা। কাজেই, হেতু বা নিমিত্তগুলি রীতিমত ভাবে না থাকিলে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য হয় না। যে পরশব্দ শ্রবণযোগ্য নয় তাহাকে এখনি অশ্রাব্য শব্দ বলিয়া ফেলিতে লোভ হইতেছিল; তবে, এই নীরস, কঠিন কথা পাড়িয়া একে আপনাদের সহিষ্ণুতার সীমা পরীক্ষা করিতে হইতেছে, তার উপর কথাগুলা যদি আবার অশ্রাব্য হয়, তবে হয় ত আপনারা কাণে আঙুল দিয়া উঠিয়া পড়িবেন; সুতরাং শব্দের শ্রাব্য ও অশ্রাব্য এরূপ দ্বৈবিধ্য পরিহার করিয়া, পরশব্দ ও অপরশব্দ এইরূপ দ্বৈবিধ্য লইয়াই আমায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, স্পন্দ বা চাঞ্চল্য যেমন তেমন হইলে আমাদের কাণে তাহা শব্দরূপে ধরা দেয় না। অণুপরমাণুগুলির চলাফেরা আমি শুনি না। চিনির ঢেলা জলে ফেলিয়া দিলাম। চিনি জলে গুলিয়া যাইতেছে। শর্করা-কণার জলে ছড়াইয়া পড়া আমি শুনিতে পাই না, যদিও সে শর্করা-মিশ্রিত-জল অপর একটা বাচাল ও সরস ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসিলে আমার যে কেবল পিপাসা মিটে এমন নহে, প্রাণটাও মিঠা হইয়া যায়।

অণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনদের একটা চঞ্চল জগৎ আছে; কিন্তু আমার কাছে সে জগতের ভাষা নাই। জীবের জীবনকোষের (cell) মধ্যে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম পাক দিতেছে (rotation of protoplasm); নিদাঘ মধ্যাহ্নে বনস্থলী যখন নীরব তখন পাদপরাজির পাতায় পাতায় জৈব পদার্থের নৃত্যশব্দ একটা মহামুখরতা রচনা করিয়া রাখিত, যদি সে শব্দ শুনিবার মত কাণ আমাদের থাকিত; বহুদিন হইল অধ্যাপক হক্সলি আমাদের সে বিপুল জীবন সঙ্গীত শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অভ্যুদয়-বাদ (Evolution theory) এর কল্যাণে আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গেলে বড় সুবিধা হইবে না, তবে শ্রবণশক্তির বিস্তার যদি বাড়িয়া যায়, তবে না হয় একদিন আচার্য্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা সবান্ধবে যাইব। ম্যাক্সওয়েলের ভূত তাপবিজ্ঞানের সমীকরণের একটা ভয়ানক শক্ত আঁক কষিয়া ফেলিয়াছে; এবং চঞ্চল জগতের অণুগুলিকে লইয়া দুইটা কামরায় আপন হিসাব মত বিলি করিয়া যাইতেছে; আমাদের সতর্কদৃষ্টি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে সেই বৈজ্ঞানিক ভূতটার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। ভরসা করি, যেদিন বৈজয়ন্তধাম হইতে রথ নামিয়া আসিয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশ্বোত্তীর্ণ পদবীতে, সত্যলোকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহার আত্মা অব্যাহত, অনাবিল দৃষ্টিতে সেই ভূতটার হিসাবের খাতাখানাই যে বেশ করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন এমন নহে, তার এলাকাভুক্ত চঞ্চল জগৎটাকে বাঙ্ময় জগৎ, শব্দময় জগৎ রূপেও চিনিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে অণুর জগৎ এখন পর্য্যন্ত শুধুই চঞ্চল জগৎ—তাহার ভাষা নাই।

আর দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই, কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ। মনেই হউক আর জড়েই হউক, ইলেক্ট্রণেই হউক আর গ্রহ-উপগ্রহেই হউক, চেতনাতেই হউক আর জীবকোষেই হউক, যে কোন প্রকার স্পন্দ বা চাঞ্চল্যকে আমরা পরশব্দ বলিব। সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই আর নাই-ই পাই। যদি পাই তবে তাহাকে অপরশব্দ বা ধ্বনি (Sound) বলিব। যে চাঞ্চল্য হরির শব্দজ্ঞান হয় না, তাহাতে হয়ত যদুর শব্দ জ্ঞান হয়। হরির চেয়ে যদুর কাণ তীক্ষ্ণ। কুকুর হয়ত মানুষের চেয়ে বেশী শুনিতে পায়; যে সব ক্ষেত্রে আমাদের শব্দানুভূতি নাই সেখানে হয়ত তার আছে। কুকুরের চেয়ে বেশী শুনিতে পায়

এমন জীবও থাকিতে পারে। যন্ত্র সাহায্যে (megaphone, microphone প্রভৃতি) পিপীলিকার পাদসঞ্চারও হয়ত আমরা শুনিতে পারি। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—সুতরাং যিনি যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্মশব্দ শুনিতেছেন তিনি যোগী। যোগী অন্যপ্রকারও হইতে পারেন। হিন্দুদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি সংযম প্রক্রিয়া (অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি) দ্বারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পারেন। চাই কি—অণু-পরমাণু, ইলেক্‌ট্রনদের চঞ্চলচরণে ছুটাছুটি তাঁর কাছে ভাষাহীন, নীরব না হইতে পারে। তবেই শ্রবণ-সামর্থ্য (capacity of hearing) আপেক্ষিক (relative), তারতম্য-বিশিষ্ট (variable) এবং অবস্থাধীন (conditional) হইতেছে। এ যোগ্যতা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে। তুমি আমি সচরাচর যে শব্দ শুনি তাহাকে স্থূলশব্দ বলা যাক্। যন্ত্র সাহায্যে যে শব্দ শোনা যায় বা যোগী যে শব্দ শুনিতে পান তাহাকে সূক্ষ্ম (subtle) শব্দ বলা যাক্। কিন্তু সব যন্ত্র এক রকম নয়, সকল যোগীর অনুভব-সামর্থ্য তুল্যমূল্য নয়; সুতরাং সূক্ষ্মশব্দেরও নানান্ থাক্ (gradations) অবশ্যই হইবে। বৈজ্ঞানিক বা যোগীও শব্দকে ঠিকভাবে বা পূরাপূরি (perfectly ও unconditionally) শুনিতে পান না; কারণ তাঁরও শ্রবণসামর্থ্য যে আপেক্ষিক ও অবস্থাধীন। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোনও অবস্থায় শব্দের ঠিকভাবে, নিরতিশয়রূপে শোনা আছে কি? এমন কোনও শ্রবণসামর্থ্য আছে কি যাহা সম্পূর্ণ ও নিরতিশয় (perfect ও absolute)? সত্যসত্যই আছে কিনা কে বলিবে, তবে গণিতশাস্ত্রের নজিরে ধরিয়া লওয়া হউক যে সেরূপ একটা অনুভব-সামর্থ্য আছে—এমন একটা জ্ঞানভূমি আছে যেখানে অন্য কোনও উপাদান বা নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা স্পন্দমাত্রকে শব্দরূপে যথাযথ ধরিতে পারে। বাতাস বা ঈথার থাকুক্ আর নাই থাকুক্, বস্তুর চাঞ্চল্য বা স্পন্দ যদি কোন চৈতন্যে যথাযথ বা নিরতিশয়-ভাবে শব্দরূপে অবিব্যক্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তির যে পরাকাষ্ঠা আমরা খুঁজিতেছিলাম তাহাই সেখানে পাইলাম। এই প্রকার যে শ্রবণ-সামর্থ্য তাহাকে Absolute Ear বা নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য বলিতে পারা যায়। এই পারিভাষিক শব্দটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করিতে যাই, তবে হয়ত হাস্যাস্পদ হইব। নিরপেক্ষ কর্ণ বা নিরতিশয় কর্ণ, এইরূপ একটা অদ্ভুত কথা শুনিলে আমরা কেহই সহিষ্ণু থাকিতে পারিব না। কিন্তু পরিভাষা যাহাই

হউক, জিনিষটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। আমরা 'কর্ণ' বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা সেরূপ কর্ণ না হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দানুভব-সামর্থ্য কম-বেশী হইয়া থাকে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে এ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা কোথায়? কোনও ব্যক্তিবিশেষে এ সামর্থ্য নিরতিশয়ভাবে পরিসমাপ্ত হউক আর নাই হউক, 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' এমন ধারা কোনও একজন 'পুরুষ' সত্যসত্যই থাকুন আর নাই থাকুন, আমরা গণিতশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে যদি একটা অনুভব-সামর্থ্যের বিরামস্থান, পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লই, তবে তাহাতে আমাদের অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক বন্ধুর শিরঃসঞ্চালন করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বৃত্তের ভিতরে একটা বহুভুজ ক্ষেত্র আঁকিয়াছি; যদি ক্ষেত্রের ভুজসংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে থাকি, তবে ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃত্তের পরিমাণের ক্রমেই কাছাকাছি হইতে থাকে। এ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, বহুভুজ ক্ষেত্রটির ভুজসংখ্যা যদি অনন্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার চৌহদ্দী বৃত্তের সঙ্গে শেষকালে মিলিয়া যাইবে না কি? সত্যসত্যই হাতে কলমে কিন্তু কখনই দুইটিকে একান্তভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায় না; তবে পরীক্ষার জের কল্পনা সারিয়া লইতেছে। তুমি বৈজ্ঞানিক, অণুর কথা বলিতেছে; তাহা কি তোমার সূক্ষ্মতা ভাবনার একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) নহে? ইলেক্‌ট্রণের কথা বলিভেছ, তাহাও যে তোমার সংজ্ঞার (unit charge of electricity) ঠিক লক্ষ্যার্থ, এ কথা কি তুমি হলফ করিয়া বলিতে পারিবে? যে জিনিষের একটা বেশি কমি আছে, ক্রমিকধারা (series) আছে, তাহারই একটা পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লইবার আমাদের অধিকার আছে, এবং সেরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ায় অনেক সময় আমাদের বোঝাপড়ায় বিশেষ সুবিধা হয়; এরূপ কল্পনা করার অধিকার না দিলে ক্যাল্‌কুলাস্ নামক গণিতশাস্ত্রটাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়া থাকিত। যাহা হউক, অনুভব-সামর্থ্যের নানান্ থাক্ দেখিয়া তাহার একটা পরাকাষ্ঠা আমরা কল্পনা করিতেছি, এবং সেটারই নাম দিতেছি Absolute Ear. আমাদের শোনা অল্প, এ প্রকার শোনা সমগ্র; আমাদের শোনা প্রায়িক, এ প্রকার শোনা যথার্থ; আমাদের শোনা সাপেক্ষ, এ প্রকার শোনা নিরপেক্ষ। শুধু শোনা কেন, দেখা প্রভৃতি অনুভূতির অপরাপর ধারাগুলি সম্বন্ধে আমরা এক একটা পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া

লইতে পারি; তাহা হইলে Absolute Eye, Absolute Tongue প্রভৃতিও আসিতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এগুলি এক একটা শক্তি বা সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র; চোখ, কাণ, জিব্ ইত্যাদির মত স্থূল কোন দ্রব্য না হইতেও পারে।

এরূপ কর্ণকে (Absolute Earকে) পারমার্থিক-কর্ণ বলিব কি? নাম যাহাই দেওয়া হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য। শুনিবার জন্য এই কর্ণের কেবল একটা হেতুর অপেক্ষা করিতে হয়—সেটি স্পন্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকিলেই এই কর্ণ শুনিতে পাইবে, এবং এমনভাবে শুনিতে পাইবে যে, সে শোনার চেয়ে খাঁটি ও বেশী শোনা আর কিছু হইতে পারে না। এই পারমার্থিক-কর্ণ দ্বারা যে শব্দের অনুভব হয় তাহাকে এই প্রসঙ্গে শব্দতন্মাত্র বলিতেছি। দর্শনশাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এ ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বিচার করিবেন। পারমার্থিক-কর্ণ দ্বারা আমরা শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় মূর্ত্তিটি (sound as it is) গ্রহণ করিতে পারি। ইহা যেন শব্দের প্রকৃতি; আর তুমি আমি, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও যোগীও যে শব্দ শুনিতেছেন, সেটা অল্পবিস্তর শব্দের বিকৃতি—এ শব্দের বেশিকমি আছে, ভুলভ্রান্তি আছে; কেহ বেশি শুনিল, কেহ কম শুনিল; আমি যেভাবে শুনিলাম, তুমি সেভাবে শুনিলে না; আমি ভুল শুনিলাম, তুমি কতকটা ঠিক শুনিয়াছ; আমি যেখানে আদৌ শুনিতে পাইলাম না, তুমি সেখানে কিছু শুনিলে; এইজন্য ইহা শব্দের বিকৃতি। তবেই আমাদের লক্ষণানুসারে শব্দতন্মাত্র শব্দের প্রকৃতি হইল—শব্দের প্রকৃতি, শব্দের প্রসূতি নহে। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র এবং পরশব্দ এক জিনিষ নহে। পরশব্দ কারণীভূত (causal) চাঞ্চল্য (stress) মাত্র—যে চাঞ্চল্যের জন্য শব্দজ্ঞান হয় সেইটা মাত্র; সে নিজে শ্রুতশব্দ (sound) নহে। ইহা শব্দের প্রসূতি। কিন্তু শব্দতন্মাত্র শ্রুতশব্দ, তবে তাহা তোমার আমার কাণে শোনা শব্দ নয়, পারমার্থিক-কর্ণে শ্রুত নিরতিশয় শব্দ। কাজেই শব্দতন্মাত্রও অপর শব্দের ভাগেই পড়িতেছে। তবে অবশ্য অপরশব্দগুলির সর্ব্বোচ্চ থাক্ বা পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। তার নীচে নানান্ থাকের শব্দ রহিয়াছে; সেগুলিকে মোটামুটি দুইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকযন্ত্র সাহায্যে অথবা ধ্যান-ধারণা দ্বারা যে শব্দগুলি আমরা শুনিতে পারি, কিন্তু যেগুলিকে সচরাচর আমরা শুনিতেছি না, সেইগুলি সূক্ষ্মশব্দ; তাহাদের পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। আর

সচরাচর কাণে আমরা যে শব্দগুলি শুনিয়া থাকি (যথা বাঁশীর শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি), সেগুলি স্থূলশব্দ। অতএব অপরশব্দের বা শ্রুতশব্দের (soundএর) মোটামুটি তিনটা বিভাগ পাইলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু থাক্ (gradations) গণনাতীত ; যত রকমের কাণ তত রকমের শোনা ; দেশ-কাল পাত্র বদ্‌লাইলেই শোনাও বদ্‌লাইয়া যায়। বিভাগ তিনটি এই :— শব্দতন্মাত্র (বা শব্দের প্রকৃতি) ; সূক্ষ্মশব্দ (অতীন্দ্রিয় বলিব কি ?) ; এবং আমাদের আটপৌরে স্থূলশব্দ (normal sound)। এ তিনটি ছাড়া এবং এ তিনেরই মূলে যে চাঞ্চল্যের বীজ রহিয়াছে, যেটা না থাকিলে কেহই শুনিতে পান না, এমন কি স্বয়ং প্রজাপতিও শুনিতে পান না, সেইটাকে আমরা আগাগোড়া পরশব্দ বলিয়া আসিতেছি। তিন রকম শ্রুতশব্দের জন্য তিন থাকের কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্য আবশ্যক। শব্দতন্মাত্রের জন্য পরমার্থিককর্ণ (Absolute Ear) ; সূক্ষ্মশব্দের জন্য দিব্যকর্ণ (Yogik ear) ; এবং স্থূলশব্দের জন্য ভৌতিককর্ণ (Normal ear)। ফলকথা, শব্দের দিক হইতে হিসাব লইলে আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের পাঁচটা অবস্থা। অনুভবের যদি কোনও তুরীয় ভাব থাকে, যেখানে আদৌ ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই, তবে সেটা অশব্দের অবস্থা ; কারণ, চাঞ্চল্য না থাকিলে শব্দ থাকে না। তারপর চাঞ্চল্য রহিয়াছে কিন্তু শুনিবার কোনওরূপ কাণ নাই ; ইহাই পরশব্দ। তারপর, চাঞ্চল্য রহিয়াছে এবং তাহা নিরতিশয়ভাবে শোনা হইতেছে ; ইহাই শব্দতন্মাত্র। তারপর, চাঞ্চল্যটাকে আমাদের ভৌতিককর্ণ ধরিতে পারিতেছে না, কিন্তু দিব্যকর্ণ ধরিয়া ফেলিতেছে, ইহাই সূক্ষ্মশব্দ। সর্ব্বশেষে, চাঞ্চল্য ভৌতিক-কর্ণটাকেও উত্তেজিত করিয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে। ইহাই স্থূলশব্দ।

একটা কথা, সকলপ্রকার শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্য (stress) রহিয়াছে তাহাকে আদৌ 'শব্দ' বলিতেছি কেন ? যখন সেটাকে শুনিলাম তখনই সেটা শব্দ, যখন শুনিতেছি না, তখন সেটা শব্দের সম্ভাবনা (possibility) মাত্র, শব্দ নহে। ঠিক কথা ; কিন্তু পরশব্দকে শব্দ বলিবার কৈফিয়ৎ আমাদের একটা আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আমাদের অনুভূতির এই পাঁচটা ধারা। এই পাঁচটাই আবার যে উৎস হইতে নির্গত হইতেছে তাহা পরশব্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য যে গোড়ায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সেটাকে রূপ, রস প্রভৃতি আখ্যা না দিয়া শব্দ আখ্যা দিতেছি কেন ? শব্দের এমন

বিশেষত্ব কি আছে যাহাতে তাহাকেই সকলের মোড়ল করিয়া বসাইতে হইবে? পরশব্দ যে প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ (sound) নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই তাহাকে শব্দ বলিতে গেলে আমাদের অধ্যাস (impose) করিতে হয়। এক কারণের যদি অনেকগুলি কার্য্য থাকে তবে তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কার্য্যটিকে আমরা কারণের সঙ্কেত (symbol, sign) ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই। হ্রদের সুস্থির জলরাশির কাছে দাঁড়াইয়া নীরবতা অনুভব করিয়াছি; জলে যে চাঞ্চল্য নাই, শব্দ হইবে কেন? আবার, পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া বিপুল সিন্ধুগর্জ্জন শুনিয়াছি; শুনিব না কেন, লবণাম্বুরাশির ধারানিবদ্ধা তরঙ্গমালা যে বেলাভূমিতে নিয়তই আছড়াইয়া পড়িতেছে। নীরবতা সুস্থিরতার সঙ্কেত, মুখরতা চাঞ্চল্যের সঙ্কেত। যেখানে শান্তি সেখানে মৌন; যেখানে ক্ষোভ, ছুটাছুটি সেইখানে কোলাহল। সাম্যাবস্থা, শান্তি বুঝাইতে মৌনের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কোথায় পাইব? বৈষম্য, অশান্তি, চাঞ্চল্য বুঝাইতে শব্দের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কি আছে? যেখানে রূপ দেখিতেছি, রসাস্বাদ করিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, সেখানেও মূলে এক প্রকার না এক প্রকার চাঞ্চল্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চাঞ্চল্য স্পষ্ট নহে—পরীক্ষায় ধরা পড়ে। হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে বসিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গোটা কয়েক চূড়া দেখিতেছি; অথবা মুশৌরির সেনানিবাস পর্ব্বতে বসিয়া সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর কর্পূরকুন্দেন্দুধবল বিরাট বপুঃ নিষণ্ণ রহিয়াছে দেখিতেছি। এই যে রূপজ্ঞান, ইহার মূলেও ঈথারতরঙ্গগুলির বা ঐ রকম একটা কিছুর চঞ্চল অভিসার রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাকাইয়া দেখি যেন একটা বিপুল, ভাস্বর নিসর্গগৌরব চিত্রার্পিত হইয়াই রহিয়াছে—কোথাও একটু ক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই; সব শান্ত, সমাহিত। এটা কিন্তু আমার দৃষ্টির স্বাভাবিক কৃপণতা, আমার বোঝার ভুল। অত সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য আমার কাছে চাঞ্চল্য বলিয়া ধরা পড়ে না। মন্দিরে পূজায় বসিয়া দেবতার পায়ে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম নিবেদন করিয়া দিয়াছি; তার স্নিগ্ধ সৌরভ আমার ভাব আরও গাঢ় করিয়া দিতেছে। অবশ্য, গন্ধবহ পদ্ম-পরাগরেণু বহিয়া আনিয়া আমার নাসিকার ত্বকে ছিটাইয়া না দিলে আমি গন্ধ পাই না; কিন্তু গন্ধ পাইয়া, এত আহরণ, বিকিরণ ও বিতরণের কথা তো কৈ আমার মনে হয় না; আমি মনে ভাবি পদ্ম-পরিমল যেন একটা স্নিগ্ধ

শান্তি-প্রলেপের মত আমার প্রাণের উপর লাগিয়া রহিয়াছে। এখানেও চাঞ্চল্য অনুভবে ধরা পড়ে না, পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই জন্য রূপ, রস প্রভৃতি চাঞ্চল্যহেতুক হইলেও চাঞ্চল্যের সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীক নহে। কিন্তু শব্দ ও চাঞ্চল্য যেন এপিঠ-ওপিঠ ; দেখিলে সন্দেহ বা ভ্রম থাকিতেও পারে, যেটা দেখিতেছি সেটা অস্থির কি সুস্থির ; কিন্তু ডাক শুনিলে আর সন্দেহই থাকে না যে, যে ডাকিতেছে সে অস্থির। তাই শব্দ চাঞ্চল্যের খুব স্পষ্ট ও অব্যভিচারী সঙ্কেত। কাণে বায়ুতরঙ্গের ধাক্কা অনেকটা ধাক্কার মতনই বোধ হয়, কিন্তু চোখে (retina) ঈথারতরঙ্গের ধাক্কা আমরা প্রায়ই ধাক্কা বলিয়া জানিতে পারি না।

শব্দের শক্তিও অদ্ভুত। অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি, স্ফোট প্রভৃতি লইয়া তার্কিকেরা মারামারি করুন, আমরা আপাততঃ ওদিকে ভিড়িব না। একটা মসৃণ কাচের উপর সূক্ষ্ম ধূলিরেণুসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে বসিয়া বেহালার একটা গৎ বাজাইতেছি। শব্দতরঙ্গগুলি ধূলিরেণুগুলিকে ধীরে ধীরে সাজাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত করিয়া দিবে। শব্দের নিজের ছন্দের (harmony) অনুরূপ একটা মূর্ত্তি সৃষ্টি করার শক্তি রহিয়াছে। অতএব শব্দ শুধু চাঞ্চল্যের সঙ্কেত নহে ; তার গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তি আছে। জগতে গড়াভাঙ্গা মানে চাঞ্চল্য ; শব্দও গড়িতে ভাঙ্গিতে পারে ; অতএব শব্দ, চাঞ্চল্যের আত্মীয় ও প্রতিনিধি। রূপ বা রসের সত্য সত্যই বাহিরে একটা কিছু গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তির পরিচয় আমরা বড় একটা পাই না। ভিতরে রূপের বা রসের ভাঙ্গিবার-গড়িবার শক্তি অস্বীকার করিতে আমার সাহস নাই। শব্দ স্পষ্টতঃ শক্তিস্বরূপ (dynamic) এবং স্রষ্টা (creative)। শুধু ধূলিকণা লইয়া নহে, অন্যান্য উপায়েও শব্দের এই স্বরূপ ও সামর্থ্য পরীক্ষিত হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবিষ্কৃত রেডিয়াম (radium) নামক দ্রব্য নিয়তই তাপ বিকিরণ করিতেছে দেখা যায়। এ তাপের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। আমরা জানি যে তাপ কোনও একটা বস্তুর অণুগুলির এলোমেলো ভাবে স্পন্দন মাত্র (irregular molecular quiver) ; যে জিনিষের দানাগুলি ঐরূপ ভাবে কাঁপিতেছে সেই জিনিষটা আমাদের অনুভূতিতে গরম বলিয়া ঠেকে। রেডিয়াম অত তাপ পাইতেছে কোথায় ? ব্যাখ্যাটা বোধ হয় এইরূপ :—

রেডিয়ামের অণু (atoms) গুলি ফাটিয়া যাইতেছে, সবাই একসঙ্গে নয়, পালা করিয়া—বিজ্ঞানের অণু সাবয়ব ও পরিমিত দ্রব্য মনে রাখিবেন। অণুর টুকরাগুলিকে দহরাণু বা অবমাণু (sub-atoms) বলা যাক্। সেই অবমাণু-গুলির কতক-কতক রেডিয়ামের ভিতর হইতে ভীষণ বেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে; কতক বা রেডিয়ামের অন্যান্য অণুতে ধাক্কা (collision) খাইয়া সেগুলিকে কাঁপাইয়া দিতেছে। অণুগুলির এই প্রকার দোলনই তাপ-রূপে অভিব্যক্ত হয়। কতকগুলি সমিধ্ সাজাইয়া লইয়া 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গের ঠিক নির্দ্দেশ মত 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি বেদমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছি। এই শব্দের মূলে যে স্পন্দ (vibration) রহিয়াছে সেটা যেমন বায়ুকে কাঁপাইয়া তোমার আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে, সেইরূপ সমিধের দানাগুলিতেও ধাক্কা দিতেছে। সে ধাক্কা এরূপভাবে ছন্দোবদ্ধ যে, সে ধাক্কার ফলে সমিধের সূক্ষ্ম-দানাগুলি ফাটিয়া যাইলেও যাইতে পারে। তা ছাড়া, অণুর ভিতরে ইলেকট্রনগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ও রীতিতে ঘুরিতেছে; তাদের ঘোরার একটা ছন্দঃ আছে (harmonic motion)। আমার উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ছন্দঃ (super-sonic শব্দতরঙ্গের ছন্দঃ) ইলেকট্রণের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ অথবা অনুপাতী হইলে, তাহার সহিত সংযুক্ত (compounded) হইয়া তাহাকে উপচিত করিয়া তুলিতে পারে। দুইটা বেহালা যদি এক স্বরে বাজান হয় তবে স্বরদ্বয়ের সংযোগ ও উপচয় হয়, সেইরূপ। এখন ইলেকট্রনগুলির বেগ উপচয়ের ফলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা (critical value) ছাড়াইয়া যায়, তবে তাহারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছটকাইয়া আসিবে। তারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া গেলেই অণু-অঙ্গ ফাটিয়া গেল; গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া গেলে সৌরজগতের যেমন অবস্থা হইবে, সেইরূপ। কক্ষচ্যুত গোটাকতক ইলেক্‌ট্রন অবশ্য প্রবলবেগে সমিধের দানাগুলিতে ধাক্কা দিবে এবং সেগুলিকে কাঁপাইতে থাকিবে। এ কম্পনের অভিব্যক্তি কিসে? তাপে। পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ ধরিয়া এ ব্যাপার চলিলে তাপ ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সমিধ্ জ্বালাইয়া তুলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তিতে সমিধ্ জ্বলিয়া উঠিল। রেডিয়ামের বা অন্যদৃষ্টান্তে এ কথাটাকে আর নিতান্ত গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষণীয় ব্যাপারে সুসংস্কার-কুসংস্কারের কথা অবান্তর,—সেখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কেই সাবধানে পথ

হাতড়াইয়া চলিতে হয়। বিজ্ঞানে পরীক্ষাগারে অণুর "কেন্দ্র" (নিউক্লিয়াস) বিদীর্ণ করিয়া মহাবিপুল শক্তি উন্মুক্ত করিবার যে নূতন পদ্ধতি (টেক্‌নিক্) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে একটা ক্ষুদ্রাদপি বস্তুর মাঝে কেবল সামান্য অগ্নি কেন, প্রলয়াগ্নি পর্য্যন্ত কখন মহাত্রাসরুদ্ররূপে—কখনও বা সর্ব্বতোভদ্র বিশ্ব-শিল্পীরূপে আবির্ভূত হইবার বাধা নাই।

দহরাণুগুলিকে নাড়াচাড়া করার সামর্থ্য যদি শব্দের থাকে (থাকা অসম্ভব নয়), তবে সেগুলিকে ছড়াইয়া সাজাইয়া শব্দ অনেক অঘটন ঘটাইতে পারে। ঈথারের দানাগুলি অথবা ইলেকট্রনগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া শব্দ যে দেবতার তৈজসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে, সে কথার ব্যাখ্যা আপনারা হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাইবেন। আরও এক কথা—জলীয় বাষ্পের মেঘের দানারূপে পরিণত হইবার পক্ষে এক একটা ঘনীভাবকেন্দ্র (centres of condensation) চাই, অন্ততঃ পাইলে সুবিধা হয়; কোনও একটা ইলেকট্রন বা অন্য সূক্ষ্ম জিনিষকে কেন্দ্রস্বরূপ না পাইলে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া জলকণায় পরিণত হয় না। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে যজ্ঞীয় ধূম ছাড়া, মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত শব্দ-স্পন্দগুলি উপযুক্ত ভাবে ইলেকট্রন প্রভৃতি ছড়াইয়া দিয়া ঐরূপ ঘনীভাবের কেন্দ্রসমূহ রচনা করিয়া দিতে পারে, তবে মন্ত্রশক্তির ফলে পর্জ্জন্য ও বৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। এ ক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখার কথা অনেক। প্রথমতঃ, শব্দের ইলেক্ট্রণাদি পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সত্য সত্যই সম্ভাবনা আছে কি না; অভিব্যক্ত শব্দ (sound) যে বায়ুস্পন্দগুলি সৃষ্টি করিতেছে শুধু সেগুলির কথা বলিতেছি না; অভিব্যক্ত শব্দের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে (super-sonic গ্রামসমূহে) এবং মূলে যে চাঞ্চল্যাত্মক পরশব্দ রহিয়াছে সেটার কথাও ভাবিতে হইবে। হ্রীঁ বা ক্রীঁ উচ্চারণ করিতে যাইলে আমার ভিতরে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ প্রথমতঃ হয়; পরে তাহা উচ্চারণ যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া বাতাসকে চঞ্চল করে; সেই বাতাসের চাঞ্চল্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোমার ও আমার শব্দজ্ঞান জন্মায়।

গোড়ায় সেই প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ; আপাততঃ আরও তলাইয়া না হয় নাই-ই দেখিলাম। এখন প্রশ্ন এই—প্রাণশক্তি স্বরূপতঃ কি? তাহার স্পন্দ ঈথার অথবা ইলেকট্রন প্রভৃতি পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না? আবার, মন্ত্রশক্তি দ্বারা এ সকল অঘটন-ঘটনা যদি সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয়,

তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়া যাইবে—বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলিই সেই মন্ত্র কি না? এগুলি ভাবিয়া দেখার কথা এবং পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লওয়ার কথা। আমি এখানে গোটা কয়েক কথা প্রশ্নরূপে পাড়িয়া পরীক্ষা ও মননের জন্য একটা পতিত জমির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাটা এরূপও হইতে পারে, অন্য প্রকারও দাঁড়াইতে পারে। বস্তুর মোটা মোটা দানাগুলিকে শব্দ যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারে, তাদের একটা বিশিষ্ট আকার দিতে পারে, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একখানা ধূলিধূসরিত কাচের সম্মুখে বেহালার গৎ বাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। অন্ততঃ এ সব পরীক্ষিত ক্ষেত্রেও আমরা শব্দকে স্রষ্টা (creative) বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। সূক্ষ্ম পর্য্যায়ের (super-sonic) শব্দগুলির ("silent sound") রাসায়নিক, জৈবিক ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে অদ্ভুত গড়ন ও ভাঙ্গনের ক্ষমতা আমরা তো জানিয়াছি। রোগ নিরাময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কিছু অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অঘটনঘটনও ইহা দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে বা হইতে পারে। এই জন্য বলিতেছিলাম শব্দ জগতের মৌলিক স্পন্দের (causal stressএর) খুবই উত্তম সঙ্কেত। আদিকারণের কার্য্য-প্রবাহরূপে, ব্রহ্মেব জগৎরূপে আবির্ভূত হইবার যে উপক্রম ও অবস্থা তাহাকে "শব্দব্রহ্ম" বলিলে বেশ সুসঙ্গতই হয়। ইহা যেন একটা বিরাট্ সুষুপ্তির পর বিরাট্ জাগরণ; মহামৌনব্রত-ভঙ্গের পর প্রথম আলাপন। ইহার উপক্রম একটা চাঞ্চল্যে—"এক আমি, আমার আর এক থাকিলে চলিবে না, বহু হইতে হইবে," এইরূপ "ঈক্ষণে"। মৌনের অবস্থা অশব্দের অবস্থা; তারপর আদিম চাঞ্চল্যের যে প্রথমা বাক বা বাণীমূর্ত্তি তাহাই প্রণব। এ কথাটা পরে পরিষ্কার হইবে।

সৃষ্টিটা প্রজাপতি মহাশয়ের সখের-যাত্রা। তিনি দলের অধিকারী। তিনি যেই একদিন "এতে" এই শব্দ করিলেন, অমনি তেত্রিশ কোটি দেবতা যাত্রার দলের ছোক্‌রাদের মত সাজিয়া গুজিয়া আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতএব দেবতাসৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা—এইরূপ বেদের ব্যাখ্যা করার দিন আর নাই। শব্দব্রহ্ম মানে এ নয় যে একজন কেহ থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা শব্দ করিতেছেন, আর এক-একটা পদার্থ সৃষ্টির আসরে আসিয়া হাজির হইতেছে। এ মোটা কথাটা ভিতরের সূক্ষ্ম-কথার সঙ্কেত মাত্র। শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্য অসম্ভব নহে আমরা দেখিতেছি। কিন্তু প্রজাপতি যে শব্দ-সাহায্যে সৃষ্টি করেন

তাহা কোন্ শব্দ? বেদে পুরাণে দেখিতে পাই যে প্রথমতঃ তাঁহার ধ্যানে বেদশব্দগুলি আবির্ভূত হন। বেদশব্দ বলিতে কি বুঝিব? এমন একটা শব্দ যাহার সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের এবং একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'গৌঃ' শব্দটা শুনিলাম; মনে নৈয়ায়িক মহাশয়ের দেওয়া লক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট একটা জন্তুর ছবি উদিত হইল; চাহিয়া দেখি সত্যই একটা গরু স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইতেছে। প্রথমটা শব্দ, দ্বিতীয়টা প্রত্যয় এবং শেষেরটা অর্থ বা বিষয়। তোমার আমার কাছে এ তিনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও পূরাপূরি নিত্য নহে। 'গৌঃ' শব্দটার মানে যদি আমার জানা না থাকে তবে তাহা শুনিয়া আমার বিশেষ কোনও প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি হইবে না। অপিচ, 'গৌঃ' এই শব্দের বাচ্য বা অর্থ গরু নামক জন্তুটিরই যে হইতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি আইন নাই। আমরা পাঁচ জনে আজ হইতে পরামর্শ করিয়া, শুধু অসাক্ষাতে নয় সাক্ষাতেও, যদি পরস্পরকে 'গরু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করি. তবে আমাদের ঠেকায় কে? যাদের ভাষা বিভিন্ন তারা হয়ত গরুকে গরু বলে না, আর কিছু বলে; আমরাও ইচ্ছা করিলে গরুকে গরু না বলিয়া আর কিছু বলিতে পারি। কাজেই শব্দ ও অর্থ, বাচক ও বাচ্যের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ কোথায়? শব্দ শুনিয়া প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি যে সকলের মনে একই রকম হয়, এরূপ নহে। 'গরু' এই শব্দ শুনিয়া আমার মনে পড়িল সেই শ্যামলা গাইটি, যার দুধ প্রসন্ন গোয়ালিনী বেচিয়াই মরিত কখনও খাইত না, এবং যার সাক্ষ্য দিতে স্বয়ং কমলাকান্তকে কাট্‌গড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল; তোমার হয়ত মনে পড়িল কৈলাসের সেই বৃষরাজ যিনি দেবাদিদেবের রজতগিরিনিভ বপুটি বহন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের সর্ব্বত্র হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যয় ঠিক একরূপ হইল না। কাজেই আমাদের ব্যবহৃত কোন শব্দ একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় মনে জাগাইতে পারে, অথবা না-ও পারে; তার একটা চিরনির্দ্দিষ্ট বাচ্য বা অর্থ থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক আমরা ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—প্রজাপতি ধ্যানে যে বেদশব্দ পাইলেন তাহাও কি এই জাতীয়? উত্তর পাইতে হইলে কয়টা কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখা চাই। প্রথম, প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি করার ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা, সেটা আদৌ শব্দ নহে; সেটা চাঞ্চল্যাত্মক, উন্মেষাত্মক পরশব্দ মাত্র। আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি, ইহাই সৃষ্টির

গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা। তারপর ধ্যানে বেদশব্দগুলির আবির্ভাব। এ শব্দগুলি শব্দতন্মাত্র।

প্রজাপতি ধ্যানে যে শব্দ শুনেন তাহা সেই নিরতিশয় শব্দ যাহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার কর্ণ পারমার্থিক-কর্ণ (Absolute Ear)। আমাদের, এমন কি যোগীদেরও ঠিক সে শব্দ শোনার সম্ভাবনা নাই। আমি যে শব্দটিকে 'গৌঃ' রূপে শুনিতেছি, প্রজাপতির কর্ণে তাহার শোনা নিশ্চয়ই অনুরূপ। তাঁহার যে শোনা তাহাই 'গৌঃ' এই শব্দের প্রকৃতি, তোমার আমার শোনা সে শব্দের অল্পবিস্তর বিকৃতিমাত্র। যোগী সেই খাঁটি শব্দের কাছাকাছি যান, কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতির ভূমিতে না উঠিতে পারিলে, তাঁহারও ঠিক খাঁটি শব্দ শোনা হয় না। প্রণব, ঐঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ প্রভৃতি শব্দ আমরা যেভাবে শুনি বা বলি সেটা তাদের প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। যতই উপরের থাকে (plane) উঠিবে, ততই শব্দগুলি স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া আসিবে। একটি বর্ত্তিকা হইতে আলোকরশ্মি বিভিন্ন স্তরের বাহনের (medium) ভিতর দিয়া আমার চোখে আসিয়া পড়িতেছে; ধর, স্তরগুলি ক্রমশঃই জমাট্ (dense) হইয়া আসিতেছে ; এ অবস্থায় রশ্মি ঠিক সরলভাবে আমার চোখে পৌছিবে না, বাঁকিয়া চূরিয়া, ছিন্নভিন্ন হইয়া আসিবে। ইহাই রশ্মির বিকার (refraction)। শব্দের বেলাও যে অনেকটা এইরূপ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রজাপতি তাঁহার পারমার্থিক শক্তির দ্বারা যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন ও শুনিতেছেন, তাঁহার এক মানসপুত্র অবিকল সেইটি উচ্চারণ করিতে ও শুনিতে পারেন না—তাঁহার বলা ও শোনা ঈষৎ বে-ঠিক হয়, যদি ধরা যায় তিনি প্রজাপতির এক থাক্ নীচে। আবার তাঁহার পর যিনি বলিলেন ও শুনিলেন তাঁহার আরও একটু দোষ সম্ভাবিত হইল। এইরূপে গুরুপরম্পরায় নামিয়া আসিয়া সেই আদিম শব্দমালা যখন আমার রসনায় ও কর্ণে পৌছিল, তখন তাহাদের নিরতিশয়তা অপগত হইয়াছে, স্বাভাবিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রকাশ হইয়াছে তাহা তোমার আমার শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতে পারে না। নানা কারণে আমাদের থাকে আসিতে আসিতে শব্দের সঙ্কর ও বিকার হইয়াছে। এ কথার আলোচনাও পরে হইবে। তবে গুরুপারম্পর্য্য থাকাতে, সাঙ্কর্য্য (confusion)

ও বিকৃতি (degeneration) যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় নাই। প্রত্যেক গুরুই প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহার শিষ্যকে ঠিক নিজের শব্দসম্পদ্ অক্ষুণ্ণভাবে বহিয়া দিতে; এই কাণ্ডটাই বেদের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা। শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থায় ইহার স্থান প্রথম। সর্ব্বদাই যথাযথভাবে শব্দধারা পাইতে ও বহাইয়া দিতে গুরুশিষ্যপরম্পরা সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন। এ চেষ্টা না থাকিলে আরও বিকৃতি ও গোলযোগ হইত। পরিশিষ্টে ১নং চিত্রে 'কখ' রেখা দ্বারা যদি আমরা শব্দের প্রকৃতি (Pure, normal transmission) বুঝাই, তবে অপর দুইটি 'কগ' ও 'কঘ' বক্ররেখার মধ্যে মাঝেরটি গুরুপরম্পরায় শব্দসন্ততি (transmission of sounds) বুঝাইতেছে এবং বাহিরের বক্ররেখাটি গুরুপরম্পরা না থাকিলে যতটা বিকৃতি হইতে পারে তাহাই বুঝাইতেছে। সমান্তরাল রেখাগুলি (horizontal lines) দ্বারা বিভিন্ন থাকের অনুভব সামর্থ্য দেখান হইয়াছে।

শুধু রমেশ দত্তের বেদ অথবা মক্ষমূলারের বেদ পড়িয়া নহে, কাশীতে গিয়া রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বেদপারগ আচার্য্যের নিকট শিক্ষা কল্প প্রভৃতি অঙ্গের সহিত যে বেদশব্দ আমরা শুনিয়া থাকি ও পড়িয়া থাকি, সে বেদশব্দও খাঁটি, অবিকৃত বেদশব্দ নহে, হইতে পারে না। বেদশব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় রূপ প্রজাপতির ধ্যানের মধ্যেই আবির্ভূত হইতে পারে; ঋষিদের দর্শনে শব্দের বা মন্ত্রের যে-রূপ ধরা পড়ে তাহাও প্রায় বিশুদ্ধ (approximate); তোমার আমার রসনায় ও কর্ণে তাহা অনেকটা বিকৃত। এ বিকৃতির হেতুগুলি পরে আলোচিত হইবে। এখন আমরা যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি তাহা এই। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার উৎপত্তি। বৈকুণ্ঠধাম ও গোলোকধাম, এবং গো-শব্দের অর্থ বাক্, ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। স্বয়ং শিবজী কি যেন কি-একটা নেশা করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন; আর "বাজাওত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ নন্দভৃঙ্গে"। এই বিরাট্ নৃত্যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যিনি বিষ্ণু তাঁহার সাত্ত্বিকভাব হইল, তিনি চঞ্চল হইলেন। এ চাঞ্চল্য কি সহজ চাঞ্চল্য? সৃষ্টির গোড়ায় সর্ব্বব্যাপী চিৎশক্তিতে যে দুই হইবার, বহু হইবার জন্য চাঞ্চল্য দেখা দেয়, ইহা সেই চাঞ্চল্য। গোলোকের পরাবাক্ পরশব্দ হইলেন। পরশব্দের যে লক্ষণ আমরা দিয়া রাখিয়াছি তাহা আপনারা যেন মনে রাখিবেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—সেই বিষ্ণুপদ যখন চঞ্চল হইল তখনই গঙ্গা আবির্ভূতা হইলেন। এ কোন্ গঙ্গা? এ যে সনাতনী বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। ইহার তিন্ ধারা আমরা জানিতে পারিয়াছি—ঋক্, সাম্, যজুঃ; বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী। সত্যসত্যই যে কত ধারা তাহা কে জানে? বিষ্ণুপদে গঙ্গার উদ্ভব হইল তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলুতে ধরিয়া লইলেন। এখানে পরাবাক্ অপরাবাক্ হইল, পরশব্দ শব্দতন্মাত্র হইল। শব্দের মূলীভূত চাঞ্চল্য বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দরূপে প্রকাশিত হইল। কোথায়? প্রজাপতির কমণ্ডলু (ধ্যানে) অথবা পারমার্থিক-কর্ণে। ব্রহ্মাতে আসিয়া শব্দের প্রসূতি শব্দের প্রকৃতি হইল। নাস্তিক মহোদয় এ ব্যাখ্যায় রাগ করিবেন না। আমরা আপাততঃ যাঁহাকে প্রজাপতি বলিতেছি তিনি আমাদেরই অনুভব-সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র। জীবে অনুভব-সামর্থ্যে নানান্ থাক্ রহিয়াছে (a variable magnitude, a series)। এই থাক্গুলির (seriesএর) পরাকাষ্ঠা (limit) কোথায়—ইহারই অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রজাপতিকে পাক্ড়াও করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে এরূপ পরাকাষ্ঠার অন্বেষণ হামেশা চলিতেছে; তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। আমার প্রজাপতিকে নাস্তিক মহোদয় যদি কেবল একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও আপাততঃ আমি উচ্চবাচ্য করিব না। এ মামলায় আমরা এপর্য্যন্ত গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নজির লঙ্ঘন করিয়া রায় দিই নাই, এই কথাটি যদি এ পর্য্যন্ত খোলসা করিয়া বলিতে না পারিয়াছি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বৃথায়ই বকিয়া মরিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়কেই আমরা পাত পাড়িয়া বসাইয়া দিয়াছি; যিনি যে ভাবে লইবেন; রসগোল্লা পাতে পড়িলে যিনি বিনা ওজরে মুখে তুলিয়া দিয়া রসাস্বাদন করিবেন তাঁহাকেও আমরা ডাকিয়া বসাইয়াছি; আর যিনি পাতের রসগোল্লার দিকে চাহিয়া 'এটা সংজ্ঞা-মাত্র, কল্পনামাত্র, অথবা সত্যসত্যই একটা-কিছু' এইরূপ বিচার করিতে করিতে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন, তিনিও আমাদের নিমন্ত্রণে বাদ যান নাই। যে যাহাই হউক, প্রজাপতির কমণ্ডলুতে যে গঙ্গা (পশ্যন্তী) রহিলেন, তিনি ঠিক আমাদের মর্ত্ত্যের গঙ্গা নহেন। জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠায় যে শব্দরাজি, যে বেদ রহিয়াছে, আমাদের কুণ্ঠিত, কৃপণ জ্ঞানে সে শব্দরাজির, সে বেদের, ঠিকভাবে ও পুরাপূরিভাবে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বেদেরও নানান্ থাক্—

Veda-series। একটা যদি চরম থাক্ থাকে (আমরা এখনও গণিতের নজিরে চলিতেছি) তবে তাহাই পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বেদ (pure and perfect Veda)। যে গল্পটা পাড়িয়াছিলাম সেটা চলুক। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে হর-জটায় আসিয়া স্বরশৈবলিনী পথ হারাইয়া, কুলু-কুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইহা হইল শব্দের এবং বেদের সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থা (মধ্যমা)—যে শব্দ যোগীরা দিব্যকর্ণে শুনিতে পান। মহাদেব যোগেশ্বর এ কথাটাও আপনারা মনে রাখিবেন। শেষে গোমুখীতে পতিতপাবনী শৈলসুতাসপত্নী বসুধাশৃঙ্গারহারাবলী-রূপে বসুন্ধরায় নামিয়া আসিলেন। ইহাই শব্দের ও বেদের স্থূল প্রকট মূর্ত্তি (বৈখরী)। গোমুখীর 'গো' মানে বাক্। গল্প এইখানে শেষ হইল; শব্দের পূর্ব্বব্যাখ্যাত সব কয়টা থাক্ আপনারা এই গল্পের মধ্যে পাইলেন ত? বিষ্ণুর চাঞ্চল্য পরশব্দ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গার আবির্ভাব শব্দতন্মাত্র বা শব্দের নিরতিশয় অবস্থা; হরজটাজালে গঙ্গার অবগুণ্ঠিতাবস্থা সূক্ষ্ম শব্দ; শেষে গোমুখী হইতে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ শব্দের স্থূল অবস্থা।

ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ কিসে? বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দকে চিনিয়া লইব কি লক্ষণ দ্বারা? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অর্থ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিত্য, অব্যভিচারী সম্পর্ক থাকিলে, তবে বিশুদ্ধ শব্দ হয়। কাণ ধরিয়া টানিলে যেমন মাথাকে আসিতে হয়, সেইরূপ যে শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার বাচ্যবিষয় অথবা অর্থ তৎক্ষণাৎ নির্ম্মিত হইবে তাহাই শব্দতন্মাত্র, বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ। বাইবেলে আছে—ঈশ্বর বলিলেন "আলোক হউক", আর অমনি আলোক হইল। বেদেও দেখিতে পাই প্রজাপতি "এতে" প্রভৃতি শব্দ করিলেন, আর এক এক জাতি সৃষ্টপদার্থ আবির্ভূত হইল। যে শব্দ হইলে তন্মূলীভূত বা তজ্জন্য স্পন্দক্রিয়া একটা বিশিষ্ট পদার্থ তৎক্ষণাৎ গড়িয়া ফেলিবে, তাহাই সমর্থ ও স্রষ্টা শব্দ; তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ধর 'গৌঃ' যদি এই জাতীয় শব্দ হয়, তবে যেই 'গৌঃ' শব্দ হইবে, অমনি তাহা সত্য সত্যই একটা গো সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। যদি তাহা পারে তবেই তাহা নিরতিশয় শব্দ, নতুবা নহে। নিরতিশয় শব্দ ও তাহার বিষয় বা অর্থের মধ্যে এমনই বাঁধন, যে শব্দ হইলে অর্থকে নির্ম্মিত হইতেই হইবে। বিশুদ্ধ শব্দ হইল, অথচ তাহার বিষয় বা অর্থ কোথায় তার ঠিকানা নাই, এমন হয় না। বলা বাহুল্য, আমাদের শ্রুত বা

উচ্চারিত কোন শব্দেই এ লক্ষণ খাটে না, সুতরাং কোনটাই বিশুদ্ধ শব্দ নহে। অবশ্য প্রত্যেক শব্দেরই অল্পবিস্তর ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি আছে। প্রত্যেক শব্দই ছোট-খাট এক-একজন ব্রহ্মা ও রুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া যেই আমি "টাকা" এই শব্দটা উচ্চারণ করিব, সেই সে শব্দস্পন্দগুলি অণু-পরমাণুগুলিকে সমন পাঠাইয়া ধরিয়া আনিবে এবং সাজাইয়া গুছাইয়া "রূপেয়া" গড়িয়া দিবে, টাঁকশাল ফাঁদিয়া বসিবে, এমন আশা কেহ যেন করে না। আমার অভিপ্রেত পদার্থটি রচিয়া দিবার শক্তি আমাদের চলিত শব্দগুলির নাই। মুনি-ঋষিদের উচ্চারিত শব্দের নাকি কতকটা এ সামর্থ্য—বস্তুকে গড়িয়া হাজির করিয়া দিবার শক্তি—ছিল। কপিঞ্জল শ্বেতকেতুর আশ্রমে যাইতে যাইতে শূন্যপথে বিমানচারী কোনও এক সিদ্ধকে তাড়াতাড়ি যেমন লাফাইয়া যাইলেন, অমনি সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে শাপ দিলেন—ঘোড়া হও; কপিঞ্জলকে ঘোড়া হইতেই হইল। এখানে শব্দশক্তি, না অপর কিছু? দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া কণ্বমুনির কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন—অয়মহং ভোঃ। শকুন্তলা বেচারী স্বামীচিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা রাগে গস্‌গস্ করিয়া "আঃ অতিথিপরিভাবিনি!" ইত্যাদি বলিয়া শাপ দিলেন। শাপ ফলিল। কিসের জোরে? এ সব দৃষ্টান্তে যাহাই হউক, আমাদের শব্দগুলি সাধারণতঃ এমনই ফাঁকা আওয়াজ যে বাক্‌সর্ব্বস্ব কথাটা আমাদের কাছে গালই হইয়া আছে। শব্দ হইলেই অর্থ যদি আপনা হইতেই যুটিত, তবে বাঙ্গালীর মত সার্থক হইত আর কে?

যাহাই হউক, অর্থকে গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই নিরতিশয় শব্দ। এখানেও সেই পরাকাষ্ঠার (limitএর) কথা। সকল শব্দই কিছু-না-কিছু নাড়াচাড়া দিয়া ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা করে। তারা বাতাসের ঢেউ, স্নায়ুস্পন্দ, করিবারই কথা। কোনও শব্দ বেশী, কোনও শব্দ কম; সূক্ষ্ম-পর্য্যায়ের (super-sonic) শব্দগুলির খুব বেশী। সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলি গড়ার দিকে কতক কৃতিত্ব দেখায়। ছন্দই হইল প্রাণ-ব্যাকরণ। এইজন্য বেদ ছন্দ হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন। তাই বলিয়া যেই আমি জলদগম্ভীর স্বরে গাহিব "বৃষ্টি পড়িছে টুপটাপ" সেই পর্জ্জন্যদেব সত্যসত্যই এক পশলা বর্ষিয়া যাইবেন, এমন মেঘমল্লার আমি সাধিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তানসেন দীপকরাগে পুড়িয়া মরিয়াছেন, একথাও স্মরণ রাখিবেন। অর্থাৎ আমার যে

ছন্দোবদ্ধ শব্দটি অনেক পরিমাণে ব্যর্থ, গুণীব্যক্তির সাধাগলায় বাহির হইলে তাহাই আবার সার্থক। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—শব্দের কিছু একটা গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য কতদূর পর্য্যন্ত? এখানেও নাস্তিক মহাশয়কে আমি মাথা নাড়িতে দিব না। যদি শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্যের (dynamic or creative functionএর) একটা পরাকাষ্ঠা থাকে তবে তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ইহাকেই স্বাভাবিক শব্দ (natural name) বলিতেছি। ইংরাজীতে বলিতে গেলে স্বাভাবিক শব্দের লক্ষণ (test) এইরূপ :—the sound being given, a thing is evolved : conversely, a thing being given, a sound is evolved. যদি শব্দটা থাকে তবে তার অভিধেয় বস্তুটা গড়িয়া উঠিবে; যদি বস্তুটা থাকে তবে তার শব্দ (অবশ্য শুনিবার কাণ থাকিলে) অভিব্যক্ত হইবেই। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থ যেন আমার হাতের দুইটা পিঠের মতন এদিক্ ওদিক্।

মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে, তার শব্দ আমি শুনিতেছি; কিন্তু আমার চশমার উপর একটি জলবিন্দু বা ধূলিকণা রহিয়াছে তাহার শব্দ কি আমি শুনিতে পাই? তাহার আবার শব্দ! আছে বৈকি! আমার ভৌতিক কর্ণের কাছে নাই; বৈজ্ঞানিক অথবা যোগীর দিব্যকর্ণের কাছে হয় ত থাকিতে পারে; পারমার্থিক-কর্ণের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কি ভাবে? মনে রাখিবেন, চাঞ্চল্য থাকিলেই যে কর্ণ নিরতিশয়রূপে শুনিতে পায় তাহাই পারমার্থিক-কর্ণ। ইলেকট্রণের চলাফেরাই হউক, ঈথার তরঙ্গগুলির অভিযানই হউক, অণুপরমাণুগুলির কম্পনই হউক, অথবা এ সকল অপেক্ষা স্থূল-সূক্ষ্ম কোন রকম চাঞ্চল্যই হউক—পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যে সবই শ্রুত হইবে। দিব্যকর্ণেও ইহাদের অনেকগুলি শ্রুত হইতে পারে। এখন দেখা যাক্, চশমার উপর এই জলকণাটি কি? বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলের দানা পরস্পরকে ধরিয়া বাঁধিয়া এই জলকণাটি গড়িয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক দানার (moleculeএর) মধ্যে আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অণুগুলি রহিয়াছে; তাহাদের ভিতরে ইলেকট্রনগুলি আবার সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের মত পাক দিতেছে। দানাগুলি কাঁপিতেছে; অণুগুলি নিজেদের একটা ব্যূহরচনা করিয়া (রসায়নশাস্ত্র ইহা Space-representation দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে) স্পন্দিত হইতেছে; আর ইলেকট্রন প্রভৃতির ত কথাই নাই। অতএব জলকণাটি

চাঞ্চল্যবিশিষ্ট ; বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিলে ইহা চিদ্‌বস্তুর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুস্থির জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম ; একটি কেন্দ্র করিয়া লইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর জায়গায় আর একটা ঢেলা ফেলিলে অপর একটা উত্তেজনার কেন্দ্র আমরা পাই। এইরূপ বহু উত্তেজনা-কেন্দ্র (centres of disturbance) আমরা পাইতে পারি। জগতে যে সকল বস্তুকে আমরা এক-একটা দ্রব্য বলিতেছি তাহার (এবং আমরা নিজেরাও) ঐরূপ এক-একটা উত্তেজনার কেন্দ্র। আধার বা উপাদানটা কি তাহা আপাততঃ ভাবিয়া দেখার দরকার নাই ; শাস্ত্র সেটাকে চিদ্‌বস্তু বা চিৎসত্তা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানও উন্মুখ। কতকগুলি শক্তি (forces) দ্বারা এক একটা উত্তেজনা-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ও স্থিতি হয়। জলে একটা আবর্ত্ত উৎপাদন করিতে এবং তাহাকে কিছুক্ষণ বাহাল রাখিতে কতকগুলি শক্তির সমাবেশ আবশ্যক। সেই শক্তিগুলিই আবর্ত্তের সৃষ্টি ও স্থিতির মালিক। সেগুলিকে constituting forces বলিতে পার। তুমি আমাকে টানিতেছ, আমি তোমাকে টানিতেছি ; তুমি একটা শক্তি প্রয়োগ করিতেছ, আমি আর একটা। কিন্তু এই টানাটানি ব্যাপারকে যদি সমগ্র, সমস্ত করিয়া দেখা যায় তবে তাহার ইংরাজি পরিভাষা হইবে Stress (শক্তিগুচ্ছ বা শক্তিব্যূহ); বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে শক্তিব্যূহের দুইটা অংশ (elements or partials)—তোমার টানা ও আমার টানা। অতএব শক্তিব্যূহ শব্দটা ব্যবহার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে জলের আবর্ত্তটির মূলে শক্তিব্যূহ (causal stress) রহিয়াছে, তোমার মূলের একটা শক্তিব্যূহ, আমার মূলেও একটা, সকল জিনিসের মূলেই এক-একটা শক্তিব্যূহ রহিয়াছে। আমরা নিজের প্রয়োজনমত ব্রহ্মাণ্ডটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা দেখিতেছি ; এবং ভাবিতেছি বুঝি একটা টুক্‌রার সঙ্গে আর একটা টুক্‌রার সম্পর্ক নাই, শক্তিব্যূহগুলি সব দুর্ভেদ্য ও পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, উদাসীন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সেরূপ নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ অবিচ্ছিন্ন শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses), যাহাকে জলের বা ঈথারের অথবা সম্মিলিত দেশ-কালসত্তার আবর্ত্ত বলিতেছি সেটা সেই বিরাট্ ব্যূহের একটা অঙ্গ বা অবয়ব (partial) মাত্র। এখন, জলকণার কারণীভূত শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে—ইলেক্‌ট্রনদেরই বল আর স্থূলতর দানাগুলারই বল—সেই চাঞ্চল্য পারমার্থিক-কর্ণে (Absolute Earএ)

শ্রুত হইলে যে শব্দাভিব্যক্তি হয়, সেই শব্দই জলকণার খাঁটি স্বাভাবিক শব্দ। জলকণার বেলায় যেরূপ, এই খড়ির টুক্‌রা বা অপর যে-কোনও দ্রব্য ("চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্") এর বেলাতেও সেইরূপ। প্রত্যেকের সৃষ্টি ও স্থিতির মূলে শক্তিব্যূহ (constituting forces or causal stress) রহিয়াছে; নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্যে সেই শক্তিব্যূহের যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি, তাহাই পদার্থের বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ। জীবকোষের চলা-ফেরা হইতেছে; হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে; তাহার ভিতর ভাঙ্গা-চোরা (anabolism, katabolism) চলিতেছে; এই সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্যের মূলে যে শক্তিব্যূহ, তাহাই শব্দজ্ঞান জন্মাইলে, আমরা জীবকোষের স্বাভাবিক শব্দ পাই। আমি অবশ্য এ শব্দ ভৌতিক কর্ণে শুনিতে পাই না; ইলেক্‌ট্রণের চলা-ফেরা, ঈথারের অথবা অতিসূক্ষ্মসত্তাক অপর কিছুরই বা আবর্ত্ত শুনিব কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিক ও যোগী দিব্যকর্ণে অতীন্দ্রিয় শব্দগুলির কতক কতক হয় ত শুনিতে পান; আমরা পারমার্থিক-কর্ণের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে, যেখানেই শক্তিব্যূহ কোনও প্রকার চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিবে, সেখানেই সে চাঞ্চল্য পারমার্থিক-কর্ণে শব্দরূপে শ্রুত হইবে; এবং তাহাই সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শব্দ। যে জিনিষের যাহা স্বাভাবিক শব্দ, তাহাই তাহার নাম দিলে আমরা স্বাভাবিক নাম (Natural Name) পাই।

স্বাভাবিক শব্দ বস্তুর বীজমন্ত্র। যথা, 'রং' অগ্নির বীজমন্ত্র। যে জিনিষটাকে আমরা অগ্নি বলিতেছি, তাহার মূলে অবশ্য শক্তিব্যূহ (constituting forces) রহিয়াছে; সেই শক্তিব্যূহ আমাদের চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া অগ্নির রূপজ্ঞান জন্মায়; ত্বগিন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তাপজ্ঞান জন্মায়; কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া কোনও শব্দজ্ঞান জন্মায় না। পারমার্থিক-কর্ণে কিন্তু তাহার একটা শব্দ আছে; দিব্যকর্ণও সে শব্দ কতকটা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। দিব্যকর্ণ সেই শব্দকে 'রং' বলিয়া শুনিয়াছেন; এটি পরীক্ষণীয় ব্যাপার—রসায়নশাস্ত্রের অনেক ব্যাপার যেরূপ; আমরা যতক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া না লইতেছি, ততক্ষণ গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে কেবল আমাদের শুনিয়াই রাখিতে হইতেছে যে, লুং বং রং যং হং এইগুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমের স্বাভাবিক নাম এবং বীজমন্ত্র। পারমার্থিক-কর্ণের সংজ্ঞা আমরা করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সে কর্ণ স্পর্শ

করার অধিকার আমাদের নাই ; আমরা খুব জোর দিব্যকর্ণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারি। এই দিব্যকর্ণের নজিরে আমরা বলিতেছি যে, অগ্নি বা ব্যোমের মূলে যে শক্তিব্যূহ রহিয়াছে, তাহার যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (acoustic equivalents) তাহাই অগ্নির বা ব্যোমের বীজমন্ত্র—রং বা হং। অবশ্য দিব্যকর্ণের শোনা শব্দ প্রায় বিশুদ্ধ, নিরতিশয় নহে ; এইজন্য রং বা হং হইতেছে *approximate* acoustic equivalents of the underlying stresses or constituting forces of fire and æther. শুধু পঞ্চভূতের কেন, যত্র জীব তত্র শিব—যত্র শিব তত্র শক্তি ; কাজেই জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব বীজমন্ত্র আছে। আমি দীক্ষার সময় গুরুমুখে যে মন্ত্র পাই, সেটা আমার নিজস্ব বীজমন্ত্রের অনুরূপ অথবা অনুকূল হওয়া চাই ; বিরোধ হইলে, আমার ভিতরকার শক্তিব্যূহ (causal stress) অস্বস্থ, এমন কি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। গানে গলার স্বর ও যন্ত্রের স্বরের গরমিল (dis-harmony, discord) হইলে যাহা হয়, কতকটা তাহাই। বীজমন্ত্রের বা স্বাভাবিক নামের আর বেশী দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করার সময় আজ আমাদের নাই। বীজমন্ত্র মৌলিক (simple) ও যৌগিক (compound) হইতে পারে। আপেক্ষিক ভাবে, "রং" মৌলিক বীজ, "হংসঃ", "হ্রীঁ" "ক্রীঁ" প্রভৃতি যৌগিক। আর এক কথা। স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। শঙ্খ বাজাইলাম, অথবা কাক ডাকিল ; এখানে শঙ্খের শব্দ বা কাকের ডাককে আমরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক শব্দ বলি। আমাদের লক্ষণ অনুসারে ঠিক স্বাভাবিক নহে। যে শক্তিব্যূহ শঙ্খকে শঙ্খ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (পারমার্থিক-কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক), সেইটাই শঙ্খের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র হইবে। অবশ্য শঙ্খধ্বনিটা শঙ্খের বীজশক্তির সঙ্গে সম্বদ্ধ বই সম্বন্ধশূন্য নহে। কাকের ডাক শুনিয়া আমরা কাকের নাম দিয়াছি কাক ; এ নাম কাকের বীজমন্ত্র নহে ; তবে কাকের ডাকটা কাকের কাকত্ব হইতেই নিঃসৃত হইতেছে ; এইজন্য কাকের বীজমন্ত্রের নাম যদি মুখ্য (primary) স্বাভাবিক নাম হয়, তবে তার ডাক শুনিয়া তাহাকে যে নাম আমরা দিয়াছি, সে নামকে আমরা বলিব, গৌণ (secondary) স্বাভাবিক নাম।

স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ আপনারা পাইলেন।

স্বাভাবিক নামের যে শ্রেণীবিভাগ আছে সেটা বিশেষভাবে দেখার বিষয়। সে শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই ভাল হয়। আজ আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য নয়, জাগাইয়া দিবার জন্যই সেই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখমাত্র করিলাম। বীজমন্ত্রের গোড়ার কথাগুলি (principles) আমরা এই প্রবন্ধে কতকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম; শ্রেণীবিভাগটি বুঝিলে গোড়ার কথা কয়টি বুঝিবার আরও সুবিধা আমাদের হইতে পারে। আপাততঃ, স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের দুইটা দিক্ই আপনারা যেন স্মরণ রাখিবেন। কোন দ্রব্য মানে, একটা শক্তিব্যূহ ও চাঞ্চল্যের কেন্দ্র; এইটি থাকিলেই তার একটা শাব্দিক প্রতিকৃতি (acoustic equivalent) থাকিবে—পারমার্থিক-কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক; ইহাই তাহার বীজমন্ত্র। এই একটা দিক্। পক্ষান্তরে, বীজমন্ত্র বা স্বাভাবিক শব্দ থাকিলেই, দ্রব্য সঞ্জাত বা আবির্ভূত হইবেই; যোগীরা সমর্থ ভাবে 'রং' উচ্চারণ করিলে অগ্নির আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। তুমি আমি 'রং' অথবা 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি যৌগিকমন্ত্র পুনঃপুনঃ রীতিমত ছন্দে উচ্চারণ করিলে শক্তির সংহতি (summation of stimuli, superposition of motions) হইয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে, অন্ততঃ জঠরানল ত বটেই। ইলেকট্রনগুলি পুনঃপুনঃ ধাক্কা দিয়া মাথার উপর ঐ তারের মধ্যে যেমন বিজ্‌লি বাতি জ্বালাইয়া দিতে পারে, এখানেও সেইরূপ। আমার উচ্চারিত মন্ত্র বিশুদ্ধরূপে স্বাভাবিক নহে, কাজেই তাহাকে ফল দেখাইতে হইলে, ধ্বনি ছন্দ প্রভৃতি বাহাল রাখিয়া বার বার আমায় সেটা জপ পুরশ্চরণ করিতে হয়।

শেষ কথা, মন্ত্রের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা, বিজ্ঞানের কথার মত। হয়ত পরীক্ষায় সেগুলি 'হিং টিং ছট্' রূপেই ধরা পড়িতে পারে; আপাততঃ তাহাই ধরিয়া লইবার কারণ নাই।* বরং সম্ভাবনাটা অন্যদিকেই বেশী। এটা বিলক্ষণই জানা আছে যে ভারতের তিরিশ কোটি হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই বলিতেছি) জীবনে-মরণে, বিবাহে-শ্রাদ্ধে, ক্রিয়া-কর্ম্মে ও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য করিতেছে, সেটা আমরা দু'পাঁচজন বাচাল কূপমণ্ডূক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও সেটার চেয়ে বেশী কেজো কথা কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(শেষাংশ)

গতবারে আমরা শব্দের গোড়ার কথা কতক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে দেখিতে যাইয়া আমরা আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের (experience of the worldএর) পাঁচটা থাক্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্ম শব্দ এবং স্থূল শব্দ। শেষ তিনটাকে আমরা জড়াইয়া অপরশব্দ সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। সম্মুখে বিশাল জলরাশি। জলে যদি চাঞ্চল্যের লেশ না থাকে, জলরাশি যদি একখানা স্ফটিক দর্পণের মত সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার অবস্থা অশব্দের অবস্থা। জলে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তরঙ্গগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, উঠিতেছে; ইহাই হইল পরশব্দের অবস্থা। আমি বা অপর কেহ সে উর্ম্মিচাঞ্চল্য শুনিবার জন্য উপস্থিত না থাকিলেও তাহা পরশব্দ। কারণ, আমরা স্পন্দ বা চাঞ্চল্য মাত্রকেই পরশব্দ বলিব, এইরূপ পরামর্শ করিয়া লইয়াছি,—সে চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত হউক আর নাই হউক। তারপর, স্বয়ং প্রজাপতি মহাশয় তাঁহার কর্ণে, অর্থাৎ নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা, জলরাশির সেই চাঞ্চল্য অবশ্য এমনভাবে শুনিলেন যার চেয়ে বেশী ও খাঁটিভাবে শোনা আর হইতে পারে না। ইহাই হইল শব্দতন্মাত্র—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তরঙ্গচাঞ্চল্যের বিশুদ্ধ অবিকৃত বাণীমূর্ত্তি। ইহাই শব্দের প্রকৃতি ও আদর্শ (standard)। ঢেউগুলি যতই ছোট হউক না কেন, চাঞ্চল্য যতই মৃদু হউক না কেন, এমন কি বাহিরে স্পষ্টতঃ কোনওরূপ চাঞ্চল্য না থাকিয়া যদি শুধু অণু-পরমাণু ইলেক্ট্রন প্রভৃতিরই চাঞ্চল্য থাকে, তবুও তাহা প্রজাপতির কর্ণের নিকট পাশাইয়া যাইবে না; কারণ, আমাদের সংজ্ঞা-মত সে কর্ণ যে শ্রবণশক্তির পরাকাষ্ঠা নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য। যিনি কল্পিত পরাকাষ্ঠা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়া তৃপ্ত হউন। পক্ষান্তরে, চাঞ্চল্য যতই বিরাট্ বিপুল হউক না কেন তাহাও প্রজাপতি শব্দরূপে শুনিতেছেন। কোনও স্পন্দকে তোমার আমার শ্রবণযোগ্য হইতে হইলে একটা অধঃরেখা এবং একটা উর্দ্ধরেখার মাঝের কোনও অবস্থায় তাহাকে

থাকিতে হইবে। সূক্ষ্মতার একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে সেটা আর আমাদের শ্রবণযোগ্য হইবে না; আবার বিপুলতার একটা সীমা লঙ্ঘন করিলেও সে আমাদের কাণে শব্দরূপে ধরা পড়িবে না। প্রজাপতির বেলায় এইরূপ কোন সীমারেখা নাই। এ প্রকার শ্রবণসামর্থ্যের কথা আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যেখানে ধাপের উপর ধাপ, থাকের উপর থাক্ দেখিতে পাই, সেখানেই একটা পরকাষ্ঠার কথা, চরমের কথা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি; সেই পরাকাষ্ঠার ভূমিই প্রাজাপত্য-পদবী—ঐশ্বর্য্য; যোগশাস্ত্র যাহার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজম্।"

সে যাহাই হউক, এখন অগস্ত্য যদি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার সংকল্প করিয়া আমাদের সিন্ধুতটে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি তাঁহার দিব্যকর্ণে হয়ত সাগরের এত মৃদু স্পন্দগুলির ভাষা শুনিবেন, যেগুলি তোমার আমার ভৌতিক কর্ণে আদৌ কোন সাড়া দেয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিকযোগীরা তাঁদের যন্ত্ররূপদিব্যকর্ণের সাহায্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিষের স্পন্দগুলিকে ধ্বনিরূপে ধরিয়া ফেলিতেছেন, সেগুলির ভাষা যে অমনভাবে কোন কালে আমরা শুনিতে পাইব, তাহা পূর্ব্বে কল্পনায় আনিতেও সাহস করিতাম না। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ফেলিয়া দিলেই টেলিফোঁ নামক যন্ত্রের নলটি কাণের সন্নিকটে আনিয়া তাহাকে দিব্যকর্ণ বানাইয়া লইতে পারিব, এবং সেই দিব্যকর্ণের মাহাত্ম্যে, তুমি কাশীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, আমি এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে বসিয়া ধ্যানস্থ (clairvoyant) না লইয়াই তাহা অবিকল শুনিতে পাইব। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলকেরা ধ্যানধারণাপ্রসাদাৎ সে কাজ বে-খরচায় হাসিল করিয়া ফেলিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের আর এখানে খরচা করিয়া টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তবে আবার, বিজ্ঞানও বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। টেলিফোঁ-এ তোমার ও আমার মধ্যে তার টাঙ্গাইয়া লইতে হয়। তাহাতে হাঙ্গামা অনেক, খরচ বিস্তর। আমাকে যে পরিমাণে জড়ের সহায়তা লইয়া অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে, সেই পরিমাণে জড়ের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া তার গোলামি করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলাম আর কাজ হইল—এমনটা হইবে না; কাজ করিতে গেলে বাহিরের যে পাঁচটা

জিনিসের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের রীতিমত ভাবে যোগাযোগ করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য বৈজ্ঞানিকের টেলিফোঁ আমার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও আমায় স্বাধীন করিয়া দিতে পারে নাই। শুধু টেলিফোঁ কেন, বৈজ্ঞানিকের অনেক আয়োজনই আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতেছে—বাহিরটার কাছে, পরের কাছে। দেওয়ালে ঐ বোতামটা টিপিলাম আর মাথার উপর সুরঞ্জিত কাচপুরীর ভিতর কেমন নিমেষে বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বেশ মজা। কিন্তু যে বিরাট্ তারের বূ্যহ আমাদের সহরটার মাথার উপর আকাশকে ছাইয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পদনিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কলেবরে শিরা প্রশিরার মত নিজেকে চালাইয়া দিয়াছে, সেই তারের স্থল-বিশেষে যদি একটু গোলযোগ বাধিয়া যায়, তবে আমি দেওয়ালে বোতাম টেপা কেন, মাথামুড় খুঁড়িয়া আমার নিমতলা প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া তুলিলেও, আমার ঘরের ভিতর অন্ধকারের জমাট্ একটুখানিও ভাঙ্গিবে না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মায়াপুরী আমাদের চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেটা যে আবার গোলামখানাও, এ-কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানও মর্ম্মে-মর্ম্মে সেটা বিলক্ষণ অনুভব করেন। তাই টেলিফোঁ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও দূরবর্ত্তী স্পন্দগুলিকে ধরিবার আর এক রকম ফন্দি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন।* এ ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আচার্য্য মাক্সওয়েল ও হার্জ। মার্কোণি-নামা পুরোহিতের কর্ম্মকুশলতায় সে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি তারহীন বার্ত্তাবহ। সমুদ্রের গভীর জলে তার (cable) ফেলিয়া রাখিবার আর তেমন দরকার নাই; লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া শত শত যোজন তার টাঙ্গাইয়া আর না রাখিলেও খপরের বিনিময় চলিতে পারে। এ দৃষ্টান্তে তারের গোলামি আমাদের কমিল বটে; কিন্তু বাহিরে যে যন্ত্র আমাদের তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইতেছে, সময়ে-সময়ে সেটা এমন বিশাল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় যে তাহার সম্মুখে আমাদের মত আদার ব্যাপারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারহীন বার্ত্তাবহে এবং মূর্ত্তিবহে আমাদের শক্তির বিস্তার বাড়িয়াছে এবং বাহিরের গোলামী অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বটে, কিন্তু শক্তির পরাকাষ্ঠায় আমরা অবশ্য পৌঁছাই নাই এবং আমাদের গোলামিও একেবারে অপগত হয় নাই।

শক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে তাহাই প্রাজাপত্যপদবী ; যে ভূমিতে উঠিলে সমস্তই আত্মবশ তাহাই স্বারাজ্যসিদ্ধি। ইহাই লক্ষ্য। বিজ্ঞানও নানা ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-সংস্কারের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি ঠিক হয়, তবে তাহার অনুশীলনের ফলে মানুষ ঐ লক্ষ্যের দিকে আরও কাছাইয়া আসিতে পারে। যে ঈথারতরঙ্গগুলি তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র (co-herer) প্লাতিয়া ধরিতেছে, সেগুলি এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম কম্পনগুলি যদি আমরা শুধু ধ্যানেই ধরিয়া ফেলিতে পারি, তবে শক্তির পরাকাষ্ঠার দিকে বেশী অগ্রসর ত হইলামই, অধিকন্তু সে শক্তি, বাহিরের সম্বন্ধে অনেক বেশী নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইল ; দূরের সূক্ষ্ম স্পন্দগুলি গ্রহণ করিতে, বাহিরে একটা যন্ত্র বানাইয়া পাতিয়া রাখিতে আর হইল না। এ দৃষ্টান্তে পূর্ব্বের কথাটাই পরিষ্কার হইতেছে—দিব্যকর্ণের বা যোগজ শব্দ-প্রত্যক্ষের নানা থাক্ রহিয়াছে ; যেমন যন্ত্র তেমন শোনা ; আবার ধ্যান-ধারণা যত গাঢ়, অনুভবও তত গভীর। এই দিব্যকর্ণের চরম পরিণতি পারমার্থিক-কর্ণে ; সকল যোগজ বিভূতির পূর্ণবিকাশ স্বয়ং যোগেশ্বরে। বলা বাহুল্য, তোমার আমার স্থূল কর্ণেরও শব্দ-গ্রহণ-সামর্থ্যের তারতম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির জীবের ত কথাই নাই।

জলরাশির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত প্রধান কথা কয়টাই আবার ঝালাইয়া লইলাম। শব্দের পাঁচটা থাক্ এবং শব্দ-গ্রহণ-সামর্থ্যের তিনটা থাক্, ইহাই একটা প্রধান কথা। আর একটা কথা, স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রের লক্ষণ। দ্রব্য একটা শক্তিব্যূহ। সেই শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কোনও নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা শব্দ-রূপে গৃহীত হয়, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র। এরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রের নিজের দ্রব্য বা অর্থ গড়িয়া তুলিবার শক্তি আছে। আমরা গুরুমুখে বা সাধনায় যে বীজমন্ত্রগুলি পাই, সেগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ। এইরূপ হইবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপতঃ পূর্ব্ব প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমাদের চলিত বীজমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি (অর্থ গড়িয়া লইবার শক্তি) একপ্রকার সুপ্ত বলিলেই হয়। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য এবং জপ পুরশ্চরণ প্রভৃতির দ্বারা সে শক্তি ধীরে ধীরে জাগাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত ও

যুক্তি দেখাইয়া এই কয়টা কথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রয়াস পাইয়াছি।

জড়জগতের সবিতা গ্রহ-উপগ্রহগুলির আদিম অবস্থারূপে একটা বিপুল নীহার-সমুদ্র কল্পনা করিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভালবাসেন। ঋষিরাও জগতের (শুধু জড়জগতের নয়) আদি কারণ বা উপাদানকে কারণসলিলরূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা আর-যাহা হউন আর না-ই হউন, কবি ; তাঁহাদের বেদপুরাণগুলি কাব্য-সম্পদে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ? কারণসলিলে অনন্ত-শেষ-শয্যায় শুইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তাঁহার নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমাসীন রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণ-মলোদ্ভূত মধু-কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'— ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া যোগনিদ্রার স্তব করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইলেন। বিষ্ণু জাগিয়া দৈত্য দু'টার সঙ্গে লড়াই করিলেন। দৈত্যযুগল প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমরা খুসী হইয়াছি ; তুমি আমাদের কাছে বর লও।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও।" এ গল্পটার রহস্য কি ? আমরা যে শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা এই দুই দিন ধরিয়া করিতেছি তাহারই গোড়ার কথা কয়টি এই গল্পের মধ্যে লুকান রহিয়াছে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চৈতন্য। তিনি এক বই দুই নহেন। কিন্তু এক এক হইয়া থাকিলে ত সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া দুই করিয়া লইতে হয়। তাঁহার এক ভাগ বা দিক্ (aspect) হইল আধার বস্তু ; অপর ভাগ বা দিক্ হইল আধেয় বস্তু। অনন্ত-শেষ-শয্যা এই জাগতিক আধার বস্তুর সঙ্কেত ; এবং সে বিরাট্ আধার বস্তু একটা অপরিসীম শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses)। আমরা মনে করি, বুঝিবা এই জলবিন্দুটিকে গোটা দু'চার শক্তি গড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে ; আমাদের হিসাবের সম্ভাবনা ও সুবিধার জন্য আমাদিগকে ব্যাপারটাকে নিতান্ত ছোট করিয়া দেখিতে হয় ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধারশক্তি জলবিন্দুর অণু-পরমাণু প্রভৃতিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল শক্তিব্যূহ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জলবিন্দু কি জলবিন্দুরূপে বাহাল থাকিত, যদি তাহাকে পৃথিবী, বাতাসের রেণু প্রভৃতি

টানিয়া ও চাপিয়া ও ধরিয়া না রহিত? পৃথিবী ও তার এত সাজ-সরঞ্জাম কি সম্ভবপর হইত, যদি সৌরজগতের ও ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর দ্রব্য তাহাকে টানিয়া ও চাপিয়া ও সামলাইয়া না রহিত? এইপ্রকার টানিয়া, চাপিয়া রাখার নাম আমরা এক কথায় দিয়াছি শক্তিব্যূহ (stress)। অতএব জগতে এমন কোনও কিছু ছোট বা অল্প নাই যাহার আধার-শক্তিকে আমরা অনন্ত-শেষ-শয্যারূপে ভাবিতে না পারি। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, তাহার আধার-শক্তি (constituting forces) নিখিল-শক্তি-ব্যূহের এক তিলও কম নহে। তুমি আমি অল্পই দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অল্পর মূলে ও অল্পকে ঘিরিয়া যে ভূমা ও বিরাট্ রহিয়াছে, তাহাকে সহজে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। বিজ্ঞান অনেক মাথা ঘামাইয়া পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির একটা বিবরণ দিল; বিবরণ খাসা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে আট্খানা হইতেছি। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে শুধু একটা গণিতের ফরমাসী আতাফল ও পৃথিবী লইয়াই এ বিশ্বের কাণ্ডকারখানাটা চলিতেছে না। দুইটা ছাড়িয়া তিনটা জিনিষের টানাটানি বুঝিয়া-পড়িয়া লইতে লাপ্লাসের মত মাথাও ঘুরিয়া যায়; নিখিল শক্তিব্যূহের বিবরণ দিবে কে? বিবরণ দিতে পারি আর নাই পারি, তাহাই কিন্তু ছোট, বড়, মাঝারি সকলেরই মূলে; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে বিষ্ণু আধার-শক্তিরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন; সেই আধারশক্তির সঙ্কেত অনন্তশয্যা। নব বিজ্ঞানের "মিথুনীভূত-দেশকাল" এই অনন্তশয্যার এক আস্তরণ!

তারপর নাভি-কমল। তাহার উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। কে ব্রহ্মা? তিনি শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শব্দ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি যাঁহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া হইতেছে তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মার অথবা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ মূর্ত্তি—সেই নিখিল শক্তিব্যূহ (সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) যাহার কথা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছি। ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; এই বাজা ব্যাপারের মূলে ঘড়ির ভিতরকার চাকাগুলির, দোলক প্রভৃতির শক্তিগুলি (forces) রহিয়াছে; শুধু ভিতরকার হিসাব দিয়াই আমাদের রেহাই নাই; বাহিরের তাপ, আলোক, তাড়িত-চৌম্বক-শক্তি ও অপরাপর দ্রব্যের আকর্ষণ, এই বাজা ব্যাপারের পিছনে অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই ঘড়ি যখন বাজিতেছে তখনও তাহার মূলে সেই অনন্তদেবই রহিয়াছেন, যাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি প্রভৃতি বেদবাণী আমাদের বারবার শুনাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বুঝিলে আমরা

বুঝিব কেন শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাকে অনন্তশয্যাস্তীর্ণ বিষ্ণুর নাভিকমলে বসাইয়া রাখা হইল। গল্পটা শুনিতে আজগুবি, কিন্তু ইহা সৃষ্টির বা অভিব্যক্তি-প্রবাহের মূল কথাটির দিব্য প্রতীক, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাভি-বিবর হইতে পদ্মমৃণাল উদ্গত হইয়া আমাদিগকে ইহাই সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম ; কারণ, সকলপ্রকার শব্দাভিব্যক্তির মূলে যে নাদ বা প্রণবোচ্চার, তাহা ত নাভিস্থানকে বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। নাদধ্বনি যে নিখিলধ্বনি-বৈচিত্র্যের মূল উৎস। প্রণবের আলোচনাস্থলে এ কথাটির আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ নাভিকমলে শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মা কেন বসিলেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা পাইলাম। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চিদ্বস্তু নিজেকে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগে নিখিল-শক্তিব্যূহ-স্বরূপ আধার বা আশ্রয় হইলেন ; অপরভাগে নিখিল-বেদশব্দাত্মক কলেবর ধরিয়া আধেয় বা আশ্রিত হইলেন। শব্দের স্রষ্টৃত্ব আমরা পূর্ব্বেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের এই প্রকার সৃষ্টি-সামর্থ্য স্মরণ রাখিলে, আমাদের বুঝিতে আর গোল হইবে না কেন বিষ্ণুর নাভিপদ্মোপরিস্থিত শব্দব্রহ্মকে সৃষ্টির মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ আবির্ভূত হয় ; সেই বেদশব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া থাকে—জগৎ সেই শব্দ-প্রভব। বেদশব্দ মানে স্বাভাবিক শব্দ, এটা যেন মনে থাকে ; অর্থাৎ কোনও পদার্থের মূলীভূত চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত হইলে যে বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ হয়, তাহাই ; আমরা যেগুলিকে বেদশব্দ বলিয়া কহিতেছি ও শুনিতেছি, ঠিক সেগুলি নহে। আমাদের আপ্ত (inspired, revealed) শব্দগুলিতেও অল্পবিস্তর বিকৃতি ও সাঙ্কর্য্য হইয়াছে।

ব্রহ্মা শুধু আধার-কমলে বসিয়া আছেন এমন নহে ; তাঁহার একটা বাহনও আমরা জুটাইয়া দিয়াছি ; সেটা হংস। হংসটা কি? কোনওপ্রকার শব্দ উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে যাইলে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ (vital functioning) যে আদৌ হয়, সে পক্ষে হালের বিজ্ঞানও আর সন্দেহ রাখে না। সেই প্রাণন ব্যাপারের স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্র হংস ; প্রাণিমাত্রেই, শুধু মানুষে নয়। গভীর রাত্রিতে জাগিয়া স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটাকে মোটামুটি (roughly) 'হংস' বলিয়াই মনে হয়। সাধকের দিব্যকর্ণে প্রাণনক্রিয়ার যে প্রায় বিশুদ্ধ ধ্বনি (approximate acoustic

equivalent) ধরা পড়ে, তাহা যে সত্য সত্যই 'হংস' সে বিষয়ে শাস্ত্র, গুরু ও মহাজনেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখার জিনিষ ; শুনিয়াই মাথা নাড়িয়া বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রকাশ করায় কোনই লাভ নাই। বাহনের পরিচয় ত পাইলাম। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস—এ আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বিরিঞ্চির হস্তে আবার অক্ষসূত্র। ইহা বর্ণমালা অর্থাৎ শব্দসমূহের মৌলিক অংশগুলি (units or elements of sounds)। যথা 'গৌঃ' এই শব্দে গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ, গ, ঔ, ঃ। মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা অপর কোন দেবতার গলদেশে ইহাই মুণ্ডমালারূপে দুলিয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা মাতৃকা—বর্ণময়ী। কমণ্ডলু, চতুরানন প্রভৃতির বিবরণ দিতে যাইলে আমাদের পুঁথি আর শেষ হইবে না। আপাততঃ শব্দের দিক্ হইতে মোটা মোটা আরও দু'টো-একটা কথা আমরা ভাবিয়া দেখিব। নাদধ্বনি প্রধানতঃ নাভিস্থানে উত্তেজনা-বিশেষ হইতে সঞ্জাত হয়, এবং বাহন হংস প্রাণন ক্রিয়ার শাব্দিক মূর্ত্তি—এই দুইটি কথা মনে রাখিলে, আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিবেনা যে, শব্দব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দতন্মাত্রবপুঃ, অর্থাৎ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ শব্দসমষ্টিই ব্রহ্মার কলেবর ; আর, তিনি যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এবং যাহাকে বাহন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নাভিকমল ও হংস স্পন্দাত্মক পরশব্দের প্রতিমূর্ত্তি। অতএব স্পন্দাত্মক পরশব্দকে মূল করিয়া শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ এই ত্রিবিধ অপরশব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম, তাহার একটা সাঙ্কেতিক বিবরণ (symbolic representation) গল্পটার মধ্যে আমরা পাইলাম। আপাততঃ গল্প বলিয়াই চালাইতেছি, কিন্তু ঠিক গল্প ইহা নহে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুর অভিব্যক্তি হইতেছে তাহার মূল বিষ্ণুতে। বিষ্ণুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। আমরা যাঁহাকে বিষ্ণু আখ্যা দিতেছি তাঁহাকে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের তরফের উকিল হার্বার্ট স্পেন্সার হয়ত 'অজ্ঞেয় শক্তি' (Inscrutable Power) বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। নাম যাহাই দেওয়া হউক, বিষ্ণুই বলি আর আদ্যাশক্তিই বলি, এই বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে ও অন্তরালে একটা কিছু রহিয়াছে। নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা, সূচনা ও প্রেরণা তাহারই ভিতরে। সেই বস্তুটি শব্দতন্মাত্ররূপে, শব্দপরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মূলবস্তু হইতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেরূপ আবির্ভাবের

জন্য পরশব্দের আবশ্যকতা যে আছে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই হইবে না, দু'টো একটা বাধা বা অন্তরায় অতিক্রম না করিতে পারিলে সেরূপ অভিব্যক্তি হইবে না। আমি শব্দ শুনিতেছি ; আমার শ্রুত শব্দ নিরতিশয় শব্দ বা পরকাষ্ঠা নহে। কেন নয়? পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা শব্দ শোনার যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে যে আমার শোনা শব্দতে বিকার (deformation) ও সঙ্কর (confusion), *এই দুইটি দোষ* অল্পবিস্তর থাকিবেই।

আমার স্থূল, ভৌতিক কর্ণ অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ শব্দ গ্রহণ করিতে যোগ্য নয়। আমার ভিতরে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন ইহাই তাঁহার কর্ণমল। এই কর্ণমল রহিয়াছে বলিয়া, আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের *এই ত্রুটি* ও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, আমি নিরতিশয় শব্দ বা স্বাভাবিক শব্দ শুনিনা ; এইজন্য আমার শোনা শব্দ স্থূল শব্দ, শব্দতন্মাত্র নহে ; আমার কর্ণ ভৌতিক কর্ণ, পারমার্থিক-কর্ণ (Absolute Ear) নহে। শব্দ শোনার সামর্থ্য আমার মধ্যে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পারে নাই ; পারে নাই তার প্রমাণ, আমার কাণে যন্ত্র লাগাইয়া অথবা ধ্যানস্থ হইয়া অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে হয়। অভিব্যক্তির ধারা কোনও একটা বাধাতে ধাক্কা পাইয়া যেন থামিয়া রহিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যেই অভিব্যক্তির এই দশা দেখি। যতটা অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ণতা হয়, পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা কখনও কোথাও হইয়াছে দেখি না। কি যেন একটা কি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ষোল আনা ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না। আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই যে দোষ বা প্রতিবন্ধক তাহাকে কর্ণমল বলিলে, বেশ বলা হয় না কি? বিষ্ণু মানে সর্ব্বব্যাপী ; কাজেই যেখানে কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্যের আয়োজন বা ব্যবস্থা, সেইখানেই এই বিষ্ণু কর্ণমল। অর্থাৎ শুধু তোমার আমার ঘরওয়া কথা নহে, ইহা একটা জাগতিক ব্যবস্থা। তবে, তোমার আমার দৃষ্টান্তে মূল তথ্যটি বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতে পারে। এখন, আমি যদি শ্রবণ-সামর্থ্যের পরকাষ্ঠায় উপনীত হইতে চাই, তবে অবশ্য আমাকে কর্ণমল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আমার ভৌতিক কর্ণটাকে পারমার্থিক-কর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ণ নির্ম্মল না হইলে শ্রবণ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ হইবে না। আমরা

যে সকল লক্ষণ ও পরিভাষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে, এ সকল কথা বলিয়া আমরা একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি মাত্র। কর্ণমল বা শ্রবণ-শক্তিনিষ্ঠ দোষ দুই কারণে হইতে পারে, অথবা তাহার বিবৃতি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। আবরণ ও বিক্ষেপ—তমঃ ও রজঃ। শব্দ হইল, অপরে শুনিতে পাইল, আমি পাইলাম না ; এ ক্ষেত্রে কি যেন শব্দটাকে আমার কাছ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ; এই আবরণের জন্য বহু সূক্ষ্ম শব্দ আমি শুনি না, অনেক বিপুল শব্দও আমি শুনি না ; দুইটি সীমা রেখার মধ্যে, একটা গণ্ডীর ভিতরে শব্দ আসিয়া হাজির হইলে, তবে আমি তাহাকে শুনিতে পাই। ইহার পরিভাষা করা হউক—তামসিক কর্ণমল। আবার শব্দ শুনিলেও ঠিকভাবে শোনার সম্ভাবনা আমার নাই। একই সময়ে নানা জিনিষের উত্তেজনা নানা শব্দ জন্মাইতেছে। বাগানে বসিয়া রহিয়াছি—কাকের ডাক, ঝিঁঝির ডাক, চিলের ডাক প্রভৃতি কত শত শব্দ যে মাখামাখি জড়াজড়ি করিয়া আমার কাণে আসিতেছে, তার হিসাব কে দিবে ? মোটামুটিভাবে সেগুলিকে আমি আলাদা করিয়া চিনিয়া লই ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যে তাহারা মাখামাখি করিয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, সে পক্ষে আর সন্দেহ আছে কি ? জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম ; একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে চারিধারে সুশৃঙ্খলার সহিত ঢেউগুলি কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একটা ঢেলা ফেলিলাম ; নূতন একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইল, এবং তাহাকে বেড়িয়া আরও এক সার ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্বের ঢেউগুলি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সঙ্ঘর্ষ হইল, ফলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই নিজস্ব প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা হইতে অল্প-বিস্তর বিচ্যুত হইল। ইহা তাহাদের সাঙ্কর্য্য (interference of waves)। আমাদের শ্রুত শব্দগুলির এইরূপই দশা। কোন একটা জিনিষের নিজস্ব প্রকৃতি আমরা শব্দে তাই ধরিতে পারিতেছি না ; যেটাকে কোন জিনিষের শব্দ বলিতেছি সেটা নিশ্চয়ই তাহারই নিজস্ব ও স্বাভাবিক শব্দ নহে। এ বিশ্বের হাটে সকলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছে ; এ হট্টগোলের মধ্যে আমার হারানো মামার গলা বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। তবে অবশ্য 'অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন-শব্দবৎ' মামার ডাক একেবারে যে না শুনিতেছি এমন নহে ; সে ডাক আর পাঁচটা ডাকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। জগতের নিখিল সামগ্রীর যে ক্ষেত্রে

গোলে হরিবোল দিবার ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে আমি বিকৃত, ভেজাল শব্দ শুনিতেই বাধ্য। ভেজাল ধরিয়া সংশোধন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমার কর্ণের নাই। ইহা কর্ণের আর এক দোষ—ইহার নাম দিই রাজসিক কর্ণমল। এই কর্ণমলের দরুণ শোনা শব্দগুলিও গোল পাকাইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই প্রকার কর্ণমলের একটা মধু, অপরটা কৈটভ; একটা তমঃ, অপরটা রজঃ। এই কর্ণমলের সংস্কার না হইলে, কি আমাতে, কি তোমাতে, কি প্রজাপতিতে, পারমার্থিক-কর্ণ অথবা শব্দ-গ্রহণ-শক্তি-পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু, প্রজাপতি বা ব্রহ্মারূপে নিখিল স্বাভাবিক বা বৈদিক শব্দরাশি অভিব্যক্ত করিতে যাইতেছেন; সেরূপ অভিব্যক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, যতক্ষণ কর্ণমল রহিয়াছে। রূপকচ্ছলে বলা হউক, কথাটা কিন্তু সোজা, এবং কথাটায় আপত্তি করার কিছু নাই। অভিব্যক্তিধারা (stream of evolution) কে পরাকাষ্ঠায় পৌছিতে হইলে, সকল গণ্ডী, সকল বাঁধাবাঁধি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা বলিলে উক্তেরই শুধু পুনরুক্তি করা হয় মাত্র। যে নির্ম্মল হইবে তাহাকে ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা বলিলে নূতন কোন কথা বলা হয় কি? তুমি জলে ঢেলা ফেলিয়া দিলে, আমাকে তার শব্দ শুনিতে হইলে কাণ হইতে আঙুল সরাইয়া লইতে হইবে। সেইরূপ কারণসলিলে যে চাঞ্চল্য, তাহাকে নিরতিশয়-ভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে, শ্রবণ-সামর্থ্যের কুণ্ঠা ও কৃপণতা, অর্থাৎ কর্ণমল থাকিলে ত চলিবে না! এই জন্য প্রাজাপত্য অধিকার নিরুদ্বেগ করিতে হইলে কর্ণমল দূর করাই চাই। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন মধু কৈটভ 'বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'। দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ কর্ণমল বিদূরিত না হইলে, ব্রহ্মার পদবী, অর্থাৎ নিরতিশয়-শ্রবণ-সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ ও চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা না হইলে আবার দৈত্য দুইটার প্রাদুর্ভাব হয় না।

বীজের মধ্যে যাহা প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহা যদি জাগ্রত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকিত, তবে ত বীজ গাছ হইয়াই রহিত। বীজ হইতে ধীরে-ধীরে গাছ হইতেছে—এই ক্রমিক ও ধারাবাহিক ব্যাপারটার তাহা হইলে কোনই অর্থ থাকিত না। অভ্যুদয় বা ক্রমবিকাশ নামক প্রবাহটা তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া রহিত। বীজের মধ্যে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন, যে বৈষ্ণবী-শক্তি

রহিয়াছেন, তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়াই বীজ আপাততঃ বীজই হইয়া রহিয়াছে ; সে শক্তির নিদ্রা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থা (potential condition) যেমন যেমন অপগত হইবে, বীজের পাদপরূপে পরিণতিও তেমনি তেমনি প্রকৃত হইতে থাকিবে। এই জন্য সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিষ্ণু না ঘুমাইলে ও জাগিলে কোনও জিনিষের বাড়া-কমা, উদয়-বিলয়ের প্রসঙ্গই অর্থহীন হইয়া যায়। জিনিষের হ্রাস বৃদ্ধি মানেই তার ভিতরকার শক্তিব্যূহের বিভিন্ন অবস্থা। বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভাবিতেছি যে, যে বস্তুটি বিশ্বের বীজ বা মূলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার একরকম সঙ্কোচ ও বিকাশ যেন আছে। জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি, অথবা নিখিল শক্তির আশ্রয় যে জগন্নিবাস, তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যূহ সকল সময়ে ঠিক একভাবে থাকিলে, কোনরূপ চলা-ফেরা, হ্রাস-বৃদ্ধি, উদয়-বিলয় সম্ভবে না, সুতরাং সৃষ্টি অথবা জগৎ বলিলে যাহা বুঝি সেটা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এটা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও স্বীকৃত কথা, দর্শন-শাস্ত্রের দুর্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। বিজ্ঞান যাহাকে কার্য্যকরী শক্তি (Energy) বলেন, তাহার দুইটি অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রচ্ছন্নাবস্থা (potential বা static condition) ; অপরটা উদার বা ব্যক্ত অবস্থা (kinetic condition)। জলের কণিকাগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইলে বরফ হইল ; এই অভিনব বিন্যাসের (new configuration-এর) ফলে বরফের উৎপত্তিতে প্রচুর তাপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ; আবার বরফ যখন গলিয়া জল হইতে থাকিবে তখন সেই প্রচ্ছন্ন তাপশক্তি হিসাবে ধরা পড়িয়া যাইবে। পুনশ্চ, জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখনও ঐ প্রকার একটা অবস্থা হয়। জলের ভিতর যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তিনি সব সময়ে ঠিক এক অবস্থায় থাকিলে জল জলই রহিয়া যায়, বরফ বা বাষ্প হইতে পারে না। এরূপভাবে দেখিলে, আমার মধ্যেও বিষ্ণু রহিয়াছেন, তোমার মধ্যেও রহিয়াছেন ; আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি সব সময়ে ঠিক সমবস্থ হইয়া থাকিলে আমিও সব সময়ে সমবস্থই রহিয়া যাইতাম ; আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম সব সময়ে ঠিক এই ভাবেই হইত ; হয় না যে, ইহাতেই বুঝিতেছি, আমার মূলে একটা পরিবর্ত্তনের ও ক্রমিকতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে ; আমার জ্ঞান ও শক্তি যে অল্প ও সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি, অথবা এই ব্যাপারটাকে বলিতেছি, যে, বিষ্ণু আমার মধ্যে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া

রহিয়াছেন। আমার অভিভূতাবস্থাই আমার বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। আমার যে ক্রমিক বিকাশ বা অভ্যুদয় তাহাই আমার বিষ্ণুর জাগরণ। শুধু আমার বেলায় নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ, জগৎ। রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি হইতেছে, বিকাশ হইতেছে। এই জাগতিক রহস্য ও সৃষ্টির গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ও প্রবোধ, এই পৌরাণিক গল্প শুনিয়া আর হাসিব না। কার্য্যকরী শক্তির (Energyর) ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক হাসিয়া থাকেন কি?

ঘুমাইয়া থাকিলেই জাগা হয়, নামিয়া থাকিলেই উঠা হয়। বিষ্ণু কারণসলিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইহা যেন বিশ্ব-শক্তির একটা মগ্ন ও মূর্চ্ছিত অবস্থা (static condition)। এ ভাবটা সব সময়ে থাকিলে কোনও পরিণতি ও পরিবর্ত্তন অবশ্য থাকে না। যে ধারাটিকে সৃষ্টি বলিতেছি সেটি আর আদৌ চলে না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিকর্ত্তাভাবে দেখা দিতে পারেন না। ব্রহ্মাতে শব্দগ্রহণ-সামর্থ্যের যে পরাকাষ্ঠা, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্র শুনিবার ও বলিবার শক্তির যে চরমোৎকর্ষ, তাহা সম্ভবে না যদি বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত না হন। বীজের শক্তির ব্যক্তাবস্থা মানেই অঙ্কুরাদি উদ্গম। যোগনিদ্রাবস্থাতেই কর্ণমল সম্ভবে; সেই অবস্থাতেই মধুকৈটভের প্রাদুর্ভাব। ব্রহ্মা স্তব করিয়া যোগনিদ্রা ভাঙ্গিলেন—প্রচ্ছন্নকে (potentialকে) উদার (kinetic) করিয়া লইলেন। যোগনিদ্রাভঙ্গে কর্ণমল, অর্থাৎ শ্রবণ-সামর্থ্যের অল্পতা ও কৃপণতা, অপগত হইল। মধুকৈটভের সংহার হইল। মধুকৈটভ শব্দের বিকার ও সঙ্কর। শব্দের বিকার ও সঙ্কর ঘুচিয়া গেলেই শব্দ বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক হইল। বীজমন্ত্রগুলির উদ্ধার ও চৈতন্য হইল। এইরূপ সমর্থ (dynamic ও creative) বীজমন্ত্রগুলি না পাইলে ত সৃষ্টি হইবে না, ব্রহ্মার অধিকারই সাব্যস্ত হইবে না। মধুকৈটভ বিনাশের পর ব্রহ্মা নিরুদ্বেগ ও চরিতার্থ হইলেন।

মধুকৈটভের আখ্যায়িকার ভিতরে শব্দের পূর্ব্বালোচিত সব-কয়টা আসল কথা পাইলাম ত? আখ্যায়িকাটির এরূপ ব্যাখ্যাই আমরা দিতেছি কেন? কোন আখ্যায়িকার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে বসিয়া প্রথমেই ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও নির্দ্দেশসূত্র, স্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা

দিগ্‌দর্শন (pointer) প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া আছে কি না। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় সেরূপ সঙ্কেত তিনটি। প্রথম সঙ্কেত ব্রহ্মার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কাজেই ব্রহ্মা শব্দসম্পর্কীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা; বেদশব্দ মানে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দ। এইরূপ শব্দকে, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে, পুরোহিত করিয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে, অন্যথা, হয় না। মধুকৈটভ যে কাহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি স্পষ্ট সঙ্কেত রহিয়াছে—বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ। বস্তুতঃ 'কর্ণমল' এই শব্দটিই এ মহারহস্য-পেটিকার চাবিকাটি। তারপর ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রবোধনের জন্য যে স্তব করিলেন, তাহা যে মুখ্যতঃ বাগ্‌দেবতার, শব্দব্রহ্মের স্তব; ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম হইবার জন্য পরমা বাকের স্তুতি করিতেছেন—সাধক তাঁহার সিদ্ধিকে বরণ করিয়া লইতেছেন। "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।" ইত্যাদি স্তব শুনিয়া আর সংশয় থাকে কি, কিসের এ স্তব, কেন এ স্তব?

সেদিন আমরা গঙ্গার গোলোকধামে উৎপত্তি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন এবং শেষকালে গোমুখীদ্বারে ভূতলে অবতরণ—এই আখ্যায়িকাটিরও শব্দপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি। গোলোক ও গোমুখীর 'গো' শব্দ সেখানে আমাদের নির্দ্দেশসূত্র (guiding clue); আর ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে এই মহারহস্যটিরই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গঙ্গা বেদশব্দময়ী; ভগীরথের ঐ শঙ্খধ্বনি ত শব্দসঙ্কেত; এবং তাহাই গঙ্গামাহাত্ম্যের মর্ম্মকথা আমাদিগকে ডাকিয়া শুনাইয়া যাইতেছে। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে বেদশব্দধারা, বীজমন্ত্রসমষ্টি কতক কতক তোমার আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে; কর্ণমলের দরুণ তাহার বিকৃতি ও সঙ্কর অবশ্যই কিছু হইয়াছে; কিন্তু গুরুশিষ্যের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় না থাকিলে বীজশব্দগুলির যতটা বিকৃতি ও সঙ্কর হইত, সম্প্রদায় থাকায়, ততটা হইতে পারে নাই। আমাদের প্রচলিত শব্দগুলির নানাকারণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হওয়ার একটা রোগ আছে। সেদিন চিত্র আঁকিয়া এ রোগের একটা নিদান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কর্ণমল ও রসনামলের মাহাত্ম্যে আমাদের শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলি গোল পাকাইয়া ক্রমশঃই ভেজাল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে। শব্দ যত অস্বাভাবিক

হইবে ততই তাহা অশক্ত অসমর্থ হইতে থাকিবে। শব্দ হইবে অথচ বিষয়ের কোনও ঠিকানা থাকিবে না, বকিয়া মরিব কিন্তু অর্থ অদৃষ্টে যুটিবে না। এইরূপ অসমর্থ (uncreative) শব্দ লইয়া জীবন-যাপন ঝকমারি, সাধন ও সিদ্ধি ত দূরের কথা। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান্ যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। ধর্ম্মের ও সদাচারের একটা আদর্শ (standard) আবার বাহাল করিয়া দিতে, তাঁহার আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ। বিষ্ণু আসিলেন কিন্তু তাঁহার পাদোদ্ভবা-গঙ্গা আসিলেন না, এমনটা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য আসিলেন বিষ্ণু ; আর শব্দ-বিভ্রাট্ দূর করিয়া স্বাভাবিক ও সমর্থ শব্দসমষ্টির ধারা পুনঃ বহাইয়া দিয়া জীবের সুখদা-মোক্ষদা হইবার জন্য আসিলেন গঙ্গা। স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্রগুলি-হারাইয়া ফেলিলে জীব তার অন্তরাত্মায় ইষ্টদেবতার জন্য মণিমণ্ডপ, রত্ন-সিংহাসন গড়িবে কি দিয়া? কপিল আদিবিদ্বান্ শ্রুতি বলিতেছেন ; তাঁহা হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় স্বাভাবিক শব্দরাশি, নিখিল বেদ প্রবাহিত হইতেছে ; সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই কল্যাণ ও চরিতার্থতা। সগরপুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া সেই আদি-বিদ্বানের অবমাননা করিল, ধর্ষণা করিল ; মানুষ, সেই আদি-বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্বাভাবিক-শব্দ ধারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইল ; বলিল—"আমরা শ্রুতি-স্মৃতি মানিতে যাইব কেন? বেদ যাহাকে স্বাভাবিক-শব্দ বলিতেছে সেটাই যে স্বাভাবিক-শব্দ তার প্রমাণ নাই ; আমাদের চলিত শব্দেরই বা দোষ কি? আমরা এইগুলির দ্বারাই কাজ চালাইব।" এই অবিচারপূর্ব্বক, অপরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্রোহের ফলে শব্দসঙ্কর ও শব্দবিভ্রাট সীমা উপ্‌চাইয়া ভয়ানক হইল। সম্প্রদায়েও (traditionএ) শব্দসঙ্কর ছিল, তবে বাড়াবাড়ি হইতে পারে নাই, এবং সেটাকে সারিয়া লওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সম্প্রদায় মানিব না বলাতে, শব্দসঙ্কর আয় ছাড়াইয়া গেল ; সেরূপ শব্দসঙ্করের ফল নিষ্ফলতা, বৈয়র্থ্য। ইহাই সগরপুত্রগণের ভস্মত্বপ্রাপ্তি, জীবসাধারণের পাতিত্য। ভগীরথ তপস্যা করিয়া আবার সেই বীজশব্দময়ী সনাতনী বেদবাণীকে মঙ্গল-ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে এই পতিত ধরায় বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে জহ্নুমুনি-

একবার সেই পুণ্যতোয়াকে পান করিয়া আবার বাহির করিয়া দিলেন, পদ্মাসুর পথ ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইতে গেল। স্বাভাবিক শব্দরাশির মর্ত্ত্যে বাহাল থাকিয়া আমাদের চতুর্ব্বর্গ সাধন করার পথে দুইটি প্রধান বিঘ্ন বা অন্তরায়। বিস্মৃতি ও বিকৃতি। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আবার রূপান্তরিত, বিকৃত করিয়া ফেলিলেও চলিবে না। জহ্নুমুনি প্রথমটার সঙ্কেত, পদ্মাসুর দ্বিতীয়টার সঙ্কেত। তবে জহ্নুমুনি কেওকেটা নহেন, তাঁহার বিস্মৃতি যোগবিস্মৃতি, নির্বীজ সমাধিতে, তুরীয়ভাবে যে প্রকার বিস্মৃতি হয় সেই প্রকার বিস্মৃতি। সে ত অশব্দের অবস্থা, সে অবস্থায় শব্দের, এমন কি স্বাভাবিক শব্দেরও, কি স্মরণ থাকে? ইহা হইল শেষ থাকের অনুভূতি; ইহার সহিত নীচের থাকের অনুভূতিগুলির সম্বন্ধ একটা চিত্র-সাহায্যে (পরিশিষ্ট—২নং চিত্র) বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

ক-রেখা আমাদের সাধারণ-অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Normal Experience)। খ-রেখা যোগীদের অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Yogik Experience)। গ-রেখা এমন এক উচ্চ থাকের অনুভূতি বুঝাইতেছে, যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি না হইতেও পারে। আত্মা সত্যরূপের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই 'শরবত্তন্ময়' হইয়াই থাকিয়া গেলেন, তাহার সংবাদ বহন করিয়া নিম্নলোকে আর নামিয়া আসিলেন না। আবার কোনও আত্মা অমৃতের আস্বাদ পাইয়া আমাদিগকে তাহার কথা শুনাইবার জন্য সাধ করিয়া যেন আমাদের থাকে নামিয়া আসিলেন—শাস্ত্র রচিয়া জীব-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রবক্তা ঋষি। ইঁহারাই গুরু। গ-রেখা দ্বারা এমন এক আত্মার গতি ও পদবী আমরা দেখাইয়া দিলাম, যিনি আর নামিয়া আসিলেন না। ঘ-রেখায় পাইতেছি ঋষি, পূর্ব্বাচার্য্য ও গুরুবর্গকে। অনুভূতির একটা মুখ্যধারা শব্দ। সুতরাং শব্দের নানান্ থাক্ বুঝাইতেও এই চিত্রের ব্যবহার চলিবে। জহ্নুমুনি বেদশব্দরাশি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চালাইয়া না দেন, তবে ত ধারা ঐখানেই থামিয়া গেল; আমাদের মত ভস্মত্বপ্রাপ্ত সগরসন্ততিগণের উদ্ধারের ত কোনও ব্যবস্থা হইল না। তাই জহ্নুমুনিকে জঙ্ঘা চিরিয়া আবার গঙ্গাজীকে বাহির করিয়া দিতে হইল। 'জঙ্ঘা' বলিতে উত্তমাঙ্গ হইতে অধমাঙ্গে অবতরণ—উচ্চ থাক্ হইতে শিষ্যসম্প্রদায়-কল্যাণ-কামনায় নিম্ন থাকে নামিয়া আসা বুঝান হইল। পদ্মাসুরের পিছন পিছন গিয়া আমাদের আর পথভ্রষ্ট

হইবার প্রয়োজন নাই। সাধক-সম্প্রদায়-প্রবাহটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বেদশব্দের গ্লানি ও শব্দসঙ্করের অভ্যুত্থান নিবারণ করিবার জন্য, ভগীরথের তপস্যাকে সূত্র ও উপলক্ষ্য করিয়া, সনাতন শব্দমালার আমাদের লোকে যে অবতরণ, তাহাই গঙ্গার আবির্ভাব—এই মূল কথাটি উপাখ্যানের ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না কি? পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ, এই কয়টি ধাপে ধাপে শব্দ যে আমাদের লোকে (Plane-এ) নামিয়া আসে, তাহার সন্ধান এই আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। 'সনাতন-শব্দমালা' শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় যেন চমৎকাইয়া না উঠেন। ইহা একটা সংজ্ঞা, যেমন গণিত শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এই:—যে কোনও দ্রব্যের মূলে অবশ্যই একটা শক্তিব্যূহ (System of Constituting Forces) রহিয়াছে। যদি সেই শক্তিব্যূহ-জনিত চাঞ্চল্য কোনও পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যের কাছে শব্দরূপে ধরা পড়ে, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক শব্দ, বীজমন্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বলা বাহুল্য, লক্ষণ মানিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, এ প্রকার শব্দের সহিত তাহার বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বা সনাতন। কোনও দ্রব্যের তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করিয়া ধর, একটা সরলরেখা পাইলাম; এখন দ্রব্যটি স্থিরই থাকুক আর চলিয়াই বেড়াক, তাহার সেই তিনটি বিন্দু যদি এক সরলরেখাতেই বারবার থাকিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যকে গণিতের পরিভাষায় কঠিন দ্রব্য (Rigid Body) বলে। সত্য সত্যই সেরূপ কোন জড়দ্রব্য আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তার কোনও মনগড়া (*à priori*) উত্তর দেওয়া যায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও, স্ব স্ব অর্থের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনের বদ্ধ ('বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' উপমা দিবার জিনিষ হইয়া আছে) কোনও স্বাভাবিক শব্দমালা সত্যসত্যই আছে কি না, তাহারও কোনও মনগড়া উত্তর দেওয়া যায় না। ইহারও সত্যতা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের কিন্তু লক্ষণ ও পরিভাষা করিতে কোনই বাধা নাই। কেন এইরূপ পরিভাষা করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ পূর্ব্বপ্রবন্ধে বোধ হয় কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। নাস্তিক মহাশয়ের সঙ্গে আপাততঃ আমরা আর আলাপ করিব না। মধুকৈটভবধ ও গঙ্গার ভূতলে অবতরণ, এই দুইটা বৃত্তান্তের মধ্যে আমাদের শব্দতত্ত্বের অনেক মর্ম্মকথা আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম।

উপাখ্যানের যে যে অংশে শাস্ত্রকারেরা রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাবিকাটিটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই সেই অংশ হাতড়াইয়া আমরা একেবারে বিফলমনোরথ হই নাই। পূর্ব্বোপাখ্যানে 'কর্ণমল' শব্দটি এবং পরের উপাখ্যানে 'গোমুখী' প্রভৃতি শব্দ না পাইলে, আমাদের তথ্যান্বেষণ সহজ ও সফল হইত না। "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি"—গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গার মন্ত্রাত্মিকা মূর্ত্তিটিই উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাহা অর্থসফলতায় ধন্য হইয়া উঠিবে, এই মহাসত্যটিই আমাদের বুদ্ধিতে ভাসিয়া উঠে। যন্ত্রশুদ্ধি এবং তন্ত্রশুদ্ধি তার জন্য আবশ্যক। তবে আশঙ্কা হয়, কলির প্রভাবে শব্দসঙ্কর, শব্দবিকার ও শব্দ-সঙ্কোচ যে-মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপরম্পরাগত স্বাভাবিক শব্দমালা গঙ্গারূপে এই মেদনীমগুলের কলুষ-কলঙ্ক ক্ষালন করিতে, সাধকের যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিতে, আর বেশী দিন বুঝি থাকিবেন না। ভগবানের মীনকলেবরে, বরাহমূর্ত্তিতে যে পুনঃ পুনঃ বেদ-সমুদ্ধার, প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে শয়ান হইয়া তাঁহার যে বেদ রক্ষা—সে সকল কথার তলাইয়া আলোচনা করিতে যাইলেও আমরা শব্দতত্ত্বেই গিয়া উপনীত হইব। তবে সে আলোচনার অবসর আজ আর আমাদের নাই। মোটামুটি উপাখ্যান দুইটির যতটুকু আলোচনা আমরা করিতে পারিলাম, তাহাতে, আশা করি, আমাদের বেদপুরাণের আখ্যায়িকাগুলি যে একেবারে গুলির আড্ডায় রচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে নাস্তিক মহোদয়েরও কতকটা দ্বিধা অতঃপর হইবে।

আমাদের দেওয়া শব্দের বিবরণটি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কতটা কাছে বা দূরে রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই। দুই একটা পরিভাষা পণ্ডিত মহাশয়দের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে হয় ত ঠিক খাপ্ না খাইতে পারে। পরশব্দকে 'পরশব্দ' বলিবার ভিত্তি কি? আমরা যাহাকে শব্দতন্মাত্র বলিলাম তাহাই কি আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত শব্দতন্মাত্র?—এইরূপ দুই-একটা পরিভাষা-সংক্রান্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর কি দিব, সে বিষয়ে হয় ত কতকটা ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া বেদশব্দের ও মন্ত্রের যে লক্ষণ ও ব্যাখ্যানটা মিলিল,

তাহা আদৌ শাস্ত্রের দিক্ মাড়াইল না, একথা বলিলে, আমার বোধ হয়, কতকটা আনাড়ীর মত কথা বলা হইবে। দর্শনগুলিসম্বন্ধে যাহাই হউক, উপনিষৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র নৈয়ায়িক মহাশয়ের ফরমাইশ মত ঠিক্ চলেন নাই। শিশু জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবী কেমনধারা পথে সূর্য্যের চারিধারে পাক্ দিতেছে? আমি তাহাকে বলিলাম—বৃত্তের মত গোলাকার পথে। কিন্তু পথ ত ঠিক বৃত্তের মত নয়; শিশু বড় হইলে, তার বুদ্ধি আরও একটু পরিপক্ক হইলে, আমি ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম যে পথটি বৃত্ত নহে, বৃত্তাভাস (ellipse)। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে এখানেও অব্যাহতি নাই, প্রয়োজনমত আরও সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ। শিষ্যের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইল, গুরু বলিলেন, 'তুমি যে অন্ন খাইতেছ তাহাই ব্রহ্ম'। পরে সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম'; এইরূপে শিষ্যের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাকে গুরু ব্রহ্মের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন; 'ব্রহ্ম' শব্দটা বাহাল রাখিলেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ বদ্‌লাইয়া দিতে লাগিলেন; শেষকালে শিষ্য আপনিই উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। একই শব্দের এই পাঁচটা লক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি ফেলিয়া রাখিলে নৈয়ায়িক মহাশয়ের শিরঃপীড়ার গুরুতর কারণ অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া একটার পর আর একটা, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া লইতেছে, সেখানে আগাগোড়া একটা শব্দই বাহাল রাখিলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাই স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কি—আত্মা কি—তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছি; আমার জানা ক্রমশঃই হয় ত গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকিবে; কিন্তু আমার অনুসন্ধান-অন্বেষণের জিনিষ ত একই রহিয়াছে—ক্রমশঃ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও ধরিতে পারিতেছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমার অন্বেষণের সামগ্রীর নামটা বদ্‌লাইয়া না ফেলাই ভাল। তাই, অন্নই ভাবি, আর প্রাণই ভাবি, আর মনই ভাবি, আমি খুঁজিতেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে। যেমনটা বুঝিতেছি তেমনটা লক্ষণ দিতেছি। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই রীতি। অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়। নবোঢ়া বধূকে পাতিব্রত্যের নিদর্শনস্বরূপ অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখানর প্রথা পূর্ব্বে ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু ছোট তারা, সহজে দেখা যায় না। তাই নিকটের একটা স্থূল, উজ্জ্বল তারার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বধূকে

বলিলেন—'ঐ দেখ অরুন্ধতী'। যখন বধূর দৃষ্টি তাহাতে সুস্থির হইল তখন আবার স্বামী বলিলেন—'না ওটা নয়, উহার নিকটে যে ছোট তারাটি রহিয়াছে, উহাই অরুন্ধতী'। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই রীতিতে আমাদের আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। শব্দ একটা, তার পরিভাষা পাঁচ রকমের। যাঁহারা উপনিষৎগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে 'আকাশ', 'প্রাণ', 'বায়ু' প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা ও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবস্তুই লক্ষ্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া, এই শব্দগুলির মোটা মোটা লক্ষণগুলি আদৌ আমাদের সম্মুখে উপনীত করা হইয়াছে। এই নজিরে চৈতন্যের সম্পন্দ চঞ্চল অবস্থাটাকে পরশব্দ বলিলে অন্যায় হইল কি? বিশেষতঃ শ্রুতি জগৎ-প্রবাহকে যে শব্দপূর্ব্বক বলিতেছেন তাহা মূলতঃ স্পন্দ বা চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে। সাম্যাবস্থার (cosmic equilibriumএর) অবসানে যে বৈষম্যের প্রথমোন্মেষ (initial cosmic dis-equilibrium), তাহাকে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি বলিব? সাংখ্যকার প্রকৃতি এবং শব্দতন্মাত্রের মাঝে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার নামক দুইটা তত্ত্ব বসাইয়াছেন, সে দু'টাকে জড়াইয়া, পরশব্দ বলিলে বিশেষ দোষ হয় না, কারণ, সে তত্ত্ব দুইটা বৈষম্যাত্মক এবং বিক্ষোভাত্মক ; এবং আমাদের পরিভাষা মত বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যই পরশব্দ ; শ্রুতি ঈক্ষণাপূর্ব্বক শব্দতন্মাত্র ও আকাশের সৃষ্টি করিতেছেন ; আমরা সেই ঈক্ষণাকে পরশব্দ এবং 'পশ্যন্তীবাক্', এই দুই পর্য্যায়ে লইতে পারি না কি? বলা বাহুল্য, আমরা শব্দের দিক্ হইতেই হিসাব লইতেছি। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা ইহাকে পরশব্দ বলিয়া নৈয়ায়িকের কাছে হয় ত দোষ করিলাম, কিন্তু শ্রুতির রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাইলাম কি? শব্দতন্মাত্র-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা আর করিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন, আমাদের লক্ষণমত, ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ—নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা গৃহীত শব্দ।

স্বাভাবিক শব্দের কিভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছি। দ্রব্য ও অর্থ থাকিলেই যে শব্দ থাকে (অবশ্য পারমার্থিক-কর্ণে-শ্রুত), এবং যে শব্দ থাকিলেই তাহার অর্থ নির্ম্মিত হইয়া যায় (অবশ্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে), সেই শব্দই স্বাভাবিক শব্দ। ইহাই স্বাভাবিক শব্দের পরীক্ষা (test)। স্বাভাবিক শব্দ-সম্বন্ধে আর দুইটি আসল

কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ বিদায় লইব। প্রথম কথাটি এই। লাটিম ঘুরিতেছে, তার ঘোরাটা অবশ্য একটা অক্ষের (axis of rotation এর) অবলম্বনে হয়; আমাদের পৃথিবীও একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া পাক খাইতেছে। চুরুটের ধোঁওয়া পাক দিতে দিতে উপরে উঠিতেছে, এইরূপ পাক দেওয়াও অবশ্য একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। হেল্‌মহোল্‌জ ও লর্ড কেল্‌ভিন্ মনে করিতেন যে অণুগুলি ঈথারসাগরে ঐরকম এক একটা আবর্ত্ত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের আবর্ত্তনও এক-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। ইলেক্ট্রন্‌গুলো অণুর (atomএর) ভিতরে পাক্ খায়—সেখানেও তবে অক্ষ ভাবিয়া লইতে আমাদের অধিকার আছে। যেখানে গতি কেবল একদিকে সোজাসুজি চলিয়া যাওয়া, সেখানে সেই গতির রেখাটিই অক্ষ। যেখানে আবর্ত্তন (rotation) হইতেছে, সেখানে অক্ষ সেই রেখাটি, যার চারিধারে এবং যার আশ্রয়ে আবর্ত্তন হইতেছে। গাড়ীর চাকার অক্ষ যেমন। যে দুই প্রকারের গতি বলিলাম, সেই দুইটার বিবিধ সংমিশ্রণে সকল প্রকার গতি হইতেছে। এইজন্য অক্ষের সাহায্যেই সকল প্রকার গতির হিসাব আমাদের লইতে হয়। গণিতশাস্ত্র অক্ষের সাহায্যে (co-ordinate axisএর সাহায্যে) গতির (curve of motionএর) বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিতে গিয়া নিতান্ত অদ্ভুত একটা কিছু করিয়া বসেন নাই। তাই আমাদের বলিতে সাহস হয়, অক্ষের কথা গত্যাত্মক এই জগতের গোড়ার একটা কথা। গতির পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা পাইলাম। পদার্থসমূহের, বিশেষতঃ সজীব পদার্থসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, তাহা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আমরা অক্ষ (axis of generation) জিনিষটাকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। গাছ হইতেছে—একটা মূলকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করিয়া শত শত শিরা প্রশিরা পত্রাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব এখানে অক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটা লতা এই বর্ষার রসে বাড়িয়া গাছ ছাইয়া ধরিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখিব একটা মূল অক্ষের আশ্রয়ে লতার নানাদিকে নানা ফেঙ্‌ড়া বাহির হইয়াছে। একটা মূল (primary) অক্ষ; তাহা হইতে আবার কত গৌণ (secondary) অক্ষ বাহির হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ পরীক্ষা করিলে দেখি মেরুদণ্ড (Spinal

Axis) কে আশ্রয় করিয়া স্নায়ুজাল সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাণনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। ভাইজ্‌মান প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা আমাদের বলিয়াছিলেন যে বংশ-পরম্পরায় একটাই বীজপদার্থ (Germplasm) বরাবর বহিয়া যায়; তোমাতে আমাতে তাহার অল্পবিস্তর বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের ভিতর বংশগত বীজটি, তাহার নিজস্ব প্রকৃতিটিকে প্রায় অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই, বহিয়া যায়। আমার পিতামহ, পিতা ও আমি একই অক্ষকে আশ্রয় করিয়া লতার নানা ফেঙ্‌ড়ার মত এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আমাদের সকলকে একসূত্রে সম্বন্ধ করিয়া রাখিতে বংশধারা, লতার মুখ্য অক্ষ-দণ্ডটির মত, অবিচ্ছিন্নভাবেই বহিয়া যাইতেছে। আমার উৎপত্তি, আমার পিতার উৎপত্তি এই অক্ষকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছে। Mendelism, Emergent Evolution প্রভৃতি এ তত্ত্বের নানাভাবে বিস্তার করিয়াছে। আর দৃষ্টান্ত লইব না, তবে কথাটা দাঁড়াইল যে অক্ষ জিনিষটা সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ব্যাপারে গোড়ার কথা। অক্ষ, মুখ্য বা গৌণ হইতে পারে—লতার দৃষ্টান্তে, মূল অক্ষ ছাড়া, ফেঙ্‌ড়াগুলিরও ছোট ছোট অক্ষ আছে। এখন সমস্যা এই—জগতে বিচিত্র শব্দ রহিয়াছে; নানা জীবের নানা শব্দ; নানা জাতির নানা ভাষা; তোমার আমার শব্দও ঠিক এক নহে; বিশ্বে এই শব্দ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি—নানাপ্রকার ভাষার উৎপত্তি—কি কোনও অক্ষ আশ্রয় করিয়া হয় নাই; ধ্বনিবৈচিত্র্যগুলি ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে তাদের মধ্যে আমরা কি কোনও মূল শব্দের (primaries) আবিষ্কার করিতে পারি না? ফুরিয়ারের রীতিতে গণিতবিৎ যে কোনও জটিল ছন্দোবদ্ধ গতিকে (complex harmonic motionকে) সরল ছন্দোবদ্ধ গতিতে (simple harmonic motionএ) ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন, একথা আপনারা ভুলিবেন না। বিরাট্ শব্দ-বৈচিত্র্যের ভিতরে আমরা কি একটা অবিচ্ছিন্ন মৌলিক শব্দ-ধারা আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পারি? লতা টানিয়া তার মুখ্য মেরুদণ্ডটি আমরা যেরূপ বাহির করিয়া লইতে পারি, সেইরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের সেরূপ আবিষ্কার করিতে পারাই উচিত; এবং তাহাই যদি হয়, তবে এটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শব্দের এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মূর্ত্তির যাহা মেরুদণ্ড (axis of generation), নিখিল শব্দরাশির যাহা মূল প্রকৃতি, তাহাই সেই স্বাভাবিক শব্দপ্রবাহ, বেদশব্দ ধারা,

গঙ্গার আবির্ভাব, যাহার কথা এই দুই দিন ধরিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে আমরা এতক্ষণে চিনিতে পারিলাম কি? প্রাজাপত্য-ভূমি হইতে আমাদের থাকে শব্দপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, তাই ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ এই বৃক্ষ। বৃক্ষের একটি মূলকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চারিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে, পত্র পুষ্পাদি উদ্‌গত হয়, সেইরূপ প্রজাপতির স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রগুলি নিম্ন ভূমিতে (lower planeএ) নামিয়া আসিতে গিয়া একটা মেরুদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছে—সেই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল শব্দ-বৈচিত্র্য একটা মহাপাদপের মত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই মেরুদণ্ডই হইল স্বাভাবিক শব্দ-ধারা, যাহা গুরুপরম্পরাক্রমে কতক পরিমাণে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। এ স্বাভাবিক শব্দ-ধারাই সকল শব্দের প্রকৃতি ও আশ্রয়। যে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে চিনিয়াছে, সে বেদ চিনিয়াছে—যস্তং বেদ স বেদবিৎ। যাবতীয় শব্দের সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার।

আর একটা কথা। একটা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলাম। সেই চুম্বকটি যে শক্তিব্যূহ (field, lines of force) রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা সেই শক্তিব্যূহের (lines of forceএর) একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিতে পারি। বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক বালককে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চৌম্বক-শক্তি ও তাড়িত শক্তির সমাবেশ বা সংস্থানের নক্সা আঁকিয়া ফেলিতে হয়। যে নক্সাখানা আমরা পাই তাহা সেই শক্তিব্যূহের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual representation)। এখন দেখুন, রং বা হুং এক একটা বীজমন্ত্র। ইহারা এক-একটা শক্তিব্যূহের শাব্দিক প্রতিকৃতি। কথাটা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু সেই সেই শক্তিব্যূহের এক-একটা চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual or optic equivalentও) থাকিবে। চুম্বকের যেমন ধারা থাকে। আমরা ধরিতে পারি আর নাই পারি, আছে। চুম্বকের বেলায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, পরীক্ষা দ্বারা সেই চাক্ষুষ প্রতিকৃতি আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফল কথা, শব্দের দিক্ হইতে দেখিলে শক্তিব্যূহ যেরূপ স্বাভাবিক শব্দরূপে ব্যক্ত হয়, রূপের দিক্ হইতে দেখিলে, তাহা সেইরূপ স্বাভাবিক রূপভাবে ব্যক্ত হয়। শব্দের বেলায় যেমন পারমার্থিক-কর্ণ, দিব্যকর্ণ ও ভৌতিক কর্ণ রহিয়াছে, রূপের বেলায়ও তেমনি পারমার্থিক চক্ষু, দিব্যচক্ষু ও

ভৌতিকচক্ষু থাকিবে। স্বাভাবিক শব্দকে আমরা বলিয়াছি মন্ত্র, আর স্বাভাবিক রূপকে আমরা বলিতেছি যন্ত্র—যথা, শ্রী-যন্ত্র। বৈদিক যজ্ঞ এবং তান্ত্রিক হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মন্ত্র যেমন চাই, যন্ত্রও তেমনি চাই। মন্ত্র ও যন্ত্রের "কুসংস্কার" এতক্ষণে আমরা একটু বুঝিতে পারিলাম কি?

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া খাঁটি স্বাভাবিক শব্দের আলোচনাই করিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক শব্দের অর্থটাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) মনে করিয়া ইহার বেশ একটা শ্রেণীবিভাগও করা চলিতে পারে। পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজও আমাদের আর অবকাশ নাই। সে শ্রেণী বিভাগের সামান্য একটু নমুনা দেখাইয়াই আজিকার মত ক্ষান্ত হইব। অপর শব্দ লইয়া শ্রেণী বিভাগ করিতেছি।

অপর শব্দ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক (artificial)। কোন একটি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য আমরা অনেক সময় যদৃচ্ছাক্রমে (arbitrarily) কোনও একটি বাচনিক সঙ্কেত (vocal sign) ব্যবহার করিয়া থাকি; যে সঙ্কেতটি ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সঙ্কেতটি ব্যবহার না করিয়া অন্য সঙ্কেত ব্যবহার করিলেও চলিত; যে নামে ডাকিতেছি সেই নামেই ডাকার কোনও নিয়ত হেতু নাই। যেমন, আমরা কোন ব্যক্তিকে যদু বা হরি এই নামে ডাকিয়া থাকি। এই নাম অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা মনগড়া নাম। বলা বাহুল্য, আমাদের স্বাভাবিক শব্দ বা নামের যে লক্ষণ তাহা এ-সব ক্ষেত্রে নাই। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে তাহাকে পদার্থের সত্তা ও স্বরূপের সঙ্গে কোনও রূপ একটা সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। যে নাম দিতেছি তাহার একটা হেতু বা কৈফিয়ৎ থাকিবেই। সুতরাং এ রকম নাম আমরা আমাদের খোস্ খেয়াল মত দিতে পারি না।

তারপর, স্বাভাবিক নাম আবার দুই প্রকার—নিরতিশয় ও সাতিশয়; প্রকৃত ও বিকৃত (pure এবং approximate)। পারমার্থিক-কর্ণে শ্রুত শব্দতন্মাত্রই নিরতিশয় শব্দ; তাহাই শব্দের প্রকৃতি। শ্রবণসামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা নাই, এমন কর্ণে শ্রুত শব্দ সাতিশয় শব্দ; তাহা অল্প বিস্তর বিকৃতিপ্রাপ্ত; একেবারে খাঁটি শব্দ নহে। দিব্যকর্ণ ও লৌকিক কর্ণ এই শব্দ শুনিতে সমর্থ। নিরতিশয় শব্দের পরিভাষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সাতিশয় শব্দের শ্রেণীবিভাগ আমরা করিতেছি। কোনও

পদার্থ রহিয়াছে, তাহার মূলীভূত শক্তিব্যূহ সমষ্টিভাবে (as a whole) দিব্যকর্ণে যে শব্দ উৎপাদন করে, সেই শব্দ সেই পদার্থের মুখ্য (primary) সংজ্ঞা। এইটি পদার্থের বীজমন্ত্র। যেমন ধর, অগ্নির মুখ্য নাম রং; আকাশের হং; প্রাণনক্রিয়ার হংস, ইত্যাদি। এইগুলি মৌলিক অথবা যৌগিক (simple অথবা compound) হইতে পারে। রং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের, হ্রীঁ বা ক্রীঁ শেষোক্ত প্রকারের। মৌলিক বীজগুলির সংযোগে বা সংমিশ্রণে যৌগিক বীজগুলি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পদার্থের শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে (specifically), আংশিকভাবে, ক্রিয়া করিয়া যে শব্দানুভূতি জন্মায়, সে শব্দকে, সেই পদার্থের গৌণ (secondary) নাম বলা চলিবে। এ নাম বীজমন্ত্র নহে। ধর কাক ডাকিল; তাহার ডাক শুনিয়া তার নাম দিলাম কাক; এখানে যে শক্তিব্যূহ কাককে কাক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটা আংশিক অভিব্যক্তি তাহার ডাকে; কাকের চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা প্রভৃতি অপরাপর অভিব্যক্তিও রহিয়াছে; কাক শব্দও নানা রকমের করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, 'কাক' এই শব্দটা কাকের গৌণ স্বাভাবিক নাম। আবার, কাক নিজেই ডাকে; কেহ তাহাকে ডাকাইয়া দেয় না। অতএব, তাহার শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত। ঢাকে কাটি দিয়া তাহার ধ্বনি শুনিলাম, ধ্বনি শুনিয়া তার নাম দিলাম ঢাক। এই নাম তাহার গৌণ স্বাভাবিক নাম। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত নহে, পরতঃ-সম্ভূত। এই দুই স্থলেই শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয়টাকে উত্তেজিত করিতেছে; কাকের শব্দ বা ঢাকের শব্দ আমি শুনিতেছি ও শুনিয়া নাম দিতেছি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শব্দ অন্য রকমের। অগ্নির মুখ্য স্বাভাবিক নাম বা বীজ' রং। কিন্তু তাহাকে অগ্নি বলিতেছি কেন? অগ্নি জ্বলিলে তাহার লেলিহান্ শিখা এবং কুণ্ডলাকারে উর্দ্ধগামী ধূম আমরা দেখি; এই বক্রগতি বা আবর্ত্তের মত গতি বুঝাইতে চাই; তাহা করিতে গিয়া 'অগ্' ধাতু আমরা আবিষ্কার করি; তাহার উপর যথাযোগ্য প্রত্যয় করিয়া 'অগ্নি' শব্দ পাই। এই 'অগ্নি' শব্দ আমাদের চোখে দেখা অগ্নির একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। শুধু 'রং' বলিলে এই ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত হয় না। 'অগ্' ধাতু 'অ' ও 'গ' এই দুইটা বর্ণের সমাবেশে হইয়াছে; 'অ' ও 'গ' খুব-সম্ভবতঃ দিব্যকর্ণে শ্রুত গতিবিশেষের মুখ্য স্বাভাবিক নামের উপাদান।

প্রত্যেক বর্ণ এক-একটা অর্থের (যোগভাষ্যকারের মতে নিখিল অর্থের) মুখ্য নাম বা বীজ; এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ ও সংস্থান দ্বারা কোনও একটা পদার্থের বা ক্রিয়ার মুখ্য স্বাভাবিক নাম হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিব। একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য 'অগ্নি'; অপরাপর ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ 'বহ্নি' (হুতদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে বহন করে), 'হুতাশন', 'বৈশ্বানর' (বিশ্বনর বা সর্ব্বজীবে পাচকাগ্নি-রূপে বর্ত্তমান) প্রভৃতি নাম রহিয়াছে। কাকের ডাকের মত এগুলি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কাণে শোনা শব্দের অনুরূপ নহে। শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতাইয়া কতকগুলি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের দিতে পারে—যেমন অগ্নির দৃষ্টান্তে বক্রগতি প্রভৃতি। সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয়াদি লইয়া আমাদের এক-একটা নাম গড়িয়া লইতে হয়—আমরা নিজেরাই গড়িয়া লই, অথবা পরম্পরাক্রমেই প্রাপ্ত হই। এগুলিও খুবই প্রয়োজনীয় শব্দ। এগুলির যথাযথ সংযোগ সংস্থানেও সমর্থ বেদমন্ত্র বা তান্ত্রিক মন্ত্র হইতে পারে। তবে এ বিরাট্ ব্যাপারের আলোচনায় আজ আর প্রবৃত্ত হইব না।

বহু বর্ষ পূর্ব্বে প্রদত্ত বক্তৃতা দুটি এইখানে শেষ হইল। মাঝে কিছুদিনের ব্যবধানে বক্তৃতা দুটি দেওয়া হয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলী উভয় ক্ষেত্রে ঠিক একই ছিলেন না বলিয়া, এক কথা বার বার বলিতে হইয়াছে। যাঁরা সতর্ক সারগ্রাহী তাঁরা এইসব পুনরুক্তি, রূপক, আখ্যায়িকা ও বহুধা পল্লবিত প্রসঙ্গের মাঝেও সার কথাগুলি সহজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন আশা করি। আলোচ্য বিষয়টি দুরূহ ও নীরস, সেটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সরস করিয়া উপনীত করার চেষ্টা হইয়াছে। রূপক এবং আখ্যায়িকাগুলিও মূল উদ্দেশ্যেরই অনুবাদক। বহির্বিজ্ঞান বিদ্যা বর্তমান শতকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। যে "বৈজ্ঞানিক কাঠামো"তে উপরের আলোচনা দুটি হইয়াছিল সে কাঠামোও কতক বদ্‌লাইয়াছে। তবে, সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, আমাদের আলোচিত "সিদ্ধান্তের" সাথে বিজ্ঞান বিদ্যার (জড়, প্রাণ ও মানস ক্ষেত্রে) "সহযোগিতা" এবং মৈত্রী বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। প্রাচীন অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং নবীন পদার্থ বিজ্ঞান আর সর্ব্বথা বিভিন্নমুখী (divergent) নয়; তথ্য, তত্ত্ব, লক্ষ্য পদ্ধতি—সব দিকেই ব্যবধানটা ক্রমেই হ্রস্ব হইয়া

আসিতেছে। "নৈমিষারণ্য" ও লেবরিটরির মিলন অবাস্তব স্বপ্ন আর নয়। মিলনটি না ঘটিলে জগতের কল্যাণ নেই। তাই মিলনটির জন্য দুই-দিক্ থেকেই আগ্রহ ও প্রস্তুতি আবশ্যক। অথচ, নিজেদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধি রক্ষা করিয়াই মিলনটি ঘটাইতে হইবে। কেহ কাহারও "তল্পিবাহক" হইলে চলিবে না। ভারতের স্বাধীনতার মুখেই "সমর্থ" মিলন মন্ত্রটি উচ্চারিত হইবে, মনে হয়। তার জন্য, স্বাধীন ভারতকে আপন "স্বভাবে" প্রতিষ্ঠিত, সমর্থ থাকিতে হইবে। লেবরিটরিকেও তার সত্যানুসন্ধানের "ঋত"টি স্বভাবে রাখিয়াই শিব ও সুন্দরের সাধনে ও উপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শেষে আর একটা কথা। পূর্ব্বের আলোচনায় "স্বাভাবিক শব্দকে" সকলেই যেন আমাদের নাগালের বাহিরে এক "কল্পিত পরাকাষ্ঠা" (theoretical possibility or limit) ভাবিয়াই ছাড়িয়া না দেন। "নিরতিশয়" শ্রবণ বা উচ্চারণ সামর্থ্যেই শব্দের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদেরও অর্জ্জনের বস্তু। তার সাধনই জপাদি। প্রধানতঃ বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রবণ যন্ত্রের অভ্যুদয় সাধন করিয়া এ সিদ্ধি অর্জ্জিত হয় না। যেমন, গুণী তানসেনের সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধি শুধু গলার কসরৎএর হিসাবে নয়। দেহ, প্রাণ ও মন—এ তিন লইয়া গোটা যন্ত্র। সুতরাং, সাধনের উদ্দেশ্য—এ তিনেরি সুষ্ঠুভাবে যোগ্যতা সম্পাদন। এর নিমিত্ত অনেক কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদের অনুশীলন আবশ্যক। শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তি, প্রেম—বিশেষ করিয়া। কেননা, "যন্ত্র"টাকে শুদ্ধ, একতান, উন্মুখ, একাগ্র করিতে—সনাতনী গঙ্গা-প্রবাহকে আপন আধারে ধারণ করিতে—এ সবের তুল্য আর কি আছে ?

স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র

এই নামেও দুইটি বক্তৃতা বহুবর্ষ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, এবং একটি প্রকাশিতও হইয়াছিল। অপরটি, সম্ভবতঃ, প্রকাশিত হয় নাই, এবং সেটার পাণ্ডুলিপিও বর্ত্তমানে গরমিল। যেটা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটাই—প্রায় সেই আকারেই—এখানে সন্নিবেশিত হইল। "যন্ত্র"-এর রহস্যটা যে কি তাহা বুঝার পক্ষে এটার উপযোগিতা কিছু থাকিতে পারে। জপাদি সাধনে মন্ত্রের মত যন্ত্রেরও উপযোগ আছে।

যে "বৈজ্ঞানিক কাঠামো" সম্মুখে রাখিয়া বহুদিন আগে ঐ আলোচনা হইয়াছিল, সে কাঠামোটা ঠিক আর তাই নাই। মূর্ত্ত পদার্থগুলির ক্ষেত্রে সে কাঠামো এখন নব "শক্তিকণা"বাদ, আপেক্ষিকতাবাদ (সামান্য ও বিশেষ), কেন্দ্রীণ বিজ্ঞান (Nuclear Physics), মৌলিক ঊর্ম্মি-বিজ্ঞান (Wave Mechanics), সম্ভাব্যতা—অনিশ্চয়তাবাদ (Probability cum Uncertainty), ব্যোম-বিজ্ঞান (Astral Physics) এই সব বিভিন্ন "অবয়বে" বিভক্ত হইয়া সেগুলিকে পরস্পর সুসমঞ্জস করার যত্ন করিতেছে। হিসাব ও পরীক্ষা—দুই দিক্ দিয়াই প্রয়াস চলিয়াছে। পূর্ণ সমন্বয়টি এখনও হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে আশা হয় United Field Physics সুদূরবর্ত্তী আদর্শমাত্র না থাকিতে পারে। তবে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—অতর্কিত "অন্তরায়" দেখা দিয়া হিসাব ওলট-পালট করিয়া দেওয়াও বিচিত্র নয়। এ বিশ্বটা আমাদের বুদ্ধির দরবারে "বেয়াড়া" হইতেই বা কতক্ষণ! যখনই "এইবার বুঝি কাজের সুরাহা হইল" ভাবিয়াছি, তখনই কোথা হইতে সব-ভণ্ডুল-কারী কেহ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে যাই হোক্, পদার্থ-বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন করার দিকেই অগ্রসর হইতেছে—এটা নিঃসংশয়ে মনে করার সময় আসিয়াছে। "মন্ত্র" "যন্ত্র" প্রভৃতির যেটা "বৈজ্ঞানিক" ভিত্তি সে ভিত্তি দৃঢ়তরই হইতেছে। বিজ্ঞান পরীক্ষা-সমীক্ষায় যে যন্ত্র ব্যবহার করে, তার নাম Apparatus বা Instrument. অন্বীক্ষা বা বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধির (Logicএর) যে বিশেষ "যন্ত্র"টি ব্যবহার করে, তার সাধারণ নাম গণিত—Calculus. এই দ্বিবিধ যন্ত্র সাহায্যে বিজ্ঞান

সৃষ্টির সর্ব্বাবয়বে (অণু কি মহানে) যে মৌলিক যন্ত্র (Basic Structure) রহিয়াছে, তাই ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যন্ত্ররূপ বলিতে তিনটিই বুঝিতে হইবে—আকৃতিরূপ (Form Pattern), ক্রিয়ারূপ (Function Pattern) এবং শক্তিরূপ (Force or Power Pattern)। অণুর ভিতর নাভি, অর, নেমি—এ তিনের সন্ধানই বহুদিন মিলিয়াছে। সম্প্রতি "নাভি" বা কেন্দ্রনিষ্ঠ যে যন্ত্র সেইটায় বেশী মনোযোগ। ফলে নাভিতে মহাশক্তিব্যূহের আবিষ্কার ও প্রয়োগও সম্ভাবিত হইয়াছে। প্রয়োগটি আমাদের বর্ত্তমানে আশ্বস্ত করে নাই, সন্ত্রস্ত করিয়াছে। সে যাই হোক, সূক্ষ্মের দহরাকাশে বিন্যস্ত ঐ বিপুল শক্তিযন্ত্রটাই আসল কথা। সে যন্ত্রের একটা প্রতিকৃতি (Graphic representation) আঁকিবার চেষ্টাও যে না হইতেছে এমন না। কিন্তু প্রতিকৃতি সাব্যস্ত হয় নাই। সে প্রতিকৃতি আমাদের "কল্পনাযোগ্য" (Picturable) না হইলেও ক্ষতি নাই। পূর্ব্বশতকে লর্ড কেল্‌ভিনের মত এ বায়না আমরা আর করি না—যে কোনও "তথ্য" কে বাস্তব হইতে গেলে তার একটা "যান্ত্রিক আদর্শ" (mechanical model) আমাদের করিতে পারা আবশ্যক। Mechanical কেন, mental imageএরও বালাই আর তেমন নাই। বড়্—রাদারফোর্ডের আণবিক কাঠামো এখন সবদিকে সামাল দিতে অপারগ। তবু এটা ঠিক যে, অণুর নাভিতে একটা শক্তিব্যূহরূপ আছেই। সে ব্যূহটা যে ঠিক কিরূপ তাহা নয় এখন না জানিতে পারা গেল।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মনে হয়—যেটাকে অণুর নাভি ভাবিতেছি, সেটাও তার বাহিরেরই কাঠামো—disposition of crustal or shell forces. মূল হইতে সৃষ্টির ধারা ঐখানে নামিয়া আসিয়া যেন তার ব্যক্ত শক্তিরাশি "জমাট" করিয়া রাখিয়াছে; ভিতরে প্রাণরূপে, মনরূপে, চৈতন্য ও আনন্দরূপে শক্তির "অন্দর মহলগুলি" আপন আপন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে (অর্থাৎ "যন্ত্রে") সাজান রহিয়াছে। সে সবের সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। ক্রমশঃ অন্য উপায়ে, পাইব। কেননা, জড় যন্ত্র আয়ত্তে আনার যে উপায়, যে কৌশল, প্রাণাদির যন্ত্র আয়ত্তে আনার ঠিক সে উপায়, সে কৌশল নয়। তার বিদ্যা (technique) আলাদা। সে বিদ্যা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কাছে পাইতে হইবে।

বিরাটের ক্ষেত্রেও, Space এর সান্তুতা, বক্রতা, বস্তু ও বক্রতার সম্পর্ক,

স্থূল বিশ্বের বৰ্দ্ধিষ্ণুতা—ইত্যাদি বিরাটের আলেখ্যটাকেও কল্পনার গণ্ডী ছাড়াইয়া লইতেছে। তবে, অন্বীক্ষায় পদার্থ সমন্বয় ও সঙ্গতির সুরাহাই হইতেছে মনে হয়। বিরাটেরও নিশ্চয় একটা "যন্ত্র" রূপ আছে—আকৃতি, ক্রিয়া এবং শক্তিবিন্যাস এই তিন ভাবেই। সে রূপ কল্পনা আঁকিতে না পারিলেও আছে। যেমন, হিসাবে অতিমাত্রায় জটিল হইল, অথবা পরীক্ষার "ধোপে টিকিল না" বলিয়া আগেকার সেই ঈথারকে না হয় ছাড়িলাম। কিন্তু স্বগত-সংস্থান-বিশিষ্ট Space (intrinsic geometry of Space), বিরাটের যে যন্ত্রমূর্ত্তি সেটাকে নূতন করিয়া দেখাইয়া দিল। যন্ত্রদ্বারাই মাধ্যাকর্ষণাদির (gravitation) ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। আলোকগতিবেগের ধ্রুব সংখ্যাটি ধরিয়া বিশ্বের সব কিছু "সমীকরণে" লাগিয়া যাইল! কাল্পনিক সংখ্যা "i" টি-সকল মৌলিক গণাগাথার (যথা হাইজেন্‌বার্গ সমীকরণে) প্রবিষ্ট করাইল! এতে ঠিকই হইতেছে মনে হয়। যন্ত্র আর "যান্ত্রিক" (mechanical) রহিব না, "মানসিক" ও (mentally picturable) রহিব না, বলিতেছে। ঠিকই বলিতেছে। মূলে যে আদ্যাশক্তি তিনি যদি অনন্ত চিচ্ছক্তি লীলাশক্তি হন, তবে কোন "বস্তুতান্ত্রিক" কাঠামোতে সে শক্তিকে পূরিবে কে? "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি যে সব অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাঁর—একাংশেন স্থিতং জগৎ। অতএব, সব কিছু যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের বিবৃতি—বড়জোর নৈকটিক approximate. তবে মূল যন্ত্রটি কিরূপ—এর অনুসন্ধান চলিবেই। পদার্থবিজ্ঞানে যতদূর চলে চলুক। প্রাণ ও মনোবিজ্ঞানে যতদূর চলে চলুক। এক্ষেত্রেও আগের চেয়ে আগাইয়া আসিতেছি মনে হয়। কিন্তু শেষের কাছ দিয়াও এখনও ঘেঁষিতে পারি নাই।

এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের "কু-সংস্কার" টা মানুষের আদিমতম সংস্কার। সকলদেশে, সভ্য অসভ্য সকল মানব গোষ্ঠীতেই এ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। "ম্যাজিক" বলিয়া তুড়ি দিয়া উড়াইলে চলিবে না তো! "ম্যাজিক" গভীর ভাবে বিবেচিত হবার যোগ্য মনে হইয়াছে। আদিম পৰ্ব্বত গুহাগাত্রেও "যন্ত্র", মিশর-ব্যাবিলন-মহেঞ্জদারোতেও "যন্ত্র", বৈদিক যজ্ঞে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও "যন্ত্র"। আর বর্ত্তমান সভ্যতা তো "যন্ত্র" সভ্যতাই। এ যন্ত্র কি বাদ দিবার? এর মূল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সে মূল

কথা শুধু সাধন বিশেষের ঘরওয়া কথা নয়; সে কথা স্থূলেই আরম্ভ করিতে হয় বটে, তবে "এহ বাহ্য আগে কহ আর"—এভাবে ভিতরে আগাইয়া যাইতে হয়। যত গভীরে যাইব, তত "স্বাভাবিক" ও "সমর্থ" যন্ত্রের সন্ধান পাইব। জড়বিজ্ঞানাদি খানিকদূর বেশ গাইডের কাজ করিবে। কিন্তু তার পর? অধ্যাত্মযোগেই আশ্রয় লইতে হইবে। তাতে বহির্বিদ্যার পূরণও হইবে, মার্জ্জনও হইবে।

বক্তৃতা সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া দেওয়ার কথা হইয়াছিল। ভাষা ও ভঙ্গী তাই কথঞ্চিৎ "ফেনিল"। সতর্ক সারগ্রাহী অসহিষ্ণু হইবেন না। ফেনার মাঝেও দৈবক্রমে দুটো একটা শুক্তি মিলিতে পারে। সাবধানে খুলিয়া দেখিবেন—তাতে কি আছে, না আছে।

একটা না একটা মুখোস আমরা সকলেই এবং সৃষ্টির সকল সামগ্রীই পরিয়া বসিয়া আছি। মুখোস মানে এমন একটা বন্দোবস্ত, যার ফলে আমরা কেহই আমাদের ঠিক স্বাভাবিক রূপটি জানিতে পারিতেছিনা; যেরূপটি জানিতেছি, তাও পুরাপুরি নয়। এই বন্দোবস্তের ফলেই রূপ আমাদের কাছে দেখা ও অদেখা, সাচ্চা ও ঝুটা, মোটা ও চিকন এইসব রকমের হইয়া রহিয়াছে। সংসার-ব্যবহারের খাতিরেই এই রকম বন্দোবস্ত বোধহয় হইয়া থাকিবে। আমাদের ব্যবহারিক বা কারবারী জীব হবার কি প্রয়োজন ছিল—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে "এটা সেই মূল কারবারীর-লীলা"—এ-বলা ছাড়া অধিক স্পষ্ট করিয়া বলার কোনই উপায় দেখি না। এ-লীলার কোথায় আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় অন্ত—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেত আমাদের একটা বৃত্তের পরিধির মুড়ো খুঁজিয়া বাহির করিতে যাইবার মত মুস্কিলে পড়িতে হইবে। একটা সাপ তার ল্যাজটা মুখের মধ্যে দিয়া গোল হইয়া রহিয়াছে; তার কোনটা মুখ, কোনটা ল্যাজ ঠিক করিবার যেন উপায় নাই; —এইটাই যেন হইল এই দুনিয়ার বন্দোবস্তের চেহারা। প্রাচীনেরা যে-সকল সাঙ্কেতিক রূপ বা যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে এই আজব দুনিয়াদারীর হা'ল বুঝাইতে চাহিতেন, সে সবের মধ্যে আমি উপরে ঐ যে সাপের নক্সাটি আঁকিলাম, সেটাও অন্যতম প্রসিদ্ধ যন্ত্র। ও সঙ্কেতের মধ্যে হয়তো আরও গূঢ় রহস্য লুকান আছে। আমি উপরের পরদাখানা একটু সরাইয়া আপনাদিগকে রহস্যের সোজাসুজি চেহারাটাই দেখাইলাম মাত্র। স্বস্তিক, পদ্ম, চক্র প্রভৃতি

সম্বন্ধেও ঐ কথা। সাধারণতঃ "যন্ত্র" (Mystic Diagram or Apparatus) তিন রকমের :—(১) বাস্তব (realistic) ; (২) সাঙ্কেতিক (symbolic) ; এবং (৩) তাত্ত্বিক (ideal)। এ তিনেরি মূলে থাকে মৌলিক (Basic) বা স্বাভাবিক যন্ত্র। পূর্ব্বোক্ত তিনটির আবার অবান্তর ভেদ আছে। যথা—বাস্তব যন্ত্র (ক) কারণীভূত যে শক্তিবিন্যাস তারই আধার বা প্রতিকৃতি ; অথবা (খ) কার্য্যাভিব্যক্তির (effectual manifestation) প্রতিকৃতি ; ইত্যাদি। সে যাই হোক—আপনারা আসল কথা কয়টার খেয়াল রাখিয়া যাইবেন।

বুঝিতেছি যে, আমাদের দেখা গাছের পাতার সবুজ রঙ বিচিত্র চেহারাটা বাহিরে ঈথার সাগরে (আগেকার বৈজ্ঞানিক কাঠামোই লইতেছি) অণু-পরমাণু রাজ্যে একটা ছন্দোবদ্ধ নৃত্য বা উত্তেজনার ফল। বাহিরে একটা শক্তির খেলা হইতেছে ; সেই শক্তির খেলা আমার রেটিনা, নার্ভ মগজ ও মনকে চেতাইয়া আমার কাছে যে ভাবে প্রতিভাত হইল, সেইটা হইল, আমার কাছে পাতাটির চেহারা ও রঙ্। বাহিরে ঈথারের স্থান বিশেষে ঐ প্রকার শক্তির বিন্যাস ও শক্তির বিলাসকে আমরা স্থানান্তরে শক্তিকূট বা শক্তি-ব্যূহ বলিয়াছি। অনেক বৈজ্ঞানিক আজকাল ঈথার মানিতে নারাজ, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত অণু-পরমাণু মানিতেও নিমরাজী বা গররাজী। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিকেরই শক্তি নইলে চলে কি? শক্তিকূট যে চাইই চাই। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই "শাক্ত"। আমরা এদেশে আজকাল দেখি আর নাই দেখি, তাঁরা দেখিতেছেন যে, বস্তু মাত্রেই শক্তি-মূর্ত্তি বা শক্তি-বিগ্রহ। আমাদের প্রাচীনেরা আবার শৈবও ছিলেন ; বস্তুমাত্রকেই (কেবল জীবকেই নয়) শিব-বিগ্রহ বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে দেখিয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্তুকেই তো (একটা ধুলিকণাই হোক, আর একজন ইন্দ্রচন্দ্রই হোন) তাঁরা শক্তি ও শিব এই দুইরূপেই দেখিয়াছিলেন ; প্রত্যেক পদার্থের শক্তিকূট মূর্ত্তি এবং শুদ্ধ, নিরঞ্জন "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" মূর্ত্তি তাঁহারা পাশাপাশি রাখিয়া এবং অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন ; পদার্থের এই অপরূপ রূপটি, তাঁহাদের দৃষ্টিতে যুগল অথচ অভিন্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। বৈজ্ঞানিক শক্তি-মূর্ত্তিটা দেখিতে সুরু করিয়াছেন। সে যুগের বৈজ্ঞানিকদের আম্ মোক্তার দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার এই মূর্ত্তিটাকে একটা বিরাট Inscrutable Power বলিয়া প্রণিপাতও

করিয়াছেন বটে। কিন্তু অভিন্ন যুগলমূর্ত্তি, ঐ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—এখনও বৈজ্ঞানিকের চোখে প্রকটিত হন নাই। তবে একটু সবুর করুন, দেরিও হয়ত বেশী নাই। এডিংটন, জিন্‌স প্রমুখ যাঁরা বিজ্ঞানের তরফে নূতন ওকালতি করিয়াছেন, তাঁরা ঐ মহাশক্তিকে "জড়" অথবা অজ্ঞেয় ভাবার চাইতে চেতন বুদ্ধিশক্তি ভাবার দিকেই বেশী ঝুকিয়াছেন।

প্রাচীনেরা যে শুধু এইভাবে শাক্ত-শৈবই ছিলেন এমন নহে, বৈষ্ণবও ছিলেন। নিখিল পদার্থের মধ্যে যে অদ্বৈত স্বরূপটি কোথাও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত, কোথাও প্রায় অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছেন, তিনি শুধু যে শিব, শান্ত, শুদ্ধ এমন নহেন; তিনি যে রস, তিনি যে আনন্দ, তিনি যে সুন্দর, তিনি যে মধুর! নারিকেলের ছোবড়া চিবাইতে ব্যস্ত থাকিয়া তার ভিতরকার রসের সন্ধান আমরা রাখি নাই। ভোগ্যের স্থূল রূপটা ভোগ করিয়া আমরা সুখের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ব্যথা পাই, তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আপশোষ বুকের ভিতর লইয়া যাই। বস্তুর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর একেবারে অন্দরের বা মর্ম্মের রূপটি বুকে ধরিতে পাইলে দেখিতাম সেটা যে নিবিড়-ঘন রস-স্বরূপ; বিশ্বভুবনের মহাব্রজে কোন্ নীপকুঞ্জে লুকাইয়া আপন মুরলী ধ্বনিতে নিখিলের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে; অখিলের মর্ম্মবাসিনী নিত্য-রস-পিপাসাটিকে বিরহ-বিধুরা গোপীদের মতন নিজের অন্বেষণে এই চরাচর মধুবনে অভিসারিকা করিয়া পাঠাইয়াছে। নিখিলের মর্ম্মস্থলবাসী, অথচ নিখিলের মরম-আকুল করা এই যে নিবিড়-ঘন-রস-স্বরূপ, তাহাই যে কৃষ্ণরূপ। সে রস-স্বরূপ কৃষ্ণরূপে পাগল শুধু যে জীবেরই "পরাণী" এমন নয়; এ মহাব্রজে কোথাও এমন একটা রজঃ বা ধূলিরেণুও পড়িয়া নেই, যেটা সেই ব্রজসুন্দরের "দরশ-পরশ" কাঙ্গালী হইয়া নাই। সত্যি কথা। প্রত্যেক এটম্ বা অণুর ভিতরেই একটা লীলা, একটা রসানুভূতি, ও রসান্বেষণ চলিতেছে, যার খবর গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) বড় বড় ইকোয়েশন ফরমুলাগুলো পায়নি। পদার্থবিদ্যা তাই এই সেদিন পর্য্যন্ত পদার্থকে "পুতুল" বা "কল" বানাইয়াই রাখিয়াছিল। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার জারিজুরি ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে,—নয় কি? সে বিদ্যারও ঘরের মেজের তলে কোন্ অজানা সুন্দরের সুড়ঙ্গ কাটার শব্দ এখনই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এবং আঘাতের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে গরবিণী বিদ্যারও হিয়া যে এরই মধ্যে দুরু দুরু কাঁপিতে

সুরু করিয়াছে। বুঝি বা এইবার জড়বিদ্যার কুল-শীল-মান সবই ভাঙ্গিয়া যায়! তা যায় যাক্—যেদিন এই বিদ্যাসুন্দরের মিলন হইবে—পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা নিখিল পদার্থের মাঝে ওতপ্রোত রস ও আনন্দের লীলাবিলাসের সন্ধান পাইবে—সেদিন "মরিয়া" হইয়া আগেকার পদকর্ত্তাদের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও গাহিব "ননদিনি বলো নগরে ডুবেছে রাই-রাজনন্দিনী আজ কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।" কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগর যে নিবিড় ঘন রস-সায়র! ও কলঙ্কে কলঙ্কিনী হবার সাধ যে সবারই! ও রসে বঞ্চিত হতে চাইবে কে?

আর শ্রীরাধা? তিনি যে এই নিবিড়-ঘন রসেরই লীলামূর্ত্তি; যিনি লীলা করিতে বসিয়া বিশ্বভুবনময় আপন স্বরূপ হ্লাদিনী শক্তির বিচিত্র ভঙ্গিমায় উছলিয়া যাইতেছেন, কাজেই ব্রজবিলাসিনী; যিনি লীলা করিতে গিয়া বিশ্বের বিবিধ ব্যবহারের গণ্ডীতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বাঁধিয়াছেন, আয়ানের ঘরে জটিলার কুটিলার গিন্নীপনার বধূ সাজিয়া বসিয়াছেন; ব্যবহারিক জীবের ছোটখাট ঘরটিতে ঘরণী সাজিয়াছেন; তার রস বা আনন্দের কারবারী কূপটুকু, গর্ত্তটুকু ভরিয়া রাখিয়াছেন। মনে করনা কেন, জটিলা কুটিলা অবিদ্যা ও ভেদ বা দ্বৈত দৃষ্টি। অবিদ্যা দুর্জ্জেয়া, গহনা, অনির্ব্বচনীয়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; কাজেই, জটিলা; ব্যবহারী জীবকে সে গর্ভে ধারণ করিয়াছে। আর ভেদদৃষ্টি বড়ই মুখরা। লাগানো ভাঙ্গানো তার স্বভাব। সে জীবেব সহোদরা। জীবের সাথে সাথে থাকে। তাকে আগুলিয়া লইয়া বেড়ায়। জীবের বেলাতেও এই শাশুড়ী ননদীর ঘরে যিনি রসময়ী রসিকা বধূ হইয়া ঘর করিতে আসেন, তাঁর যে উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা; তাঁকে যে "শানান ক্ষুরের ধারে বাস করিতে হয়, নড়িলে কাটে"! কিন্তু আমার অন্তরে জটিলা কুটিলার শাসনে যে রসিকা, যে হ্লাদিনী শক্তির একটি কণা বধূ সাজিয়া ঘর করিতেছেন, তাঁর তো কোনও মতেই আমার ভিতরেই সমাপ্ত হইয়া, নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইয়া থাকার উপায় নাই! কোনো গণ্ডী দিয়াই তো তাঁকে বাঁধিয়া রাখার পথ নাই! যিনি ব্রজবিলাসিনী, তাঁকে আয়ানের ঘরণী হইয়াই থাকিলে চলিবে কেন? সমস্ত বিশ্ব ভুবনে ওতপ্রোত যে রস বা আনন্দ, যাহা হইতে সকল সৃষ্টির প্রেরণা, সকল গতির আবেগ আসিতেছে সে রস বা আনন্দের "সায়রের" সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সম্পর্কশূন্য হইয়া আমার অন্তরের রসধারা থাকিতে পারে কি? আমার অন্তরের রসকণাটি "রসো বৈ স" এর তরে উতলা না হইয়া থাকিতে পারে কি? ব্রজ বা বিশ্বের অভ্যন্তরে বহমানা

যে বিপুল রসধারা তাই তো যমুনা। আমার অন্তরের বধূটিকে এই যমুনায় জল আনিতে সাঁঝ সকাল যাইতে হয়ই হয়! আমার রসের কলসটিকে লইয়া এই বিশ্বের বিচিত্র রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ, ভাব বেদনায় নানা ভঙ্গীতে তরঙ্গায়িত যমুনার জল ভরিতে না যাইলে যে নয়! জল আনিতে গিয়া "বিধি যে বড়ই সাধিল বাদ।" যমুনার ঘাটে গিয়া আমার রসময়ী নিজের সেই স্বাভাবিক রূপটি, কিনা, নিবিড় ঘন রস-রূপটির সন্ধান শনৈঃ শনৈঃ পাইয়া থাকেন। আগে বাঁশরীর সুরে পরিচয়। তখন সেই পরিচয়ের ভিতর দিয়া জীবের রসাত্মিকা, রাগাত্মিকা বৃত্তিটির নিজেরই নিত্য পূর্ণ স্বাভাবিক রূপটির কিনা কৃষ্ণের পানে পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগ হইতে সুরু করিয়া ক্রমে ব্রজের সকল লীলা। এর সাধিকা ও সহায় গোপী ও রাখালগণ সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যাঁর এ লীলা, তাঁর মুরলী-ধ্বনিতে যমুনা নাকি উজান বহেন। বিশ্বের রস-ধারা বহিয়া গিয়া কেবলই বিশেষ বিশেষ নাম রূপে ব্যবহারের গণ্ডীর মাঝে নিজেকে কৃপণ ও কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিতেছে; চির-পূর্ণ মধুর যিনি, তাঁহার আকর্ষণ অন্তরে বুঝিতে পারিলে এই অধঃস্রোতঃ ঊর্দ্ধস্রোতঃ হইয়া যায়; ধারা উল্টাইয়া হয় রাধা-ভাবানুগা। অরসিক আমরা— এই অপূর্ব্ব রসতত্ত্ব বুঝিবার প্রাণ আমাদের কই? পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক নিখিল বস্তুর আড়ালে শক্তি মূর্ত্তিটিকে এরই মধ্যে কতকটা দেখিয়াছেন; কিন্তু এ শক্তি যে স্বরূপতঃ শিব ও রস হইতে অভিন্ন এটা তাঁরা এখনও ধরিতে পারেন নাই। এইজন্য স্বাভাবিক রূপের চরম বা পরম ভাবটি—যে ভাবটি ধরিতে পারিলে স্বয়ং শ্রুতির আশ্বাস বাণী—"অপাম সোমং অমৃত অভূম," সে-ভাবের থাকে, এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু না পারুন, যতটা উঠিয়াছেন, ততটাতেই তাঁহার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, সময়ে বিজ্ঞানের 'পূর্ণাভিষেক'ও হইবে। কারণে পক্ষপাত তাঁর তো আছেই; সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপ "কারণানন্দের" আস্বাদে তিনি আর কতদিন বঞ্চিত থাকিবেন?

গাছের একটা সবুজ পাতা পরীক্ষা করিতে আমরা এতকথা ছাঁদিলাম, তার কৈফিয়ৎ আমাদের আজও দিতে হইবে কি? সবুজ পাতাই বলুন, ধূলিকণাই বলুন, আর জীবই বলুন—প্রত্যেক জিনিষই, তলাইয়া দেখিলে এক একটা শক্তি-বিগ্রহ—system of forces, বা এক কথায়, stress-system।

একথা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। তলাইয়া দেখিলে নাদ-বিন্দু-কলা মূলে স্পন্দ। এই মূল স্পন্দের স্থূল স্পন্দনরূপটি-ও বিজ্ঞানের সম্মত। আরও তলাইয়া দেখিলে, তাহা শান্ত, শিব, অদ্বৈতমূর্ত্তি; যোগীরা সমাধিতে সচ্চিদানন্দ-ঘন রূপে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। এখানে পাতাতে, আমাতে, ধূলাতে ভেদ নাই। ইহা নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জন সত্তা। রসিকেরা এই পরম সত্তাটিকে আবার রস রূপে ও রসের বিলাস রূপে, লীলা রূপে প্রাণে অনুভব করিতে ভালবাসেন। শানাই বাজাইবার সময় একজন শুধু পোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকেন; অপর জনে তারই উপর নানান পর্দ্দায় রাগ রাগিণীর আলাপ করেন। দুই-ই কিন্তু স্বর—স্বরূপে। জ্ঞানীরা নিরঞ্জন সত্তা শানাইয়ের পোঁ; রসিকের রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস, সেই পোঁ এর উপরে নানান্ স্বরের মনোহারী কর্‌তব। পশ্চিমের বিজ্ঞান যে শক্তি-রূপটি দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন তার আড়ালেও এইরূপ শানাইএর পোঁ ও করতবের আলাপচারী চলিতেছে! সে আলাপচারী শোনার কাণ এখনও যে হয় নাই।

যাই হোক সবুজ পাতাতেই ফিরিয়া আসুন। এই চর্ম্মচক্ষে পাতাটি মোটামুটি একরকম দেখিয়াছি। আপনার চোখ ভাল হইলে, আপনি আমার চেয়ে আরও একটু ভাল দেখেন। একখানা ম্যাগনিফাইইং গ্লাস লইয়া পরীক্ষা করি। পাতাতে আগে যেসব দেখিতে পাই নাই, তার কতক কতক এখন দেখিতেছি: কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা; কত ছোট ছোট দাগ; কত ছোট ছোট প্রাণীর পঙ্গপাল তার উপরে ইত্যাদি। বেশী জোরের অণুবীক্ষণ হইলে আরও অনেক অদেখা জিনিষ উহাতে দেখি। আমাদের বিশ্ব-বিশ্রুত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্‌ক্রোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে গাছপালার, লতা পাতার এমন সূক্ষ্ম ব্যাপার চাক্ষুষ দেখাইয়াছিলেন যে, সে-সব দেখিবার কল্পনাও কস্মিন্ কালে করিতে পারি নাই। এক আধ মিনিটের মধ্যে গাছটা কতটুকু বাড়িল; সামান্য একটু বিষ প্রয়োগে বা অন্যরকমের উত্তেজনায় তার কোথায় কতটুকু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইয়া গেল; এসব ব্যাপার এতই সূক্ষ্ম যে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় করিয়া না দেখিলে ইহারা চক্ষুগোচর হয় না। অথচ যন্ত্রের কৃপায় এই সকল অতীন্দ্রিয় ঘটনা আমাদের দেখা হইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? পাতার প্রত্যেক জীবনকোষ বা

'সেল' টির না হয় আমি অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরখ্ করিলাম। কিন্তু যেসব যৌগিক অণু (Molecules) এর সংহতিতে বা 'সংঘাতে' এক একটা সেল এর দানা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মলিকিউলার মশালগুলাকে আমাকে দেখাইবে কে? রাসায়নিক পরীক্ষা? রাসায়নিক পরীক্ষা—মলিকিউলদের হিসাব নিকাশ দেয়; জমাখরচ খতাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দেয়; কিন্তু কোনও রাসায়নিক পরীক্ষাগারেই একটা জলের মলিকিউল, অথবা একটা কার্ব্বো-হাইড্রেট মলিকিউল আমি কস্মিন্ কালেও চক্ষে দেখি নাই। এক ফোঁটা জলে এত মলিকিউল আছে যে, তাদের হিসাব দিতে গেলে এক একটা তারার দূরত্বের কথা মনে পড়ে; যেসব তারা হইতে আলো সেকেণ্ডে প্রায় দুলাখ মাইল ছুটিয়া আমাদের কাছে হাজার বছরে আসিয়া পৌঁছে। তাই বলিতেছিলাম যে অণুবীক্ষণে আমার কাছে পাতার খানিকটা অদেখা দেখা হয় মাত্র, সবটা নয়।

কিন্তু ধরুন, একটা অদের্শ অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে লাগিলাম। এমন কি, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপও তার কাছে হার মানে। পাতার মলিকিউলগুলা সবই না হয় এখন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাতার এই সব সাবয়ব, পরিমিত পরিচ্ছিন্ন, জটিল সূক্ষ্ম বা "অণিষ্ঠ" অংশগুলিই কি চরম এবং এদের দেখাই কি চরম দেখা? তা ত নয়। বৈজ্ঞানিক একটা মলিকিউল ভাঙ্গিয়া তার দেহের মশলা "এটম"গুলি আমাকে দেখাইবেন, অবশ্য চক্ষে নয়, যন্ত্রেও নয়,—হিসাবে গণাগাথায়। পাতাটা যেমন মলিকিউলদের সংহতি বা সংঘাত, তেমনি মলিকিউলটা আবার এটমদের সংঘাত 'সংঘাত' মানে ব্যূহ। এটম বা মলিকিউলদের এই রকম ব্যূহ রচনা পরস্পরের শক্তি বিন্যাসের ফল। পরস্পর পরস্পরের শক্তিদ্বারা বিধৃত হইয়া ঐ রকম ব্যূহ রচনা করে; যেমন ধারা, বাহিরে সৌরজগতে শ্রীমান্ সূর্য্য ও তস্য গ্রহোপগ্রহ বাবাজীগণ। একটা মলিকিউলে এটমেরা শক্তিবিন্যাস করিয়া যে কেমন করিয়া ব্যূহ রচনা করে তার আন্দাজ রসায়ন শাস্ত্রের এক শাখার (Physical Chemistryতে) খুবই নিপুণভাবে করা হইয়া থাকে। এক একটা বেনজিন মলিকিউলের ব্যূহের নক্সা কত বিচিত্র! এ সবই কিন্তু অদেখা রূপ। তবে আজ আমরা আদর্শ অণুবীক্ষণে অদেখা রূপও দেখিতে বসিয়াছি। মলিকিউলে পৌঁছিয়া দুইটা ব্যাপার

দেখিতেছি। প্রথম ঐসব বামনাবতার, বালখিল্য ভূতদের রূপ। পাতার রূপ, রস, গন্ধ উহাদেরও নাকি আছে। পশ্চিমে Psychologyতে যে গুলাকে Secondary qualities বলা হইত, সেগুলা ঐ বালখিল্যদের আছে। আমাদের আদর্শ অণুবীক্ষণে তাই তাদের রূপ দেখিলাম। তারপর আর একটা ব্যাপার। এ-বালখিল্যদল কোনো গাছের ডালে পা ঝুলাইয়া দিয়া তপস্যা-নিরত হইয়া নাই। বাউলদের মত এদের অফুরান্ নাচের আর বিরাম নাই। পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এ উহার জটাতে গ্রন্থি বাঁধিয়া ব্যূহ রচিয়া কি অবিশ্রান্ত নৃত্য তাদের! পাতার সেলের মধ্যে যখন জৈব পদার্থ (Protoplasm) পাক খাইতেছে, তখন সে পাক খাওয়ার সঙ্গে তারাও পাক খাইতেছে। সূর্য-কিরণ সম্পাতে পাতার হরিৎ অঙ্গরাগ (Chlorophyl) যখন বাতাসে অক্সিজেনটুকু বাদ দিয়া কার্ব্বন ভাগটুকু লইয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, তখন সেই নীরব শান্ত দৈনন্দিন ব্যাপারটুকুর অন্তরালে যে কতবড় জটিল ও রহস্যময় একটা শক্তির খেলা চলিয়াছে, তাও না হয় আমরা ঐ আদর্শ অণুবীক্ষণের মাহাত্ম্যে দেখিলাম। সূর্য্যকিরণ হইতে তাপ চুরি করিয়া নিজের নিজের মলিকিউলদের ব্যূহের মাঝখানে পুরিয়া রাখা—এ রোগটাও নাকি লতাপাতাদের বিলক্ষণ আছে। কুরু সেনারা যেমন ধারা বিরাট রাজ্যে গরুর পাল আটকাইয়া ছিল, তেমন ধারা। তাপ, আলোক, তাড়িতশক্তি, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে সে-সব ব্যূহের চেহারা যে কেমনধারা বদলায়, তাও না হয় আদর্শ অণুবীক্ষণ আমাদের দেখাইল। এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই—শক্তিমন্দিরের মণিমণ্ডপ রত্নবেদিকার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া যা যা দেখিলাম তাহাতেই আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই। কিন্তু দেখার কি শেষ হইয়াছে! না তা তো নয়।

রত্নবেদিকার আরও নিকটে, আরও একটু পাশে আসিয়া দেখিলাম ব্যূহের অভ্যন্তরে আবার যে ব্যূহ; চক্রের মধ্যে আবার যে চক্র; পদ্মের ভিতরে আবার যে পদ্ম রহিয়াছে! মলিকিউল ছাড়াইয়া এবার এটম দেখিলাম। এখানে আর নাকি রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই ;—অর্থাৎ Secondary quality গুলি নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন Primary quality গুলিই এখন রহিয়া গেল; অর্থাৎ সাবয়ব, গুরুত্ববিশিষ্ট, গতিমৎ, পরস্পরব্যাবর্ত্তক (impenetrable) সূক্ষ্ম, রেণুপুঞ্জ মাত্রই রহিয়া গেল; সেটা আর পাতার

সবুজ রঙ্ পায়নি, পাতার রস ও গন্ধও পায়নি। রঙ্, গন্ধ, রস, আর আর সব গুণ, মলিকিউল ছাড়াইয়া আরও সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে গেলে পাওয়া যায় না। আদর্শ অণুবীক্ষণ মলিকিউলেও রঙ্ আমাদের দেখিতে দিবে, কিন্তু তারও ভিতরে, এটমের রাজ্যে বা এলাকায় ঢুকিলে আর তো রঙ্ নেই। এটা অবশ্য শিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের আন্দাজ। আমরা আপাততঃ তাঁরি দেওয়া যন্ত্র হাতে করিয়া তাঁরই ফরমাইস মত চলিতেছি। তথাস্তু—ধরুন, তাঁর আন্দাজই ঠিক। গতিশীল, গুরুত্ববিশিষ্ট, পরস্পরব্যাবর্ত্তক এটমদের এলেকায় আমরা এখন আসিয়া পড়িয়াছি। এ রাজ্যে কতকগুলি গুণ (যথা—বর্ণ, গন্ধ, রস) নাই; কিন্তু অপর কতকগুলি আছে। শুধু তাই নয়; গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ এদের বিভিন্ন "গ্রাম" ও শ্রেণীও নিরূপিত আছে। একটা মলিকিউলের মাঝে তার গোষ্ঠীভুক্ত এটম্‌গুলা একটা শক্তিব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। এরাও যে আরও ছোট ছোট বালখিল্য বাউল। এদের নাচের, হেলাদোলায় চলাফেরার বিরাম নাই। এই যে এটমদের শক্তিব্যূহ ও শক্তিবিলাস ইহা মলিকিউলদের শক্তি ব্যূহ ও শক্তিবিলাস অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও মৌলিকতর। এ শক্তিব্যূহ আরও গোড়ার কথা।

যাক—আদর্শ অণুবীক্ষণ এই পর্যন্ত দেখাইয়াই কি রেহাই পাইল?—না। গেল শতাব্দীতে হয় তো পাইত, যখন এটমকে নিরেট বর্ত্তুল ভাবিয়াই বিজ্ঞানের ব্যবহার চলিত। এখন আরও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এটমও নিরেট মৌলিক পদার্থ নয়। তারও ভিতরে বিচিত্র এক জগৎ আছে। ইহা নাকি তড়িদণু বা ইলেকট্রন প্রোটনাদির জগৎ। এই তড়িদণু নাকি এক একটা এটমের মাঝে গ্রহ উপগ্রহের মতো পাক খাইতেছে। তাদের বেগ অদ্ভুত, শক্তিও প্রায় অপরিসীম। এটমে ঢুকিয়া শক্তির যে চেহারা দেখিলাম, তা দেখিয়া অবাক হইবার কথা। আমাদের এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ শক্তি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণুর অন্দর মহলে মজুদী (intra-atomic) শক্তির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? "বেদ ও বিজ্ঞানের" অনেক বক্তৃতায় এসব কথা সবিস্তার বলিয়াছি। আজ আমরা এটম-নিগূঢ় শক্তিব্যূহটি কেবল একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। যে আদর্শ অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে স্বরু করিয়াছি, তার কি এইখানেই ছুটি? কৈ—কোথায় ছুটি? তড়িদণুগুলিও সাবয়ব, পরিমিত পদার্থ; কাজেই তাদেরও

একটা অন্তঃপুর বা অন্দর মহল থাকার কথা। থাকিলে, সেখানে আবার শক্তির রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে চলিয়া কোথায় গিয়া বিশ্রান্তি? একটা পাতা দেখিতে সুরু করিয়া যদি এইভাবে দরজার পর দরজা খুলিয়া তার সহস্রমহল পুরীর একেবারে মাঝখানে পৌছিয়া, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পূর্ণশক্তি -মূর্ত্তিটি আমি দেখিতে পাই, তবেই আমার দেখা পুরা বা চরম দেখা হইল। আদর্শ অণুবীক্ষণ ততদূর পর্য্যন্ত আমায় না দেখাইয়া খালাস পাইবে কি? বৈজ্ঞানিকের দেখা এখনও অনেকটা কুয়াশায় ঘেরা। তিনি কিছুদিন আগেও ঈথার সমুদ্রে ইলেকট্রন লইয়া পাক খাওয়াইতেছিলেন; ইলেকট্রনকেও হয়তো ঈথারের অবস্থাবিশেষ (intrinsic Strain Centre বা Gyrostatic Strain) ভাবিতেছিলেন; ঈথারের মধ্যে নানা রকমের ঢেউ তুলিয়া চারিধারে ছড়াইয়া আমাদিগকে রং-বেরং দেখাইতেছিলেন, এখনও রেডিও শুনাইতেছেন, আরও কত কি অনুভব করাইতেছেন। গোড়াকার হিসাবে আজকাল পূর্ব্ব শতাব্দীর ঈথার একরূপ বাদ পড়িতেছে, কিন্তু কার্য্যকরী শক্তিকণা ("Energy quanta"), "Point Event", Four-dimentional Continuum, Intrinsic Geometry of Space ইত্যাদি না মানিয়া উপায় দেখা যায় না। এই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, তাও আবার অণুবীক্ষণে সত্যিকার দেখা নয়; কল্পনার চক্ষে, আন্দাজের চক্ষে, গণা-গাথার চক্ষে দেখা। আমরা ঐ আদর্শ অণুবীক্ষণ হাতে করিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পনার সাথেই সায় দিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে ছাড়াইয়াও আগাইয়া যাইতেও নিতান্ত অভরসা করি নাই। চরমে উপস্থিত হইলাম গিয়া এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পূর্ণশক্তিমূর্ত্তিতে। এখানে সূক্ষ্মতারও পরাকাষ্ঠা, পূর্ণতারও পরাকাষ্ঠা। আমরা স্থানান্তরে যেটাকে চরম বা পরম চক্ষু বলিয়াছি, আজ রকমারি করিয়া তাকেই আদর্শ অণুবীক্ষণ বলিতেছি। তবে পরমচক্ষু—স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্টাদি, সকল রূপ দেখার নিরতিশয় সামর্থ্য; বাহিরের কোনও যন্ত্র নয়, এমন কি, যাকে "চোখ" বলি, সেটাও নয়। যে সামর্থ্য দ্বারা আমরা দেখি, তাহারই পূর্ণ বিকাশ এই পরম চক্ষু। বলা বাহুল্য এ চক্ষু স্বয়ং প্রজাপতির চক্ষু। এ চক্ষু "ভৌতিক চক্ষু" নয়; যেমন তেমন "দিব্যচক্ষু"ও নয়।

শক্তিকূট (Stress System) মূর্ত্তিকে "যন্ত্র" বলিব, এই প্রতিজ্ঞা যদি গোড়ায় করিয়া লই, তবে দেখিতেছি যে যন্ত্রেরও নানান্ থাক্, নানান্ পর্য্যায়।

পাতার যে স্থূলরূপ, সেটাও যে একভাবে শক্তিরূপ। পাতার স্থূল শিরা প্রশিরা-গুলির মধ্যে অবিরত রস সঞ্চার করিতেছে এই শক্তি; সেলগুলিকে তাপ ও আহার যোগাইতেছে এই শক্তি; উদ্ভিদ্ সেলের মাঝে প্রোটোপ্লাজম্‌কে পাক খাওয়াইতেছে এই শক্তি; এই শক্তিতে পাতাটি বাড়ে, কমে; সবুজ হয়, আবার হল্‌দে হইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। পাতার মধ্যে এই সব বন্দোবস্ত বহাল রাখার জন্য, পাতাটিকে একটা বটের পাতা বা আমের পাতা করিয়া রাখিবার জন্য, শক্তি-ব্যূহ (Constituent forces or Stress System) স্বীকার করিতেই হয়। এটাকে আমরা ঠিক চোখে দেখিনা, কাজ দেখিয়া অনুমান করি। পাতার ঐ মোটা রকমের জীবনযাত্রা চালাইবার জন্য শক্তির যে বন্দোবস্ত বা শক্তিকূট চাই, সেইটাকে আমরা পাতার "স্থূলযন্ত্র" বলিব। ইহা পাতাটির সঙ্গে আমাদের যেন "সদর মহলে" পরিচয়। এইটা হইল পাতাটির স্বাভাবিক রূপের First Sketch বা প্রাথমিক নক্সা। ম্যাগনেটের উদাহরণ লইয়া তাহার শক্তিকূট বা lines of forces এর নক্সা আঁকিয়া আমরা এই সদর মহলের পরিচয় পাই। বৈজ্ঞানিকও বলিবেন যে ম্যাগনেটের lines of force চরম তত্ত্ব, চরম কথা নহে। ম্যাগনেট স্বরূপতঃ কি, এবং তাহার 'পোল' দুইটা হইতে শক্তিরেখাগুলি কেন অমন ভঙ্গীতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার অবশ্যই কৈফিয়ৎ আছে; এবং সে কৈফিয়ৎ আমাদিগকে ম্যাগনেটের মলিকিউলগুলা, এবং তাদের "নাচের আসর" ঈথারে অথবা অপর কোন উপযুক্ত ফ্রেমে খুঁজিয়া পাইতে হইবে। ম্যাগনেটের "lines of force" যে শক্তিকূট বা যন্ত্র আমাদিগকে দেখাইতেছে, সে শক্তিকূট বা যন্ত্র একটা সূক্ষ্মতর ও মৌলিকতর শক্তিকূট (subtler and more fundamental Stresses) এর কার্য্য বা অভিব্যক্তি। তার মানে, উপযুক্ত ডাইনামিক ফ্রেমে ও মলিকিউলগুলার মধ্যে যে শক্তিপিণ্ড (Stresses) রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাগনেটকে দুই-পোল-বিশিষ্ট ও lines of force বিশিষ্ট একটা যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। সেই Stress গুলি না থাকিলে ম্যাগনেট হইতনা, হয়তো একটা পাথরের কুচি হইত। আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত lines of force লইয়া ম্যাগনেটের যে স্থূল যন্ত্রমূর্ত্তি, তাহাই ম্যাগনেটের অভিব্যক্ত ধর্ম্ম বা গুণগুলির মূলে। ঐরূপ lines of force না ছড়াইয়া থাকিলে, ম্যাগনেট অমন ভাবে লোহার গুঁড়া টানিয়া লইত না;

অপর একটা ম্যাগনেটের সমীপে অমনধারা ব্যবহার করিত না; ইত্যাদি।

যে দরকারী কথাটায় আপনাদের মনোযোগে ভিক্ষা করিতেছি সেটা এই :— **স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্র স্থূল রূপ ধর্ম্মাদির আশ্রয় বা কারণ; সূক্ষ্ম শক্তিকূট (যথা মলিকিউলদের) স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম যন্ত্র তাহারও অধিষ্ঠান; এইরূপে কার্য্য-কারণের শিকল ধরিয়া আমরা শেষকালে চরম বা পরম সূক্ষ্ম কারণ বা অধিষ্ঠানে গিয়া উপনীত হই। সেই চরম অধিষ্ঠান বা যন্ত্র হইতেছে প্রকৃতি বা প্রধান,** যাকে শাস্ত্র বলিয়াছেন "অমূলং মূলম্"। কথাটা বিজ্ঞানের তরফ হইতে আপনারা বুঝিয়া দেখিলেন তো? ম্যাগনেটের মলিকিউলদের যে ঘরোয়া শক্তির বিন্যাস, তার ফলে ম্যাগনেটের 'পোল', lines of force; এবং তাদের সেভাবে থাকার জন্যই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটত্ব। এই গেল একধাপ। তারপর একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, মলিকিউলগুলা চরম অবিভাজ্য, নির্ব্বিকার পদার্থ নয়; তারা সূক্ষ্মতর মশলার অপূর্ব্ব পাকপ্রণালী ক্রমে প্রস্তুত (এবং সে পাকপ্রণালী পশ্চিমের রসায়ন বিদ্যা খুব ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন); সেই সূক্ষ্মতর মশলাগুলির নাম এটম। এই এটমেরা নিজেদের শক্তি সাজাইয়া, সংহত করিয়া যেমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে, মলিকিউল তেমনটাই হইয়াছে। শক্তির কারবারে মলিকিউল তাই মূলধনী (capitalist) নহে; সে স্বয়ং কোম্পানী কি খুব জোর কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট। যে সকল অংশী মিলিয়া যৌথ কারবার ফাঁদিয়াছে তারা হইল এটম। অতএব দেখিতেছি যে, কি গাছের পাতায়, কি ম্যাগনেটে এটমদের শক্তিকূট বা যন্ত্র, মলিকিউলদের যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। এটমদের রাজ্যে বা এলাকায় যে ব্যাপার হয়, প্রধানতঃ তারই ফলে মলিকিউলদের এলাকায় ব্যাপারগুলি হইয়া থাকে। আমরা আদর্শ অণুবীক্ষণ হাতে করিয়াছি কাজেই আমরা এটমে গিয়াও থামিতে পারি নাই। আমাদের দেখিতে হইয়াছে যে এক একটা এটম এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ :—তাদের ভিতরে সূক্ষ্ম তৈজস রেণুগুলি বিপুল শক্তি লইয়া খেলিতেছে, কখনও বা এটমের এলাকা ছাড়াইয়া বাহিরে ছটকাইয়াও আসিতেছে। কাজেই এটমের শক্তিকূট বা যন্ত্রের মধ্যে পাইতেছি আরও সূক্ষ্ম, আরও মৌলিক যন্ত্র। এ যন্ত্র

এটমিক যন্ত্রের কারণ, অধিষ্ঠান। বর্ত্তমানে এটমের "কেন্দ্রীণ" (Nuclear) শক্তিব্যূহ বা যন্ত্র কেবল যে পরিকল্পিত হইয়াছে এমন নয়, ব্যবহৃতও হইয়াছে। বায়োলজি বা জৈববিদ্যাও পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মূলে শক্তির রূপটাই বা কি, আর তার "লেখ" টাই কীদৃশ? পূর্ণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ছাড়া কে এর উত্তর দিবে?

এ-ভাবে এগিয়ে চলার যে অন্ত নাই! যন্ত্রের ভিতর যন্ত্র, তার ভিতরে যন্ত্র, তার ভিতরে আবার যন্ত্র—এইভাবে চলিয়াছে। তন্ত্রের যে কোনও যন্ত্র, যথা শ্রীযন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করুন; এই সার্ব্বভৌম বিশ্বজনীন সত্যের চেহারা সেখানে দেখিতে পাইবেন। বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত, তার মধ্যে আবার বৃত্ত, তার মধ্যে ত্রিভুজ, তার মধ্যে আবার ত্রিভুজ এইভাবে চলিয়াছে। এ-কথাটার বিস্তার এখানে করিব না। মূলগ্রন্থে কিছু আভাস মিলিবে। আজ মূল সূত্রগুলিই হাতের মুঠাতে ধরিয়া লউন। আমরা বিশ্বের যে কোনও পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যে, তাহার মধ্যে যন্ত্র, তার মধ্যে সূক্ষ্মতর যন্ত্র, এইভাবে পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবে, অধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠান ভাবে নিহিত রহিয়াছে। যন্ত্র মানে বিন্যস্ত Stresses বা শক্তিকূট, এটা যেন আমরা না ভুলি। সূক্ষ্মতর যন্ত্রটি স্থূলতর যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। কারণ ও অধিষ্ঠান যে কি অর্থে, তাও বলিয়াছি। ভিতরকার যন্ত্রটি না থাকিলে বাহিরের যন্ত্র থাকেনা বা থাকিলেও না থাকার মত হয়। ভিতর বাড়ীতে যাঁরা ভাঁড়ার ও রান্না-বান্না লইয়া আছেন তাঁরা জবাব দিলে বাহির বাড়ীতে ভোজে যে কাহারই পাতা পড়ে না। স্থূল চাইতে সূক্ষ্মের, ব্যক্ত বা "দেখা"র চাইতে অব্যক্ত বা "অদেখার" মাহাত্ম্য শুনিয়া আপনারা চমৎকৃত হইতে হয় হউন কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। পশ্চিমের বিজ্ঞান সম্প্রতি সূক্ষ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সবার চেয়ে বড় গলা জাহির করিয়াছে। পশ্চিমের "কাজে লাগানো বিদ্যা" বা Applied Science যে এখনও বাহিরের বড় বড় কল কারখানায় বেশী মমতা বিলাইয়া রাখিয়াছে, "অন্দরের" খপর রাখিয়াও রাখিতেছে না, এটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য, পশ্চিমেরও দুর্ভাগ্য, এবং এ সিদ্ধি নিশ্চয়ই খাঁটি বিজ্ঞানের দেওয়া মন্ত্রের বৈধ পুরশ্চরণের ফলে হয় নাই। বিজ্ঞান এখন অণুর অন্দর মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের দিকেই আঙ্গুল দেখাইতেছে; পশ্চিম কিন্তু সে সঙ্কেত না বুঝিয়া ক্রমাগত কয়লা পোড়াইয়া, পেট্রল পোড়াইয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নানান রকমের উৎকট মেশিন

চালাইতেছে; চালাইয়া এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে নোংরা করিয়া ফেলিতেছে; মানুষের এমন সোনার সংসারটাকে শয়তানের মুলুক করিয়া ফেলিতেছে! সূক্ষ্মের ব্যবহারেও স্থূলের দানবটার দাপটাই বাড়িতেছে। চিকিৎসা বিদ্যায় হোমিওপ্যাথি রোগের নিদানে ও ভেষজের নিরূপণে স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মে পক্ষপাত করিয়া খাঁটি পথই ধরিয়াছেন; হিপ্‌নটিজম্‌, মিস্‌মেরিজম্‌ প্রভৃতি ওদেশেও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম-শক্তি-কূট বা যন্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে লোককে শিখাইতেছে। কিন্তু মোটামোটা ভূত গুলো একবার কাঁধে চাপিয়া বসিলে, সেই আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ বণিকের গল্পে বিজনদ্বীপবাসী বুড়া শয়তানটার মত, তাকে কাঁধ হইতে নামান দায়! আর যে "সরিষায়" ভূত ছাড়াইবে, সেই মন-সরিষাই যে ভূতগ্রস্ত!

সে যাই হোক, সূক্ষ্ম শক্তিকূট বা যন্ত্র স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্রের কারণ বা অধিষ্ঠান বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে এই নিয়মে "তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ", সূক্ষ্ম যন্ত্র না থাকিলে স্থূল থাকেনা; সূক্ষ্ম থাকিলে স্থূল থাকিতে পারে। ইহা হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমরা এই কাজের কথাটাও পাই: যদি কোনও পদার্থকে আমরা স্থূলভাবে দেখিতে চাই, তবে তার সূক্ষ্ম-শক্তিকূট বা যন্ত্র আমাদিগকে সংগ্রহ বা উপস্থিত করিতে হইবেই। অন্য উপায় নাই। ধরুন একটা ইস্পাতকে আমি ম্যাগনেট করিতে চাই। আমায় কি করিতে হইবে? বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পাতেই হউক, অথবা অন্য ম্যাগনেটের সংস্পর্শ দ্বারাই হউক, আমাকে ইস্পাতটুকুর মলিকিউলগুলা এমন একটা শক্তিকূটে সাজাইতে হইবে, যার ফলে ইস্পাতটিতেও lines of force গুলি ম্যাগনেটের রীতিক্রমে দুইটি 'পোল' হইতে ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়। এ-করা ছাড়া অন্য উপায় আছে কি? আমি যে Electric Current বা অন্য উপায়ে ইস্পাতটিকে চুম্বকত্বাপন্ন করিতে পারিয়াছি, তার প্রমাণ আপনারা পাইবেন কিসে? লোহার গুঁড়া টানিতেছে কিনা, অন্য চুম্বককে সদৃশ 'পোলে' বর্জ্জন ও বিসদৃশ 'পোলে' আকর্ষণ করিতেছে কি না, ইত্যাদি দেখিয়া। মোট কথা, স্থূল যন্ত্র আমায় পাইতে হইলে সূক্ষ্ম যন্ত্রটি আমার আদৌ পাইতে হয়। তন্ত্রের দৃষ্টান্ত লউন। ত্রিপুরসুন্দরী শক্তির এক বিশেষ মূর্ত্তি। তন্ত্রে তাঁর ধ্যান আছে; বীজমন্ত্র আছে। ধরুন তাঁর ধ্যান যেরূপ আছে, সেই ভাবে তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করিতে চাই। তাঁর মূর্ত্ত ব্যক্ত রূপটি আমি দেখিব। কি করিতে হইবে?

পূর্ব্বে যে মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদনুসারে আমাকে তাঁর সূক্ষ্ম শক্তিকূট বা যন্ত্র উপস্থিত করিতে হইবে। সূক্ষ্ম যন্ত্র তদপেক্ষা স্থূল যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান—এই নিয়মে। সেই সূক্ষ্ম যন্ত্র ধরা যাক্ শ্রী-যন্ত্র। রূপের দিক হইতে যন্ত্র যা করে, শব্দের দিক হইতে মন্ত্রও তাই করে; যার যন্ত্র বা যার মন্ত্র, তাকে আমার কাছে "ধরিয়া" আনিয়া দেয়। কেন হাজির করিবে, তার হেতু দিয়াছি। মন্ত্র ও যন্ত্রের সংযোগ তো মণিকাঞ্চন সংযোগ—সিদ্ধিকে আরও সুকর করিয়া দেয়। আর স্বাভাবিক ক্রিয়া বা তন্ত্রের সহায়তা পাইলে তো কথাই নাই। আপাততঃ সে কথা যাক্

সূক্ষ্ম যন্ত্রের নানান থাক্ বা স্তর আমরা গাছের পাতা বা চুম্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; তাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাও আমরা দেখিলাম। এই সাতমহল পুরীর একেবারে বাহিরে যে শক্তিপিণ্ড রহিয়াছে, তাকেও আমরা যন্ত্র বলিয়াছি। আবার একেবারে কেন্দ্রস্থানে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে, তাহাকেও আমরা যন্ত্র বলিয়াছি। বটগাছের পাতাটার একেবারে বাহিরে যে যন্ত্রটা রহিয়াছে, সেটা সেই পাতাটার কোষাণু, শিরা, উপশিরা ঘটিত জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কলটা, যার খানিকটা আমরা চোখেই দেখি, আর বাকিটা ক্রমশঃ অণুবীক্ষণে বা অন্য উপায়ে আমাদের দেখিতে হয়। ইহাই হইল পাতাটার শক্তিকূটের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান চালানোর কাঠামোখানা। ইহার কথা আবার পরে বলিতেছি। সাতমহলের একেবারে মাঝখানে কেন্দ্রস্থলে কোন্ যন্ত্র? মলিকিউল সম্বন্ধী যন্ত্র? না। এটম সম্বন্ধী—না, তাও না। কর-পাস্‌ল্ বা ইলেকট্রন সম্বন্ধী—না, তাও বুঝি নয়। কারুর সম্বন্ধী নন—তবে তিনি কে? তিনি হইতেছেন শক্তির চরম সূক্ষ্মাবস্থা, যার চাইতে আর সূক্ষ্ম নাই, অথচ তিনি শক্তির পূর্ণ সমর্থাবস্থা—কারণ, সেই অবস্থা যে অন্য সব অবস্থার কারণ বা অধিষ্ঠান। ঐ কেন্দ্রে যেটি রহিয়াছে, তার জন্যই এবং তাকে আশ্রয় করিয়াই ত' আর সব রহিয়াছে। সেটিকে আর ভাগ করা চলে না; কারণ ভাগ করা চলিলেই তার ভিতরে আবার যন্ত্র বাহির হইবে। শক্তির এই কেন্দ্রীভূত, চরম সূক্ষ্ম, পরম কারণ ও পরম অধিষ্ঠানরূপ অবস্থা, তারই নাম বিন্দু। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই সকল শক্তি রহিয়াছে ও খেলিতেছে: সকল যন্ত্রই এই বিন্দুরই অভিব্যক্ত বা উচ্ছূনাবস্থা। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা তন্ত্রশাস্ত্রের "কামকলাবিলাস" প্রভৃতি দেখিবেন। এই বিন্দু

তত্ত্বই যন্ত্রের গোড়ার তত্ত্ব—শুধু তান্ত্রিক শ্রীযন্ত্র প্রভৃতির নয়; বিশ্বের চেতন অচেতন, সজীব নির্জীব, স্থূল, সূক্ষ্ম সকল যন্ত্রেরই। আজ এই পর্য্যন্ত খেয়াল করিয়া যান যে, বিন্দুই শক্তিকূটের বা যন্ত্রের মূল প্রকৃতি বা কারণ।

"যন্ত্রম্" এই-কথাটার "যম্" এই অংশটাকে বায়ুবীজ মনে কর। বায়ু মানে শুধু বাতাস নয়। শ্রুতি বায়ুকে ব্রহ্মেরই এক রূপ বলিয়াছেন—"বায়ুর্যথৈকঃ" ইত্যাদি নানা মন্ত্রে নানা ভাবে। সর্ব্বব্যাপী যে সত্তাশক্তি তার যে "সচল" ভাব তাকে বায়ু বলা যায়। এ সচলতা শুধু যে দেশে-কালে (Space-Time Continuumএ) এমন নয়। বিরাট্ মনে কাম-সঙ্কল্পাদিও এই বায়ুর সংজ্ঞার ভিতর আসিয়া পড়ে! শক্তিতন্ত্রের ভাষায় স্পন্দ। জড়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে—এই বায়ুর অধিকারে। বায়ু মূলবস্তুরই গতিরূপ (স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ)। তার পর, "যন্ত্রম্" এই কথাটার অন্তে আছে "রম্"—অগ্নিবীজ। অগ্নিও ব্রহ্মের এক রূপ। সংক্ষেপে, যদ্দ্বারা রূপ বা আকৃতি আসিয়া থাকে, অথবা রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা অগ্নি (Informing, Conforming, Transforming Cosmic Factor)। বলা বাহুল্য, রূপ এখানে কেবল বাহিরের রূপ নয়—জড়, প্রাণ, মন এ সবের সকল "গ্রামেই" অগ্নিকে চিনিতে হইবে।

তাহা হইলে, দুইটা তত্ত্ব আমাদের মিলিল। বায়ু বা বিশ্বস্পন্দ (Cosmic Stress)। সর্ব্ববিধ গতি ও গতির সম্ভাবনারূপ এইটি। এটিকে আধার করিয়াই অগ্নির "রূপায়ণ" কর্ম্মটি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, স্পন্দরূপে বায়ু দিলেন উপাদান বা material; আর, অগ্নি হইলেন নিমিত্ত (Informing Principle)। বিশ্বে সকল সৃষ্টি "অগ্নিসখ" (বায়ু) এবং অগ্নি—এ দুটিকে লইয়াই হইতেছে। মানসসৃষ্টি বা সঙ্কল্পসৃষ্টিও বাদ পড়ে না। "তপসোঽধ্যজায়ত," বা "জ্ঞানময়ং তপঃ" স্থলেও তপঃ = আদি অগ্নি।

কিন্তু প্রশ্ন—বিশ্বের প্রাণ শৃঙ্খলা বা ছন্দঃ। কাজেই, কেবল একটা উপাদান আর এক নিমিত্ত থাকিলেই চলে কি? Form বা রূপ যেটি হইবে, সেটি বিষম, যেমন-তেমন, হইলে তো চলিবে না। সেটি লক্ষ্যের সঙ্গে এবং সমগ্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস হওয়া চাই। সুসঙ্গতি বা Harmony চাই। "যন্ত্রম্" এর মাঝে "ত্" (= অমৃত = ইষ্ট = শ্রেয়ঃ + প্রেয়ঃ) ঐ সন্ধিটি ঘটাইতেছে। "যন্ত্রম্" এই কথাটার বর্ণবিশ্লেষণ করিয়াই আমরা যন্ত্রের আসল কথাটা পাইলাম। সে আসল কথার তিনভাগেই দৃষ্টি রাখিবেন—উপাদান, আকৃতি ও ছন্দঃ। তাহা

হইলে, যেখানে একটা সত্তাশক্তি (জড়, প্রাণ বা মনরূপে অভিব্যক্ত) সম্পন্দ (ক্রিয়মাণ) অবস্থায় বিদ্যমান, সেখানে কোনও শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-সিদ্ধির নিমিত্ত তদুপযোগী ছন্দঃ আশ্রয়ে এক নির্দ্দিষ্ট রূপায়ণ (shaping and adjusting of the "material" or energy) হইল যন্ত্র। বেদ বার বার ছন্দঃ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের কথাও শুনাইয়াছেন। শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ আপেক্ষিক সামগ্রী। পরাকাষ্ঠায় সেটি অমৃত। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ এই অমৃত দেবতাদের জন্য দোহন করিয়াছিলেন—ঐতরেয়ে উপাখ্যান আছে। মন্ত্রের বেলা যেমন, যন্ত্রের বেলাতেও তেমনি ছন্দঃ চাই। ছন্দঃটি সমর্থ হইলে যন্ত্র সমর্থ হইবে। Radio-isotopes গুলিতে কেন্দ্রীয় শক্তি তো "উন্মুখ" (prone) ভাবেই বিপুল; ধ্বংসের ব্যাপারে সমর্থ ছন্দঃটি পাইয়া আণবিকবোমা বানাইয়াছি। কিন্তু সেতো মহামারী ছন্দঃ! অমৃত ছন্দঃটি কবে আবিষ্কৃত হইবে? তার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররকমের যন্ত্র আবশ্যক, এবং সে যন্ত্র মুখ্যতঃ "জড়যন্ত্র" (mechanical contrivance) হইবে না। জড়ের অণুতে অগ্নিকে কালাগ্নিরুদ্রমূর্ত্তিতে আবিষ্কৃত করিয়াছে আমাদের বিষচ্ছন্দা বুদ্ধিপ্রসূত জড়যন্ত্র। শক্তিসাগর মন্থনে হলাহল উঠিয়াছে। কিন্তু অগ্নিকে নিখিল দৈবীসম্পদের "পুরোহিত" "রত্নধাতম" (Supreme Giver of all Value) রূপে পাইতে হইবে যে! জড়াণু, জীবকোষ আর কারবারী চেতনার মূলে যে মহান্ শক্তি-ভাণ্ডার, শুধু তার "বহিঃপ্রকোষ্ঠ"টাতেই অভিজ্ঞ প্রয়োগকুশলী হইলেই তো চলিবে না, অগ্নি হইবেন "জাতবেদাঃ" এবং মধুচ্ছন্দাঃ (Knower of all that exists and functions, সুতরাং Perfect Wisdom)।

আবার, "যন্ত্রম্" শব্দের "যম্"টাকে "যমন" বা control অর্থেও নেওয়া যায়। কোনও প্রস্তাবিত শক্তিক্ষেত্র (given power feild) যদ্দ্বারা "trained, controlled" হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট আকৃতি (pattern) রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই যন্ত্র। এই "যমন" (control) কর্ম্মটি নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে হইতে পারে (canalizing, redirecting, focussing ইত্যাদি), সুতরাং যন্ত্র নানাবিধ। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ মনু, চতুর্দ্দশ যম এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা আছে। ৭ × ২ = ১৪, এই চতুর্দ্দশ এক "রহস্য" সংখ্যা, আমরা পরে দেখিতে পাইব। মনু থেকে মন্ত্র, যম থেকে যন্ত্র—ইহাও দেখিব। ভুবন ও তন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত। সর্ব্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।

শক্তিভাণ্ডারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ থেকে ক্রমশঃ অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইবে! বহিঃপ্রকোষ্ঠে শক্তিবিন্যাসের যে আকৃতি (Pattern), অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সেটি নাকচ হয় না, সামর্থ্যে, প্রয়োগে, সম্ভাবনায় এবং ব্যঞ্জনায় সেটি আরও সমৃদ্ধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান (জড়, প্রাণ, মন—সমষ্টি ও ব্যষ্টি সব দিকেই) তুলনা করিলে এটি বুঝা যাইবে। অণু, জীবকোষ, কারবারী মন—এ সবের ভিতরের নক্সা (Pattern) আমরা পাইতেছি। আরও ভিতরের সন্ধানও মিলিবে। সমষ্টিগত দৃষ্টিটাও (macrocosmic appreciation) ক্রমে গভীর ও ব্যাপক হইতেছে সন্দেহ নাই। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর—এভাবে খোঁজার কি কোন অবধি আছে? যদি মনে করা যায় আছে, তবে 'ক' নামক বস্তুটার নিরূপক শক্তিকূটের (determining stress system) যেটি সব চাইতে মূলীভূত (basic) অবস্থা বা সংস্থা, সেটি হল 'ক' সম্বন্ধে তার "হৃৎ" (core) বা নাভি। এবং সেই হৃৎকে আশ্রয় করিয়া 'ক'এর সত্তাশক্তির যে আকৃতি, সেটি হইল তার "হৃল্লেখা" (Basic causal pattern)। এইটি 'ক'এর মৌলিক যন্ত্ররূপ। এটি রহিলে 'ক' অন্ততঃ বীজ বা সম্ভাবনা রূপে রহিবেই। এটি না থাকিলে 'ক' নাই। এর তুলনায় 'ক'এর আর সব Pattern "বাহ্য"। মূল প্যাটার্ণ বা হৃল্লেখাই হইল তার স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র। মন্ত্রের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি মূল প্যাটার্ণটি ক্রিয়াভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে আসিয়া বহুধা আবৃত ও সংকীর্ণ (veiled and confused) হইয়াছে। অনেক আবরক ও বিক্ষেপক সরাইয়া তবে শুদ্ধ সম্পূর্ণ "রূপতন্মাত্র"টি পাইতে হইবে। শব্দতন্মাত্রের বা মন্ত্রের মত রূপতন্মাত্র বা যন্ত্রেরও তার বস্তুটির সঙ্গে 'তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ তদভাবে তদভাবঃ' সম্বন্ধ।

শক্তির বা সামর্থ্যের যেটি নিরতিশয় "কেন্দ্রীণ" ঘনীভাব তাকে "বিন্দু" আখ্যা দিলে, হৃল্লেখা হইল বিন্দুরই কোনও বিশেষ সৃষ্ট্যুন্মুখ কারণযন্ত্র (causal pattern) রূপ প্রাথমিক অভিব্যক্ত অবস্থা। বিন্দু নিখিল সৃষ্টির বীজ (Cosmic Causal Potency), কিন্তু ক, খ বা গ সৃষ্ট হইতে গেলে গোড়াতেই এক একটা বিশেষ আকৃতি (Pattern) তাতে মেলা আবশ্যক। এই "বিশেষ" গুলি গোড়াতে "বর্ণ" (element) এবং "কলা" (Partial or aspect) আকারে অভিব্যক্ত। পরে, সংখ্যা ও পরিমাণ, এবং সেটি

আবার কাল ও দেশের বিশেষ 'সংস্থা' রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ সবের আলোচনা জপসূত্রে মিলিবে। হৃল্লেখা স্বয়ং সংখ্যা-পরিমাণাদি সম্ভাবনামাত্র; তাতে সে সব এখনও 'ব্যাকৃত' (evolved) হয় নাই। সুতরাং যেটিকে বর্ত্তমান বিজ্ঞান "এটমিক্ নাম্বার", "ক্রমোসোম নাম্বার" ইত্যাদি বলিতেছে, সেটি সূক্ষ্মের পর্য্যায়ে পড়িলেও জড়ের বা জীবকোষের হৃল্লেখা নয়। অবচেতন মনের যে চিত্রখানা পাইতেছি সেটি সম্বন্ধেও এই কথা। হৃল্লেখা স্বয়ং দেশ-কালাবচ্ছিন্ন নয়; কারণতা বা সম্ভাব্যতা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন মাত্র। দেশে (Extension, মাত্র Physical space নয়) ও কালে "অবতরণ" করিয়া হৃং হয় হৃদ্দেশ এবং হৃদয়। এ আলোচনাও পরে মিলিবে। এ প্রসঙ্গে Plato আর Whitehead-এর "চিন্তা" তুলনাযোগ্য।

সূক্ষ্মে ও স্থূলে অবতরণে ক ব খ এর যেটি হৃল্লেখা সেটি বিচিত্র আকার-পরম্পরা পরিগ্রহ করিয়াছে। এগুলি শুদ্ধ, সম্পূর্ণ রূপ বা যন্ত্র নয়। পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ (interference), অভিভব (encroachment) ইত্যাদি ঘটিয়া স্বাভাবিকরূপের ব্যত্যয় এবং স্বাভাবিক সামর্থ্যের সংকোচ ঘটিয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি "লোক" বা plane জপসূত্রে বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এগুলি মুখ্যতঃ seven planes and orders of experience। জপসূত্রে "সপ্তখ্যাতি"। প্রত্যেকটি আবার "পরাক্" (negative) এবং "প্রত্যক্" (positive) দুইভাবে লইলে পাই চৌদ্দ সংখ্যা। "এই" বলিয়া গোচর হইতেছে যে সব রূপ, আকৃতি ও যন্ত্র, সেগুলিকে শোধন ও সম্পূরণ করিতে করিতে "সত্য" পর্য্যন্ত পৌছিতে হইবে। সেখানে তত্ত্বরূপে (as it in itself) ও ধারারূপে (as a process)—দুইরূপেই সেটিকে দেখিতে হইবে। সেভাবে দেখিলে—"সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ", যাহা হইতে সৃষ্টির সূচনা। বিশ্বের বিচিত্র apparatus তো মিলিতেছে। কিন্তু গোড়াকারটা?

শব্দের দিক্ থেকে হৃল্লেখার অনুকৃতি (equivalent) হইল মায়াবীজ হ্রীঁ। 'হ্' কার—শক্তির ব্যোমবৎ বিপুল নাদাবস্থা; 'র্' কার—যে শক্তিদ্বারা ঐ শক্তিব্যোম (Power Continuum) মথিত ও রূপিত হইতেছে (অগ্নি); 'ঈ' কার—মন্থনদণ্ড—যে Axis বা সূত্র আশ্রয় করিয়া মন্থন ও রূপায়ণ ক্রিয়াটি চলিতেছে; ঁ—নাদ ও বিন্দু এই দুই-এর অধ্যক্ষতায় এবং এই দুয়ের "কাষ্ঠা" (limit) অভিমুখেই ক্রিয়াটি চলিতেছে। অর্থাৎ, একদিকে Continuum

অন্যদিকে Point (dynamic)—এই দুই প্যাটার্ন রক্ষা করিয়াই নিখিল ব্যাপার চলিতেছে। যেমন, আলোকের বেলা, ইলেকট্রণের বেলা উর্ম্মিরূপ এবং রেণুরূপ ; প্রাণ ও মনের ব্যাপারেও তদ্রূপ। তবেই, হ্রীঁ প্রভৃতি বীজ শক্তিক্ষেত্রে এক একটি ফর্‌মুলা—পদার্থবিজ্ঞানে যেমন পাই। এঁফটা ফর্‌মুলার ভিতরেই "যন্ত্র"টারও নিরূপণ রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণটি প্রাণপ্রযত্নের মৌলিক রূপ-বিশেষ হিসাবেও দেখান যাইবে। মূলগ্রন্থে তত্ত্ব (Principles) আলোচিত হইয়াছে।

শেষকালে, আমাদের শরীরযন্ত্রটা পরীক্ষা কর। শারীরবিজ্ঞান (Anatomy ও Physiology) অণুবীক্ষণাদি apparatus সাহায্যে যতদূর দেখাইতেছে, সেইখানে শেষ করিলে কি চলিবে? প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, এই স্থূল যন্ত্রটারই পূরা ব্যাখ্যা তাতে মিলে না। সুতরাং, আরও সূক্ষ্মস্তরের যন্ত্র নিশ্চয়ই আছে। প্রশ্ন উঠিবে—কিরূপ উপাদানে সে যন্ত্র নির্ম্মিত এবং তার রূপের এবং ক্রিয়ার প্যাটার্ণটাই বা কি? তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যাকে সুষুম্না, ষট্‌চক্রাদি বলিয়াছেন, সেগুলির স্থান কোথায়? যোগীরা যাকে সূক্ষ্মদেহ, নির্ম্মাণকায়, দিব্যদেহ ইত্যাদি বলেন, সেগুলো কি? উৎক্রান্তির পর যে আতিবাহিকাদি দেহ,সেগুলো? নিত্যমুক্ত (যথা সনৎকুমার) ও সিদ্ধদের দেহ? জরামৃত্যু প্রভৃতির এলেকা কতদূর পর্য্যন্ত? সব কিছুর মূলে স্পন্দ তো বটেই। কিন্তু স্পন্দের "ঋতম্" (Rhythm, ছন্দঃ) কোন্ "গ্রামে" উপনীত হইলে সে ছন্দঃ Entropy বা "Cosmic running down"এর ঊর্দ্ধে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, কাজেই অজর অমর করিয়া দেয়? পরাকাষ্ঠায় হইল—"সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ"। যন্ত্র এবং তার ছন্দঃ কত পাদে ও মাত্রায় সে পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইবে? এটা জরুরি প্রশ্ন। তাপর, অন্নময়াদি "কোষ" হিসাবে যে যন্ত্রবিভাগ, তার মূলেই বা কি? জপাদি সাধনের সঙ্গে এ সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জপ

জপ সম্বন্ধে কিছুদিন আগেকার এই (প্রকাশিত) লেখাটাও ভূমিকায় সন্নিবেশিত হইতেছে। শাস্ত্র "জপাৎ সিদ্ধিঃ" ইহার তিন সত্য দিয়া জপ কার্য্যে সংশয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সন্ত মহাজনদেরও ঐ এক কথা—"নাম লও, নামেই সব হইবে। নামই পরম সম্বল, নাম বই আর গতি নাই।" নাম লওয়াই ভজন; আর, ভজন বিধিপূর্ব্বক হইলে তাহাই সাধন। নাম বলিতে কার নাম, কোন নাম এ প্রশ্ন যেমন আসে, নাম কোথা হইতে, কিভাবে লইতে হইবে এ প্রশ্নও তেমনি আসিয়া থাকে। আগের প্রশ্নটার উত্তর মিলে যখন "ইষ্টনাম" বা—"মন্ত্র" পাই। পরেরটার উত্তরের জন্য কোন "নামদাতা" এবং নাম দেওয়ার একটা "প্রণালী" বা পদ্ধতি ঠিক হওয়া চাই। সচরাচর নাম-দাতাকে "আচার্য্য", "গুরু", "ইষ্টদেব", আর নামদানের প্রণালীকে "দীক্ষা" বলা হয়। দীক্ষার সঙ্গে অথবা পরে আবশ্যক ভজনবিধির উপদেশকে "শিক্ষা" বলা হয়। দীক্ষায় একনিষ্ঠ হওয়া চাই; উপদেশের বেলা তাদৃশ বাঁধাবাঁধি নাই। তবে সেক্ষেত্রেও অরিচ্ছন্দ-মিত্রচ্ছন্দের বিচার করিতে হয়। এক কথায় উপদেশের উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে।

এ সব কথা প্রায় সকলের শোনা আছে। যাঁদের মূলে সংশয় তাঁহাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া সহজ নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, সে বোঝা-পড়া শেষ করিতে হইলে পরীক্ষা, তত্ত্ব এবং তথ্য দুই ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাপূর্ব্বক চালাইতে হইবে, যেরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় করিতে হয়। থিওরি এবং এক্সপেরিমেণ্ট—দুয়েরি প্রয়োজন আছে। তত্ত্ব এবং তথ্যের মধ্যে সন্ধি আবশ্যক। বিচ্ছেদ বিগ্রহ হইলে বুঝিতে হইবে যে সত্য সন্ধানটি এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তত্ত্ব এবং তথ্য পরস্পরের সম্বাদী হইবে, বিসম্বাদী নয়। সত্য বা যথার্থের জ্ঞানকে যদি বলি "প্রমা", তবে এই সত্য সন্ধানকে বলিব প্রমাণ।

জপ একরূপ ক্রিয়া—কায়িক (অজপা), বাচিক, মানস, বিমিশ্র যে ভাবেই হৈনা কেন। এই ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। বিশ্বাস করিব, কি করিবনা—এটি নির্ভর করে সত্যসন্ধান বা প্রমাণের উপর। প্রমাণের ব্যাপ্তি তত্ত্ব এবং তথ্য—principle and fact উভয়তঃ। শোনা যায় অঙ্গারও নাকি

কর্মযোগে হীরক হয়। শুনিয়াই বিশ্বাস হয় কি? প্রমাণ চাই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে জানিলাম (১) দুয়েরই মূল বস্তু বা উপাদান একই; আর (২) সেই মূল বস্তুর দানাগুলি অঙ্গারে যে রীতিতে সাজানো, হীরাতে সে ভাবে নয়, অন্যভাবে; সুতরাং (৩) সাজানোর রীতিটি অঙ্গারানুরূপ না হইয়া হীরকানুরূপ হইলেই অঙ্গারের হীরকত্ব প্রাপ্তি। পদার্থবিজ্ঞান অধুনা আরও অগ্রসর হইয়াছে দেখিতেছি। সব কিছু পদার্থের মূল বস্তু Energy বা শক্তি (নাদ বা Continuum, বিন্দু বা Quantum) এবং শক্তির বিভিন্ন অবস্থিতি-পরিস্থিতি (সংস্থা বা ব্যূহ) হইতেই বিভিন্ন পদার্থ। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাহা জানিলাম, তথ্যের ক্ষেত্রে সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা সেটি যাচাই না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সংস্থাপক (conclusive) প্রমাণ মিলিল না, এবং বিশ্বাসও সুস্থির হইল না; স্থিরমতি স্থিতধীও হওয়া গেল না।

জপের মূলে যে principle বা তত্ত্ব আছে, তাহাকে বলা যাক্—রহস্য। "উপনিষদ্" কথাটার একটা মানেও তাই। তত্ত্ব সর্ব্বক্ষেত্রেই "গুহানিহিত" বা নিগূঢ়। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বটে। তবে সে গুহা ভেদের কৌশল (বিদ্যা) বা technique অধুনা আমরা বেশ দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিতেছি। জপের যেটা রহস্য (সত্যস্য মুখং) সেটি পিহিত হইয়াই আছে "হিরন্ময় পাত্রেণ" কি "প্রস্তরস্তূপেন" তা বুঝিতেছিনা। সেটিকে "গুহ্য", "গুহ্যাদপি গুহ্য, "রাজগুহ্য"-ইত্যাদিরূপে রহস্য করিয়াই রাখা হইয়াছে বরাবর। তার হেতু তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে তখন হিরন্ময় পাত্র জুটিত ব্রহ্মবর্চ্চের অধিকারী হিরণ্য-রেতাদের যুগে। কিন্তু রহস্য হইলেও সেটি অত্যাধুনিক "বৈজ্ঞানিক বুর্ব্বরতা" যুগে অজ্ঞাতব্য, অনধিগম্য তো নয়। বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকার, প্রয়োজন—এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলা হয়। অনুবন্ধ বিচার করিয়া সব কিছুর সুতরাং জপের অথবা অন্য যে কোনও রহস্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। নচেৎ শ্রেয়ঃ নাই, চরিতার্থতা নাই। যেমন, বর্ত্তমান যুগে আণবিক-শক্তি-ভাণ্ডারের চাবিকাটি হাতে পাইয়া আমাদের সম্প্রতি শ্রেয়োলাভ ঘটে নাই,. ঘটিয়াছে সম্ভাবিত মহতী বিনষ্টি। জপ যে শক্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান দেয়, সে শক্তি আরও "মৌলিক", আরও বিপুল, ব্যাপক শক্তি। সে শক্তিসাধনায় সংযত সাবধানতা এবং স্বচ্ছ গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আরও বেশী। এই জন্য সিদ্ধ ও সাধকেরা সর্ব্বত্র রহস্য ভাঙ্গিতে নারাজ হইয়াছেন এবং বৈদ্যুতাগ্নি লইয়া তাঁহারা বিজলি বাতির

বিপণি সাজান নাই। তথাপি সাধকের পক্ষে তত্ত্ব জানার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। 'ইতর' জনের পক্ষেও সেরূপ সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও পরোক্ষ প্রয়োজন কিছুটা থাকিতে পারে। যেমন, যে আণবিক শক্তি লইয়া কারবার করে না, তার পক্ষে আণবিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন। অনেকের পক্ষেই কারবারের জন্যই জানার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কোথাও বা জানাতেই ইষ্টসফলতা। জানার পর করার প্রবৃত্তিও আসিতে পারে। ফল কথা, প্রয়োজনটা যে ভাবেই হোক, সেটা যদি নেহাৎ সখ না হইয়া সত্যকার গরজ হয় তবে সেটা যে কোনও উপায়ে নিজেকে মিটাইতে চাহিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, জপের যেটা রহস্য সেটা জানার জন্য গরজী, দরদী, মরমী অধিকারী কয়জন ?

তারপর জপ লইয়া কার্য্যতঃ পরীক্ষায় নামা। আগে যদি জপের তত্ত্ব বা রহস্যের কথা কিছু জানা থাকে তবে জপ কর্ম্মে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধা (working belief) সুতরাং প্রবৃত্তি আসা সহজ হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কোনও পরীক্ষায় নামাতেও তাই। প্রস্তাবিত পরীক্ষার theory বা যুক্তিটা জানা থাকিলে তো কথাই নাই ; অন্ততঃ পক্ষে এই বিশ্বাসটি থাকা চাই যে মূলে যুক্তি আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি (বিশেষজ্ঞ) সেটি জানেন, এবং অপরে ঠিক ঠিক বিদ্যা (technique) প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষার সফলতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এইটি "আপ্ত" প্রমাণ। জপাদির ক্ষেত্রেও এটিকে আশ্রয় করিতে হয়। সকল ব্যবহারিক বিজ্ঞানেই এই দস্তুর। যে ব্যবহারী, তার আপন বুদ্ধির একটা "প্রাথমিক" অনুমতি পাইতে হয়। সেটাকে ঠিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বলে না। বুদ্ধি যদি কারবারে নামার আগে তার মূলে যে যুক্তি আছে বা থাকিতে পারে, সেটিকে যথাসম্ভব যাচাই করিয়া লয়, তবে ঐ প্রাথমিক অনুমতি পত্রখানা আরও "পাকা" হইয়া গেল। তখন সেটা আর শুধু অনুমতি নয়। সেটা তখন অনুমোদন (permit) নয়, approval. এতে কাজে গরজ বাড়ে, কিন্তু এতেই কাজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। যুক্তি, শাস্ত্র, মহাজন বাক্য, এবং আত্মপ্রত্যয়—এই চার পর্য্যায়ে পর্য্যাপ্তি শেষ। শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা পূরা হয় না। তবে স্ব-বুদ্ধির একটা permit লইয়াই সবক্ষেত্রে, সমীক্ষা-ক্ষেত্রে বা পরীক্ষাগারে ঢুকিতে হয়। যুক্তি মিলিলে অনুমোদন ; শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যে সংস্কার ও সমর্থন, আত্মপ্রত্যয়ে সর্ব্বসংশয়-নিরসনে পাকা

"স্বাক্ষর"টি—পর্য্যন্ত হইয়া যায়। তিনি 'পর'ই হউন, আর "অবর"ই হউন, যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ "দেখা"টি হইতেছে ততক্ষণ সর্ব্বসংশয় কদাপি ছিন্ন হবার নয়। যতক্ষণ সমীহ ততক্ষণ সমীক্ষা ; যতক্ষণ পরোক্ষ ততক্ষণ পরীক্ষা।

জপের কাজে যাহার আপন বুদ্ধির permit মিলে নাই, তারপক্ষে তত্ত্বই বা কি, তথ্যই বা কি, কোনও বোঝাপড়া করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সে ক্ষেত্রেও কিন্তু permit-এর জন্য আরজি করার মত একটা মরজি আছে, কিম্বা হইতেছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচ্য। অগ্রে শুভেচ্ছা, পরে বিচারণা। আগে চাওয়া, তারপর পাওয়া। না চাইতেই যেখানে পাওয়া যায় সেখানে বুঝিতে হইবে পাওনাটা মালখানায় মালেকের নামে মজুদই ছিল।

ধরা গেল জপের কাজে permit মিলিয়াছে। এ permit সর্ব্বাগ্রে নিজের ভিতরেই মিলাইতে হয় দেখিয়াছি। কিন্তু বাহিরে সেটা endorse বা মঞ্জুরী করারও অপেক্ষা আছে। কেন আছে তাহার অবশ্য হেতুও আছে। ভিতর আর বাহির পরস্পরকে সাক্ষী করিয়া নিজ নিজ "সই"টি দিয়া থাকে। ধরা গেল, এই মঞ্জুরীটিও মিলিয়াছে। ভিতর থেকে কেহ বলিল—কাজটা করেই দেখোনা কি হয়। বাহির হইতে আর কেহ বলিল—করই না, ফল মিলিবে। তখন ভিতর বাহির দুইয়ে মিলিয়া ঠিক হইল—লাগিয়াই যাই। এই রকমধারা ভিতর বাহির মিলাইয়াও যে কাজে নামিল, তাহারও কিন্তু কাজটি সহজে হাসিল হইতে দেখি না।

"আমি এতদিন ধ'রে জপ ক'রলাম, কিন্তু পেলাম কি? অমুক ব্যক্তি তো জিন্দেগিভর জপেই লেগে আছে, কিন্তু তারই বা হোল কি? কৈ, রংও তো ফিরল না; হাড়ের টকও ঘুচলো না"!

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, জপের সত্যকার যেটা কাজ সেটা হয় আসলে সূক্ষ্ম বা সংস্কারের ক্ষেত্রে,—সুতরাং আমার এই বাজার-চল্‌তি কারবারী হিসাবের খাতায় তার ফলাফলের অঙ্কগুলো সরাসরি পড়িতে দেখিনা। এমন কি, উল্টা ফলও কিছুটা ফলিতে দেখিতে পাই। তাতে ঘাবরাইলে চলিবে না। হোমিওপ্যাথিক high potency ঔষধের মতো কাজটা আরম্ভ হয় গভীর স্তরে, এবং সেথায় "মন্থন আলোড়নের" ফলে অনেক সূক্ষ্ম, গূঢ় দৃঢ় অশুভ সংস্কার শিথিল হাল্কা হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ aggravation, কিনা, রোগের লক্ষণগুলির সাময়িক বৃদ্ধি হইলেও হইতে

পারে। তাতে রোগী অথবা বৈদ্য কাহারও ভয় পাইবার কারণ নাই। জপের "বুনো শূয়োরটী" আসলে "মুষিক বৃদ্ধি" নয়, "গজক্ষয়"—বৃহৎ বলবৎ অশুভ সঙ্কীর্ণ অথচ উদ্গ্র হইয়া রুখিয়া তাড়া করিতেছে। বৈখরী জপের ক্রিয়া "অন্নময়" কোষে সুরু হয় বটে, কিন্তু "সমর্থ" জপ হইলে সেটি "প্রাণময়", "মনোময়" ইত্যাদি ক্রমে সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে গিয়া কাজ করিতে থাকে। সমর্থ জপের আসল কাজটি এক কথায় হইতেছে এই—এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণযন্ত্রটার ভিতর যেখানে যেখানে স্পষ্ট অথবা গোপন বিষম বা বিষচ্ছন্দের "দৌরাত্ম্য" আছে, সেখানে সেখানে সুষম বা মধুচ্ছন্দ আনিয়া সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া দেওয়া। বিষমচ্ছন্দঃকেই (disharmony) বলে "অসুর" বা সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে পাপ্মা। সমর্থ জপের ক্রিয়ার ফলে যেটি "অসুর" সেটি হয় "সুর"। জপে যন্ত্রশুদ্ধি হওয়া মানে অপহতপাপ্মা হওয়া। "মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি ব'লে তারা"। "তারা" মায়ের তারক ব্রহ্ম নাম তো বটেই, তা ছাড়া তারা=তার=ওঁকার। জপে পাপ্মা অপগত হইবে। অপগত হওয়া মানে বেমালুম উধাও হওয়া নয় তো। আলাদা হইয়া তফাৎ হইয়া যাওয়া, elimination. গোড়ায় এইটিই হয়—পাপ পুরুষ বাহির হয় এবং পরে সরিয়া যায়। পরে অবশ্য—বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ ভূমিতে গিয়া "পরশ পাথরের" সন্ধান মিলিলে সবকিছুই "সোনা" হইয়া যায়—"বিষোঽপি অমৃতায়তে"। মধু-কৈটভ সংহার হইল, কিন্তু তাহাদের "মেদু" দিয়া রচিত হইল "মেদিনী"। এইটিই হইল Transformation, Sublimation. ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ, তখন "চিতি রূপেণ" ও "ভ্রান্তি রূপেণ" দুইই এক বস্তু।

দ্বিতীয় এবং আসল কথাটা কিন্তু হইতেছে জপকে "সমর্থ" বা "বীর্য্যবান্" করা। জপবীর্য্যে অমোঘ শক্তি। কিন্তু জপবীর্য্য হয় কি করিয়া? শ্রুতি বলেন,—যে কাজই করা যাক্ না কেন, সেটা "বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা বীর্য্যবত্তরং ভবতি"। বৈষয়িক আধ্যাত্মিক সবতাতেই ঋদ্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইতেছে—ঐ তিনটি। বিদ্যা মানে এখানে প্রয়োগপদ্ধতি (মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র), ব্যবহারবিজ্ঞান বা আর্ট। যেমন প্রাচীনকালে "মধু বিদ্যা", "দহর বিদ্যা", "পঞ্চাগ্নি বিদ্যা" ইত্যাদি। বর্ত্তমানে যে কোনও কাজ সুষ্ঠু সফল ভাবে করার যে correct technique তাহাকেই তাহার আর্ট বলে।

"শ্রদ্ধা" বলিতে মোটামুটি বুঝায় কাজটার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কাজটায় "দরদ"—সত্যিকার interest. এই থেকে আসে আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, বিশ্বাস। আর উপনিষদ্ মানে রহস্য বা অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির জ্ঞান। এই শেষেরটা হইল Sc ence, Mystic Science ও বটে। লক্ষ্য কর যে শ্রুতি "বা" শব্দটার প্রয়োগ করিয়াছেন। "বা" মানে বিকল্পও বটে, সমুচ্চয়ও বটে। অর্থাৎ তিনটিই চাই, কিন্তু তিনের অন্ততঃ একটার বীর্য্য, কিনা "জোর" থাকা চাই। আর, শ্রদ্ধাই যখন মূল, তখন মূলে জোর ধরিলে শাখাতেও জোর ধরিবে। একটায় যদি জোর থাকে তবে কর্ম্মটি (জপ) "বীর্য্যবৎ" হইবে। অন্যথা "বীর্য্যহীন" ; নির্বীর্য্য যেমন ঢোঁড়া সাপ। ঢোঁড়া সাপের মাথায় সাত রাজার ধন একটি মাণিক থাকেনা তো! জপ "ঢোঁড়া" হইলে সে হয় মামুলি, ঢিমে তেতালা, এমন কি, morbid.

আরও লক্ষ্য কর—শ্রুতি "বীর্য্যবত্তর" বলিলেন, "বীর্য্যবত্তম" বলিলেন না। তার মানে, বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ সহকারে অনুষ্ঠিত সকল রকম ক্রিয়ারই "বীর্য্য-বত্তার" কিনা জোর ধরার, একটা তরতমতা, ক্রমোন্নত ধারা অথবা "অভ্যুদয়" আছে ; সুতরাং একটা কাষ্ঠার বা পূর্ণতার বা নিঃশ্রেয়সের দিকে প্রবণতা আছে। সেই ধারাকে বলিতে পার শঙ্কর ধারা। এটি শুক্ল ধারা। বিদ্যা শ্রদ্ধা উপনিষদের শৈথিল্য বৈকল্য ক্লৈব্যের নিমিত্ত এর বিপরীতটিও হইয়া থাকে। সেই উল্টা স্রোত এবং তজ্জন্য আড়ষ্ট আবিল উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে বলি ধূম্রমলিন সঙ্কর ধারা। আগেরটা তালব্য শ, এটা দন্ত্য স। শঙ্কর ধারাই সেই শাশ্বতী গঙ্গা প্রবাহ, ভগীরথ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে আদি বিধানের অভিশপ্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। আমাদের সকল কর্ম্মেই তাহাই করিতে হয়। অঙ্গার লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। অঙ্গার হইবে আঙ্গিরস। গীতা "তপ"কে তিন ভাবে বলিয়াছেন। প্রকারান্তরে তাই হইল বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষদ্। বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী। সরস্বতী বহুদিন থেকে বালুকায় লুকাইয়াছেন। জপের বা অপর কোনও অধ্যাত্ম-সাধনের রহস্যের সন্ধানী আমরা অনেকদিন থেকেই নই। কিন্তু সন্ধান তো চাই। প্রচলিত, অনুসৃত বিদ্যাও খণ্ডিত, কুণ্ঠিত, কৃপণ। সিদ্ধ বিদ্যা—correct technique—কি মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায়? আর, শ্রদ্ধা? প্রায় সবাই "অশ্রদ্দধানাঃ" হইয়াছি। বুদ্ধির যে permitএর কথা বলিয়াছি, সেটাও অনেকক্ষেত্রে জাল,

নকল। সাচ্চার কারবার প্রায় বন্ধ। ঐ তিনেরই উন্মেষ উৎকর্ষ হইতে থাকিবে—ঋদ্ধি বিবৃদ্ধি হইবে, যতক্ষণ না পূর্ণতায়, পরাকাষ্ঠায় না পৌছিতেছি। অফুরান চড়াই-উৎরাই এর পথে অনন্তের যাত্রী তবে কি? তা নয়। কিছুটা চলার পর কৃপার সন্ধান মিলে, তখন পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। আগে প্রয়াস পরে প্রসাদ, আগে race পরে grace.

শ্রদ্ধাই মূল, সন্দেহ নাই। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ"। কিন্তু শ্রদ্ধা তামস হইলে তা থেকে বিশেষ কিছু হয় না। শ্রদ্ধাবীর্য্য থাকা চাই। তা হইলে বিদ্যাও হইবে উপনিষদ্‌ও হইবে। যে সাধক গরজী, দরদী, মরমী তাঁহার কাছে সকল দরজাই খোলা। যার গরজ সেই গরজী—ব্যস্ত বাগীশ বা হঠকারী নয়। যার বুকে ব্যথা সেই দরদী, যার মরমে বাজে সেই মরমী। যাহাতে দুইয়ের মধ্যে একতানতা (unison) আনিয়া দেয় তাকেই বলে শ্রদ্ধা। নাম ও নামদাতার সত্তা-শক্তির সঙ্গে সাধকের সত্তা-শক্তির যখন সমচ্ছন্দতাটি (concordance) চালু হয় তখনই বলিব নামে বা গুরুতে শ্রদ্ধা হইল। শ্রদ্ধার একটুখানি "ছোঁয়াচ" লইয়া সব কাজই সুরু করিতে হয়—অর্থাৎ, যথাসম্ভব অন্তরের যোগটি। কিন্তু "শ্রদ্ধাবীর্য্য" যে অনেক সাধনের ধন। শ্রদ্ধা যখন আসিল তখন সমাধানের আর বাকি রহিল কি? এই বিশ্বাস, এই ব্যাকুলতার কথাই তো শ্রীমুখে শুনিয়াছি। "শ্রীকর্ণের" শ্রদ্ধা হইয়াছে কি?

সব ব্যবহারক্ষেত্রেই ঐ তিন "বজ্রের" মিলনেই যে সিদ্ধি হয়, তা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বীকার করিয়া থাকি। সব কিছু সিদ্ধির জন্য রহস্যবিৎ, প্রয়োগকুশলী এবং শ্রদ্ধালু সাধক চাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, জপ বা অপর কোনও আধ্যাত্মিক সাধনের বেলা এটি আর মনে থাকে না। তখন নিতান্ত নিরীহটি—যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রটি—সাজিয়া কৃপার দোহাই দেই, নির্ভর শরণাগতির দোহাই শোনাই। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব কিনা! কৃপা বলে কাহাকে? নির্ভর-শরণাগতি যখন তখন যত্রতত্র "পতন ও মূর্চ্ছার" ভাবটি আনিতে পারিলেই হয়?

কৃপা অহেতুক শাশ্বত এবং সর্ব্বত্রগ হইলেও তাহার সঙ্গে "সজীব সংযোগ"টি সংঘটিত হয় অনেক সাধ্য সাধনায়; আর শরণাগতি তো ঠাকুরের পায়ে আমার শ্রেষ্ঠ ও চরম অর্ঘ্যদানটি! যে অকৈতবক্লান্তর কৃপাভিখারী তার কাছেই না কৃপাঘনমূর্ত্তি ঠাকুর "প্রকট"! সব ছাড়িতে (সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য) না

পারিলে তদেকশরণ হওয়া যায় না। কাজেই আত্মনিবেদন (বিশেষ করিয়া ভক্তের মতো কোন নিষ্কৈতব ভাব বা রসাশ্রয়ে) হইতেছে "সাধ্য শিরোমণি"। তবে অবশ্য বিত্তা-বীর্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে "রোখের" সহিতই শরণাগতি ও কৃপাভিখারীর অনুকূল মনোভাবটি আনিবার সাধনও করিতে হয়। নহিলে, শ্রদ্ধার মূল কাঁচিয়া পচিয়া শুকাইয়া যাইবে। হয়তো বা জপাদিও করিব, আর দুই বেলা শিকড় শুদ্ধ চারাটি উঠাইয়া দেখিব শিকড় কতখানি "বড়" হইল না হইল! যেন মূলের হিসাব রাখার ভার যে শাখাপল্লবচারী—তাহার! মূলের ভাবনা ভাবিবেন যিনি মূলের মালিক। "মনুয়ারে, তুই বেয়ে যা রে দাঁড়। তোর হাইল্যা ব'স্যা আছে মাঝি ভাবনা কি রে আর।"

জপ-রহস্য

(১)

আমরা এতক্ষণ শব্দ এবং রূপ বা মন্ত্রশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন শব্দ বা মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া যে জপক্রিয়া অনুসৃত হয়, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। জপকর্ম্মের রহস্য পরিস্ফুট করার জন্যই মুখ্যতঃ এ গ্রন্থের অবতারণা। তবে মূল গ্রন্থ অনুধাবনের পক্ষে সুবিধার জন্য প্রারম্ভে একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লওয়া মন্দ নয়। তাই এখানে একটা "কাঠামো" খাড়া করার চেষ্টা করা যাইতেছে :—

জপের স্বরূপ বিশ্লেষ করিতে গেলে দেখিতে পাই—জপ,—ধ্বনি (ব্যক্ত বা অব্যক্ত), সংখ্যা, আর ভাব (অর্থ)—এই তিনের ত্রিপুটী। বাক্, প্রাণ এবং মন—যথাক্রমে এ তিনের নির্ব্বাহয়িতা। শ্রুতির সাঙ্কেতিক ভাষায়—অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমাঃ। প্রত্যেকটি আবার স্বানুগত, স্বগত ও সমষ্টিগত—এভাবে ত্রিবিধ। ধর, "গুরু" এই মন্ত্র। গ, উ, র, উ—চারিটি অক্ষর। প্রতিটি অক্ষরের স্পন্দন সংখ্যা, আর স্পন্দন রীতি (বা ছন্দঃ) এক নির্দ্দিষ্ট "আকৃতি" (Pattern বা Type) অনুরূপ হওয়া আবশ্যক "সমর্থ" জপে। এই হইল "গুরু" এই মন্ত্রের স্বানুগত "সংখ্যা" (elements of rhythm)। তারপর শুধু অক্ষরব্যক্তিগুলির সংখ্যা (=সংখ্যা+রীতি) ঠিক রাখিলেই হইল না। তা'দের মিলন (compounding) টিও ঠিক হওয়া চাই—যথা, অক্ষরাবয়ব চারিটির স্পন্দন অযথা অন্তরিত বা ব্যবহিত হইলে হয় না ; ব্যবধানে বিবাদী স্পন্দ প্রবিষ্ট হইলে হয় না, ইত্যাদি। সুতরাং, গ, উ, র, উ—এদের ছাড়াও "গুরু" এই নামের একটা স্বগত সংখ্যা ও রীতি আছে। তারপর, ধর ঐ মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেছি। ১০ বার, ১০৮ বার ইত্যাদি। এর দ্বারা সমষ্টিগত একটা স্পন্দন সংখ্যা ও রীতি প্রস্তুত হয়। সেটি "আকৃতি" ও "আয়তনে" (in type and magnitude) একটা নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠায় (limitএ) না উপনীত হইলে সমর্থ জপকর্ম হইল না। ধর, আমি লাল রঙ্ দেখিতে চাই। আলোক তরঙ্গগুলির আয়তন (wave-length) ও সংখ্যা একটা নির্দ্দিষ্ট

সীমায় না পৌঁছিলে সেটি হয় না। শব্দের, সুরের বেলাতেও তাই। ঠিক ঠিক আকৃতি ও পরিমাণের কম বেশী হইলে হয় না। স্পন্দনগুলি পরস্পরের সঙ্গে ভগ্নাংশ সম্বন্ধে থাকিলে হয় না। একটা পূরা composite rhythm বা Harmony সৃষ্টি হওয়া চাই। তবেই তা'দের সঙ্ঘাতটি সমর্থ হইবে। স্বানুগত, স্বগত,—এদের ভগ্নাংশে সমাহার হইলে তা'তে সমর্থ-সমুচ্চয় বা সংগ্রহ (cumulative effect) হয় না। জড়বিদ্যা বলে,—সামান্য একটা মৃদু কম্পন (oscillation) যদি ঠিক একই তালে ক্রমাগত প্রযুক্ত হয়, তবে সে একটা পর্বতকেও পাড়িয়া ফেলিবে। মন্ত্রশক্তি অমোঘ হয় সমর্থ, সমঞ্জস সমুচ্চয় দ্বারা। তারপর, স্পন্দন দীর্ঘ, মধ্য, হ্রস্ব—(Long, Medium, Short) ভাবে ত্রিবিধ। অনুদাত্ত স্বরিত, উদাত্ত; বাচিক, উপাংশু, মানস ইত্যাদি ভেদ এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। দীর্ঘায়ত স্পন্দনে (তরঙ্গে) এ "উচ্চতা" কম হ'বার কথা। হ্রস্বে উচ্চতা অধিক। "তল", "লম্ব" এবং "বেধ"—এই তিন পর্ব্বে জপাদির বিশ্লেষণ (analysis) এবং তার দ্যোতনা (interpretation) মূলগ্রন্থে সবিশেষ মিলিবে। পাদ (Magnitude), মাত্রা (Measure), কলা (Moment, Aspect or Partial) এবং কাষ্ঠা (Limit, Merger, or "Motive")—এই "চতুঃসূত্রী" অবলম্বনে সর্ব্ববিধ বিশ্লেষণ। সংখ্যা লইয়া যেরূপ বিশ্লেষণ, ধ্বনি ও ভাব লইয়াও অনুরূপ বিশ্লেষণ, হ'বে। সুতরাং, জপ যদি বৈখরী ইত্যাদি ভেদে চার হয়, তা হইলে প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত নিয়মে—৩×৩×৩। ∴ ৪×৩×৩×৩=১০৮। বলা বাহুল্য, পশ্যন্তী ও পরায় জপ মুখ্যতঃ ভাবরূপ ও জ্ঞানরূপ হইলেও তা'র অব্যক্ত ক্রিয়া (স্পন্দ) রূপ থাকে। সুতরাং স্পন্দনিয়ামক রীতি (Law) সেখানেও নিরবকাশ হয় নাই।

(২)

পূর্ব্বোক্ত স্পন্দনটি কিন্তু সমতালে হওয়া চাই। সমতালে হইলে একটি অনুরণন (resonance) সৃষ্ট হয়। জপক্রিয়ার সাফল্য (efficacy) মুখ্যতঃ ঐ resonance effectএর উপরই নির্ভর করে। ধর, কোনো বাজনার যন্ত্র (যেমন, সেতার) বাজাইতেছি। আমার অঙ্গুলি দ্বারা তারের ঝঙ্কার, resonance effect (অনুরণন) দ্বারা যে কি ভাবে কতখানি সমৃদ্ধ (aug-

mented, enriched) হইতেছে তা' সহজেই ধরিতে পারি। সেতারটা ঠিক "বাঁধা" থাকিলে উক্ত effectটি সৌষ্ঠব ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। অন্যথা ব্যতিক্রম ঘটে। নিকটে অন্য অন্য যন্ত্রও যদি "সম অনুপাতে" বাঁধা থাকে তো সেতারের ঝঙ্কার সে সবেও "অনুরূপ" resonance effect সৃষ্টি করিবে। আসল কথা,—অনুরূপতা। বাজানো সেতারেই হোক, অথবা আর আর যন্ত্রেই হোক্,—যেখানেই অনুরূপতার বদলে বিরূপতা, সেখানেই বাজনার স্পন্দন (virbrations) গুলো Harmony সমূহের harmonic combination হ'বার যে সব নিয়ামক ছন্দঃ (Equations) আছে, সে সব ছন্দে আসিবে না ; সুতরাং তা'দের combination, harmonic না হইয়া unharmonic হইবে। বিরূপতাবশতঃ resonance effect না হইয়া wavesগুলি refraction, defraction ইত্যাদি effectএ বিভক্ত হইয়া নানাবিধ জটিল interference effectএর সৃষ্টি করিবে। ফল—পরস্পর বিরোধ, উপমর্দ, জটলা। মূল স্পন্দনের প্রতিস্পন্দনটি বিবাদী, বিসম্বাদী হইবে। Waves সমূহের সম্বাদী অথবা বিবাদী হ'বার কতকগুলি সহজ গাণিতিক নিয়ম আছে। গণিতশাস্ত্রে ও শব্দবিজ্ঞানে সে সব নিয়মের বিশ্লেষ বিস্তার এবং পরীক্ষাদি আছে। গীত ও বাদ্যের বেলাতে যেমন, জপকর্ম্মের বেলাতেও তেমনি, স্পন্দনগত ও স্পন্দনজন্য সমঞ্জসতা (Harmony) অথবা অসমঞ্জসতা (Discord) উক্ত নিয়মগুলির শাসন মানিয়া চলে। জপের জ্ঞানরূপ এবং ভাবরূপ—এ দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং এ দুয়ের "আধার" এবং "উদ্‌বোধক" কর্ম্ম বা ক্রিয়ারূপ থাকে, এবং সে ক্রিয়াটি স্পন্দনাত্মক। জপের ভাব এবং জ্ঞানরূপে "ক্রিয়ার" স্পন্দনরূপটি অস্তমিত বা বিলীনপ্রায় মনে হয় ; কিন্তু "স্পন্দ" রূপটি, সুতরাং জপকর্ম্ম থাকে। একান্ত নৈঃস্পন্দ্যে জপকর্ম্মেরই লয়। সেটি জপাতীত বা "অজপ" (অজপা নহে) অবস্থা।

এখন দেখ জপক্রিয়াটি হয় কিরূপে। প্রাণভূমি থেকে প্রাণের ঋতচ্ছন্দে উত্থিত হইয়া জপ স্থূলে দেখা দিলে, তার স্পন্দনকে পূর্ব্বোক্ত অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়মে৽ পড়িতেই হয়। অবশ্য, "সূক্ষ্মে"ও অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়ম আছে। তবে, তাহা সাধারণ হিসাব ও পরীক্ষার বাহিরে। স্থূলের Law সূক্ষ্মের সঙ্কোচরূপ (ব্যাপ্তি এবং বীর্য্য দুদিক্ থেকেই)। অর্থাৎ, সূক্ষ্মে যেটি ঋত তার ব্যাপ্তি (field) ও বড়, এবং তার বীর্য্য, কিনা "শক্তিমান" ও

অধিক। স্থূলের হিসাব (calculation) অপেক্ষাকৃত "সঙ্কীর্ণ কাঠামো" (restricted data) লইয়া চলে বলিয়া, তাকে সরাসরি সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে চালান যায় না। তথাপি ইহা বলা চলিবে যে—জপকারীর যন্ত্র (অন্নময়াদি) হয়—(১) একান্ত অনুরূপ আছে (অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধায় "বাঁধা"); নয় তো (২) একান্ত বিরূপ (একেবারে শ্রদ্ধাহীন); অথবা (৩) আংশিকভাবে অনুরূপ (শ্রদ্ধার ছয়টি কল্পের পূর্ব পূর্ব কল্পগুলিতে ক্রিয়াশীল)। প্রথম স্থলে resonance effect পূরা হইবে, ফলে জপক্রিয়ায় "সমূহ" সাধিত হইবে। দ্বিতীয়তে, interference effect গুলো অতিমাত্রায় প্রবল হইবে, ফলে "স্তব্ধব্যূহ" অথবা "ব্যামোহ" ঘটিবার সম্ভাবনাই অত্যধিক। জপের দ্বারা system এবং environmentএ যে সমস্ত প্রতিস্পন্দন (reaction) সৃষ্টি হইবে, তা'রা overpoweringly unharmonious and unhelpful-অত্যন্ত বিষম ও বিরুদ্ধ হইতে পারে। এই বিষমতা নিবন্ধন স্তব্ধব্যূহ (মূঢ়রূপ —inert staticity) এবং ব্যামোহ (ঘোররূপ—dissipating excitability) দেখা দেয়। তৃতীয় হইতেছে জপসাধনের সাধারণ অনুকূল অবস্থা। আংশিক অনুরূপতাকে আশ্রয় করিয়া জপক্রিয়া একটা wedge বা শলাকার মতো সাধনযন্ত্রে ও শক্তিক্ষেত্রে (functional field) প্রবিষ্ট হইবে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র যন্ত্রটির সূক্ষ্ম অবয়বগুলির বিন্যাস এবং ক্রিয়ার ছন্দটি সে অনুরূপভাবে বদ্‌লাইয়া লইবে। জড় ও প্রাণরাজ্যের মৌলিক পরিবর্ত্তনগুলো এইভাবেই সাধিত হয়। Atomic Number, Molecular Distribution, Chromosomes & Geneএর পরিবর্ত্তন বাহ্য কারণবশতঃ ঘটিলে—এই ভাবেই ঘটিয়া থাকে। আন্তরকারণবশতঃ ঘটিলেও পরিবর্ত্তনের রীতি এবং রূপটি পূর্ব্বোক্তরূপই হইয়া থাকে। যন্ত্র যেমন অনুপাতে অনুরূপ হইতে থাকে, সেই অনুপাতে তা'তে অনুরণন সমুদয় বা resonance effect বেশী হইতে থাকে। কেবল জপ বলিয়া কেন, সকল অভ্যাসেই যন্ত্রের একটা "molecular aptness," সুতারাং functional readiness, একটা উপাদানগত যোগ্যতা, সুতরাং মৌলিক উন্মুখতা সৃষ্টি হইতে থাকে। অর্থাৎ যন্ত্রটি বাজাইতে বাজাইতে তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুরপ্রবণতা সৃষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং তখন অঙ্গুলিস্পর্শমাত্র তাহা সুরে ও তালেই বাজিয়া উঠিতে অভ্যস্ত হয়, বেসুরা বা বেতালা হইতে চায় না। সেইরূপ সমর্থ জপে অন্নময়-

কোষের এবং উত্তরোত্তর আর আর কোষেরও বিরূপতা দূর হইয়া অনুরূপতার সৃষ্টি হয়। স্থূল দেহে অনুলোম ও অনুকূল পোষণ, Hormone Secretions, সূক্ষ্মে কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং "চক্র"গুলির উন্মেষ, কারণে "আণবমল" শুদ্ধি—সবই ঐ ক্রিয়ার ফল।

কিন্তু জপের অভ্যারোহ বা লক্ষ্যাভিমুখে আরোহণ সর্বত্র অনায়াসে ঘটে না। এর কারণ চার রকম বাধা এসে বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করতে চায়। এই বাধার জন্যই চরিতার্থিতা সহজে হয় না। বাধাগুলি: (১) কাল (=উপস্থিতি) নিমিত্ত=প্রতিরোধ; (২) দেশ (=পরিস্থিতি) নিমিত্ত=অবরোধ; (৩) বস্তু (=অবস্থিতি বা অবস্থান) নিমিত্ত=নিরোধ; (৪) ছন্দঃ (=সংস্থিতি বা সংস্থান) নিমিত্ত=বিরোধ। [বৈদিক উপাখ্যান যথাক্রমে অহি, পণিঃ, বৃত্র ও অসুর (=অ-সুর=বেসুর)। ১ম+২য়=Resistance due to Space-time interval; ৩য়=due to Ingress or Intrusion; ৪র্থ=due to Interference.]

বাহ্য অথবা আন্তর যে কোনো apparatus লইয়া কোনও সাধন করিতে গেলে সাধন সমর্থ এবং সফল হ'বার পক্ষে ঐ চারিপ্রকারের প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় পাইতে হয় অথবা করিয়া লইতে হয়। ধর, দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে কোনো জ্যোতিশ্চক্র দেখিবে। তজ্জন্য—(১) রাত্রিকাল এবং সম্ভবতঃ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ও চাই; (২) Objective conditions suitable হওয়া চাই, যথা, আকাশ মেঘমুক্ত ইত্যাদি; (৩) যন্ত্রটি in a fit conditionএ থাকা চাই; এবং (৪) যন্ত্রটিকে ঠিক correct orientationএ adjust করা চাই। এ সকলগুলি সমাহার না হইলে প্রবৃত্তি সফল হইবে না। মনের ব্যাপারেও এইরূপ। এক্ষেত্রে—(১) Time factor হইতেছে অনুকূল বাসনা বা সংস্কারের উদয়, প্রতিকূলের বিরোধ বা ক্ষয়। এর নাম শুভবাসনা। Space factor—কেবল শুভবাসনা হইলেই হইল না। বাহিরের পরিস্থিতিটাও অনুকূল থাকা চাই। একে বলে শুভযোগ। ধর, জপ করিতে বসিতেছ, কিন্তু বাহিরে (নিজের এই স্থূলদেহটাও বাহিরের সামিল) বড় ঝামেলা। তাহা হইলে জপে বিঘ্ন ঘটিবে। (৩) Instrument factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এসেছে কিন্তু চিত্ত যদি (ক) ধৃতিগৃহীত, অথবা (খ) রতিগৃহীত হইয়া (অর্থাৎ ধৈর্য্যবীর্য্যসমন্বিত হইয়া, এক কথায়, মতিগৃহীত হইয়া) কাজ না করিতে অভ্যস্ত

থাকে তো সমর্থ ও সফল সাধন হইল না। (৪) Accordance factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এবং শুভাগ্রহ (ঐ তৃতীয় অনুকূলতাটির নাম)—তিনই আছে; কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর সঙ্গে যেভাবে "সন্ধি" (correspondence বা accordance) করিতে হইবে, সেভাবে হইতেছে না। তাহা হইলেও সফল হইবে না। ইষ্টের সঙ্গে শুভসন্ধিও চাই। এই শুভসন্ধিকে বলে শ্রদ্ধা। এই শুভসন্ধিটি একবারেই ঘটেনা; ইহার পর পর কতকগুলি ভূমি বা কল্প আছে। শুভবাসনা ও শুভযোগের আধারে শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি বা শ্রদ্ধায় (adjusted, attuned অবস্থায়) আসিলে জপাদি সাধন "সমর্থ" হয়। ভগবানের অনুগ্রহশক্তি সূর্য্যরশ্মির মতো সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত বটে। কিন্তু সাধারণতঃ ও-সম্বন্ধে জীবের যন্ত্র ("খানি") "পরাঞ্চি" (scattering, dissipating) বলিয়া, সে রশ্মিসমূহ divergent, "বিক্ষিপ্ত," সুতরাং কার্য্যতঃ অনভিব্যক্ত থাকিয়া যায়। জীবের ভিতরে আগ্রহ জাগিলে যন্ত্র একটা concave mirrorএর মতো, "প্রত্যঞ্চি"—সেগুলি convergent (সংহৃত ও কেন্দ্রগ) করিতে সমর্থ হয়। Convergent হইতে হইতে একটা কেন্দ্রে (focusএ) ঘনীভূত হইলে, তাহা হইল গুরুশক্তি। তখন সেই কেন্দ্রের সঙ্গে "শ্রদ্ধা" সহকারে আপন শুভসন্ধি (right accordance) স্থাপন করিতে পারিলে—কাজের ঠিক রাস্তা ধরা হইল।

শুভ-বাসনা, শুভযোগ, শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি—এই ক্রমে কাল,. দেশ, বস্তু এবং ছন্দোগত বাধা দূর হইয়া থাকে। সাধনের পূর্বভূমিতে এ সকল বাধা পরাভূত হইলেও, মধ্য এবং উত্তরভূমিতে আবার নূতন আকারে দেখা দিয়া থাকে। মধ্য আর উত্তরভূমি কি এবং তা'তে বাধাগুলি কি আকারের, আর তা'দের পরাভবই বা কি ভাবের—ইহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। যোগ, ভক্তি, এবং জ্ঞান—ত্রিবিধ সাধনেই, এদের আকার প্রকার চিন্তনীয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি মাহাত্ম্য সাধনের পূর্ব, মধ্য এবং উত্তরভূমিরূপেও বিবেচ্য। মুখ্যতঃ—উক্ত ভূমিত্রয় চেতনার "অব", "সম", এবং "অতি" (**sub, normal, or liminal, super**) তিনটি স্তর বা "তল"। প্রথম তলে, "যোগনিদ্রা" হইতে উত্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইল পরাভবশক্তি (আত্মকৃপা)। দ্বিতীয় তলে, অভিব্যক্ত নিখিল দৈবী সম্পৎ সংগ্রহ হইয়া পরাভব শক্তি (গুরুকৃপা, দৈবী সম্পৎ = বহির্বিশ্বে Cosmic Rays যেমন, তেমনি অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত অনুগ্রহশক্তি;

সে সকলের সংগ্রহ = কেন্দ্রীভাব, focussing = গুরুশক্তি)। সাধকের আগ্রহ শক্তি বা "আত্মকৃপা" দ্বারা বিপুল, বিশ্বজনীন দৈবীসম্পৎটিকে "canalize" বা "ধারা" রূপ করিতে হয়। ইহাই শ্রুতির ভাষায়—"দুহানা অমৃতস্য ধারাম্।" ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া মৃত্যুরূপ তমসা থেকে উত্তরণের নিমিত্ত দেবতারা গায়ত্রীচ্ছন্দকেই বরণ করেন। তৃতীয়তলে, অর্থাৎ চেতনার উর্দ্ধতন স্তরগুলিতে বহুধা ক্রিয়মাণা দৈবীসম্পৎ (জ্ঞানৈশ্বর্য্য ইত্যাদি) যে একেতেই—অদ্বৈতেই—অধিষ্ঠিত ও পরিসমাপ্ত—এইটি দেখাইয়া (যথা, শুম্ভবধে দেবীর উক্তি—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা") তবে পরাভব। এইটি বিশেষভাবে ভগবৎ কৃপা। এটি ব্যতীত শেষ গ্রন্থি কিছুতে অপগত হবার নয়। আগে আগ্রহ = শুভবাসনা + শ্রদ্ধা + বীর্য্য (= আত্মকৃপা) সৃষ্টি; তারপর প্রত্যক্‌প্রবণ উজ্জলধারার (সঙ্কর ছন্দের অবসানে শঙ্কর ছন্দের) পালন ও পোষণ (= গুরুকৃপা); শেষকালে, আত্মনিগ্রহ বীজটার লয়—অর্থাৎ যে বীজটা জীবকে বিশ্ববাধা যন্ত্রে পাতিত ক'রে, তা'কে কখনও সঙ্কুচিত কখনও প্রসারিত ক'রে "নিগ্রহ" (নিতরাং গ্রহঃ) করছে সেটার লয় হয়। ইহা ভগবৎ কৃপা। এক কৃপারই তিন প্রকাশ। যেমন, এক চক্রের নাভি, অর (সেতু বা সন্ধি) এবং নেমি (পরিধি); অথবা, অব্যয়নিধান (আকর), বীজ এবং ক্ষেত্র বা স্থান।

বাধাগুলিকে চারভাবে 'প্রতিষেধ' করিতে হয়। যথা :—

(১) বাধার সঙ্গে **সমতলে** বা **সমসূত্রে** (same direction এ) থাকিয়া তুল্যবল প্রতিপক্ষ দ্বারা (by equal and opposite force)—এটি অভ্যাস যোগ।

(২) বাধার সঙ্গে **সমতলে** আছি কিন্তু সমসূত্রে নেই (changed direction)। বাধার blow ঢাল পাতিয়া লইতেছি না; নিজের 'অবস্থিতি'টাই (angle of reaction) অন্য মুখ করিয়া লইতেছি। এটি বৈরাগ্য যোগ।

(৩) **নিজের** 'তল'ই বদ্‌লাইয়া লইতেছি—অনাসক্ত যোগ।

(৪) বাধার বাণ যে মূল ধনু থেকে বাহির হইতেছে, তার ছিলা (জ্যা) কাটিয়া দিতেছি। যে মূল অজ্ঞানের অথবা স্বরূপ-সম্বন্ধ-পরিচয়াভাবের আধারে এ সমস্তই অধ্যস্ত, সেই **আধারটাই** রহিল না। এটিকে বলিতে পার—অস্পর্শযোগ। বৌদ্ধ সাধনে যেটি 'নবম' ধ্যান (সংজ্ঞা ও বেদনা

দুয়েরি অভাব যেখানে) এবং মাণ্ডূক্যকারিকার অস্পর্শযোগ এস্থলে বিবেচ্য। এখানে কেবল যে $X+Y+Z=O$ এমন নয় ; $X=O$, $Y=O$, $Z=O$. প্রথম equationটিতে 'ফল' নিত্য হয় না ; কেননা, X, Y, Z কেহই individually vanish করে নাই ; সুতরাং তা'দের আবার পারস্পরিক অনুপাতের ব্যতিক্রমের ভয় আছে। কিন্তু সত্যকার অস্পর্শযোগ অভয়, যদিও, বলা হয়, যোগীরা সচরাচর এতে ভয় পান। উক্ত চার প্রকার যোগে মুখ্যতঃ বাধাকে সরাইবার বা এড়াইবার প্রশ্নসটি স্পষ্ট। কিন্তু 'এ সমস্ত আত্মাই অথবা ব্রহ্মই'; সুতরাং যেটি "বিষ" সেটিও আসলে অমৃত, যেটি "ভয়" সেটিও অভয়—এইভাবে তাদাত্ম্য এবং সামরস্য উপলব্ধিতে পূর্বোক্ত আহুতি চতুষ্টয়ের সমাপনরূপ 'পূর্ণাহুতি'টি শেষ করিতে হয়। এটি সমাপত্তি বা সামরস্য যোগ। ইহা ব্যতীত সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা নিত্যোদিত আনন্দ নাই। ভক্তি-সাধনের দিক দিয়েও এ সব অনুরূপভাবে আলোচ্য। সে ক্ষেত্রে সম্বন্ধের দিক থেকে, (১) তদারোপিত সম্বন্ধ, (২) তৎপ্রপন্ন সম্বন্ধ ; (৩) তদেকাশ্রিত সম্বন্ধ ; এবং (৪) তদ্ভাবভাবিত সম্বন্ধ—এইগুলি সিদ্ধ হয় পর পর উক্ত চারি বাধা অপগমে। অষ্টাঙ্গযোগে দেশগত বাধা জয়ে ধারণা ; কালগত বাধা জয়ে ধ্যান ; ছন্দঃ এবং বস্তুগত বাধা জয়ে দুই প্রকারের সমাধি। চতুর্ব্বিধ বাধার দিক্ থেকে সবিকল্পের অন্তর্গত সবিচারাদি চারিটি ভূমিও বিচার্য্য। সানন্দ সমাধিতে বিশেষভাবে ছন্দোনিমিত্ত এবং সাস্মিতে বস্তুনিমিত্ত বাধার 'সাপেক্ষ' (conditional) অপগম হইয়া থাকে। সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাদির বিচার মূলগ্রন্থে মিলিবে।

প্রাচীনকালে কোন ক্রিয়ার সাথে সাথে তা'র বিদ্যাও উপদিষ্ট হইত। শ্রুতিতে তা'র ভূরি ভূরি প্রমাণ। ইহার রহস্য হইতেছে এই যে উপাসনা মূলতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়ার মিলিতরূপ বা যুগ্মরূপ। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ক্রিয়ার নিবিড় সম্মিলন ও পরিণয় ব্যতীত জপাদি সাধন 'সমর্থ' হয় না। এখানে ক্রিয়াহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন ক্রিয়া অন্ধ। প্রথমের ফলে হয় শুধু অবাস্তব কল্পলোকে বিচরণ, দ্বিতীয়ে শুধু যান্ত্রিকতার 'ঘাণিপাকে' আবর্ত্তন ('শ্রম এব হি কেবলম্')। এই বিচ্ছিন্ন দুই পথেই তাই সিদ্ধির 'আলো' ফোটে না, 'রস' উৎসারিত হয় না। প্রজ্ঞালোক থাকে একেবারেই অন্তর্হিত, কারণ প্রাণ বা প্রজ্ঞার তনুটি এই দুইয়েরই 'মিথুনে' সমুৎপন্ন হয়। এই

বিচ্ছেদের ফল সম্বন্ধে শ্রুতি সাবধান ও সতর্ক করেছেন বারবার—ঐ 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' ব'লে। তবে প্রথমকে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানীকে আরো বেশী সাবধান করেছেন, কারণ তার সামনে 'ভূয়ঃ তমঃ'। দ্বিতীয়ে অর্থাৎ শুধু ক্রিয়াতে তবু কিছু সচেষ্টতা আছে, তাই ক্রিয়ার সংঘর্ষে, এই 'পবমানতা'য় তবু কিছুটা অন্ধকার পাত্‌লা হয়, আর ওখানে বিনিয়োগের (application-এর) একান্ত অভাবে, শুধু অপরিসীম নিশ্চেষ্টতা, তাই অন্ধকারও অন্তহীন। সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিচার ও আচারের সম্মিলনের উপর ('উভয়ং সহ') এত জোর দেওয়া হ'য়েছে। শুধু এই 'সাহিত্য' বা সম্মিলনের দ্বারাই 'মৃত্যুং তীর্ত্বা···অমৃতমশ্নুতে'। নতুবা মৃত্যুর অন্ধকারেই আবর্ত্তন।

আমরা এতক্ষণ জপকর্ম্মের আধাররূপে যে জপ 'বিদ্যা' বা 'বিজ্ঞান' প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অর্থাৎ জপকর্ম্মের মূলে (backgroundএ) যে মহাবিজ্ঞান বর্তমান, তা'কে উদ্ঘাটন করার প্রয়াস করিয়াছি। জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তত্ত্বসম্বন্ধী (Theory) আধার আবশ্যক বটে, কিন্তু বেশী আবশ্যক একটা practical background অথবা 'frame' (নিরূপিত ক্ষেত্র)—সে সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) জপসিদ্ধির এবং জপক্রিয়ার মূলই হইল শ্রীগুরুশক্তি। ভগবান্ তাঁর সৃষ্টিতে 'অনুপ্রবিষ্ট' হ'য়েছেন মুখ্যতঃ পাঁচটি ধারায়। এই গ্রন্থে তাদের 'পঞ্চগঙ্গা' সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়েছে। এদের নাম (তাৎপর্য্য মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য) সংগ্রহাখ্যা, প্রতিগ্রহাখ্যা, বিগ্রহাখ্যা, পরিগ্রহাখ্যা এবং অনুগ্রহাখ্যা। এই চরম ও পরম ধারাটিই গুরুশক্তি। উপোদ্ঘাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে—শ্রীগুরু শ্রীভগবানের মূল পঞ্চাবতার এবং প্রণবের পঞ্চতত্ত্বের একাধারে সম্মিলিত মূর্ত্তি ইত্যাদি। এই গুরুশক্তিই শলাকার মতো প্রবিষ্ট হ'য়ে এই অশুদ্ধ, মলিন, আবিল 'কোষ'গুলোকে ক্রমশঃ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, ভাস্বর করে তোলেন—এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। সেইজন্য এই গুরুশক্তিকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করাই সাধকের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এখানে একটি জিনিষ বিশেষ সহায়ক হ'য়ে থাকে ; জপারম্ভে হৃদয়ে, ললাটে অথবা 'শিরসি' শ্রীভগবানের শাশ্বতী ও সর্ব্বগা অনুগ্রহশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুর ধ্যান। এর ফলে আমরা কারবারী, 'কাঠামো'টা ছেড়ে একটা নব কলেবর যেন লাভ করি।

এরই নাম শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ অভিনব সাধনদেহে 'ভূমিষ্ঠ' হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন এই ব্যবহারিক ভোগদেহের thought elimination বা বোধ দূরীকরণ এবং উক্ত সমর্থ গুরুকৃপাজন্য, শুদ্ধ সাধনদেহলাভের auto-suggestion. ইহা দ্বারা apparatusটি, যন্ত্রটি "in tune" (শ্রদ্ধধান) হইয়া থাকে। যন্ত্রটি এইরূপ সুরে বাঁধা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'resonance effect'গুলি বা অনুরণনগুলি হ'বার বিশেষ সুবিধা হয়। গুরুশক্তিরূপে শঙ্করধারায় যে 'মূলস্পন্দ', তার সঙ্গে বৈরূপ্যই হইল মল, অশুদ্ধি দোষ, কার্পণ্য, 'অপরাধ' (পরা নয়, কিন্তু অপরাতে যে 'ধূনন' বা স্পন্দন তাই হইল অপরাধ)। এই বৈরূপ্য-বশতঃই সঙ্কর ধারা। ইহা হইতে শঙ্কর ধারায় ফিরিবার উপায় 'মূল' এর সঙ্গে অনুরূপতা সাধন। গুণী সুরশিল্পীর সঙ্গে সুরসাধককে যেমনটি করিতে হয়—'গুরু কা সাথ ধ্বনি ফুকারো'। আদৌ 'অনুরূপ', পরে ক্রমে ক্রমে 'প্রতিরূপ', 'একরূপ' এবং 'সমরূপ' বা সরূপ—এইভাবে পাদ-মাত্রায়, কলায়-কাষ্ঠায় পরমে পৌছিতে হয়।

(খ) পূর্ব্বোক্ত সাধন-দেহলাভের আর একটি প্রক্রিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যাদিতে দেখা যায়। সেটিও বিশেষ সহায়ক হয়—যথা, বীজজপ দ্বারা প্রাণায়ামপূর্ব্বক এই পাপ্মাবিদ্ধ দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়; অমৃতময় নব কলেবর ধারণের suggestion দিতে হয়। ইহাই সাধারণতঃ 'ভূতশুদ্ধি' নামে পরিচিত। গোড়ায় এটি 'অভ্যারোপ' (pointed suggestion) মাত্র বটে, কিন্তু অভ্যাসের দৃঢ়তায় এবং ভাবের গাঢ়তায় ইহা হয় 'অভ্যারোহ' (An actual Ascent towards the Supreme Object)। জপসূত্রে দেখান হইয়াছে যে এই অভ্যারোহ কর্ম্মটি কৃচ্ছ্রোদয়, অভ্যুদয়, মহোদয়—এইরূপে সোপানে সোপানে পরমের পানে অগ্রসর হয়। পরমে উপনীত হইলে আর 'উদয়' নয়—নিত্যোদিত। সে যাই হোক, এখানে মনে রাখা কর্তব্য যে 'দহন' ক্রিয়াটির আগে 'শোষণ' ক্রিয়াটি অবশ্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আর্দ্র ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ করিয়া কোনো ফল লাভ হইবে না, কেবল ধূমেই আকুল হইতে হইবে। পাতঞ্জল দর্শনেও তাই প্রথমে 'ক্লেশ' গুলোকে 'তনূকরণ' করতে উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। পরে হয় 'সমাধিভাবন'।

(গ) অনেক সময় কোনো বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাময় প্রতীক বা প্রতিকৃতি ভাবের উদ্বোধনে সহায়ক হয়। যেমন ধর কোন Symbol Picture :—সপ্ত-বর্ণালী-

চক্র-বেষ্টিত এক মহান্ কেন্দ্রজ্যোতিঃ। নিম্নে এক শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছে; তন্মধ্য হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া উক্ত সপ্তচক্র ভেদ করিয়া অন্তর্জ্যোতিতে মিলিতে চাহিতেছে। প্রতীকের রহস্য স্পষ্ট—the flame of the Soul's Aspiration leaping up to— . জপাদিকালে আপন কারবারি সত্তা ভুলিয়া এইটি ধারণা করা আবশ্যক। অন্নের আকুতি ও সন্ধানের সমাপ্তি ভূমায়। পার্ব্বত্য তটিনীর নদীনাথে। জীবের এটি মূল Aspiration Pattern (আকুতি-রূপ) —বহু অনিয়ত আসঙ্গের মধ্যে।

এইরকম সব জপাদি কর্ম্মের practical আধার মেলান আবশ্যক। উপরে (ক), (খ), ও (গ)—এই তিনভাবে জপকর্ম্মের তিনটি আধার দেখান হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ তিনটি নমুনা মাত্র। Practical আধার অনেকভাবেই "পরিকল্পিত" হইতে পারে এবং কার্য্যতঃ হইয়াও থাকে। সর্ব্বক্ষেত্রেই পাঁচটি মূল সূত্র লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়:—

১। মিত্রচ্ছন্দে জপক্রিয়ার ফলে সাধকের "শক্তিপিণ্ড" (Power field) এ গাঢ়তা, নিবিড়তা আসিবে। ২। ফলে, যেটি গোড়ায় চপল, বিক্ষিপ্ত, বহুমুখ, সেটি এককেন্দ্রে সংহত হইবে এবং তাতে স্থৈর্য্য আসিবে। সাধক তখন "ধীর" হইবেন। ৩। সেই প্রস্তুত সংহতিটি রক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত তার চারিধারে একটা দৃঢ় "শক্তিকবচ" (a belt or barrage of protective vibrations, a sort of "potential field") তৈয়ারী হইবে। ইহাই "ভূতাপসারণ" ও দিগাদিবন্ধন। ৪। কেন্দ্রে ঘনীভাবের ফলে স্পন্দনের স্থূলরূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইবে; ফলে "অতিগস্পন্দন" (super-sonic) সৃষ্ট হইয়া সাধকের যন্ত্রটাকেই "সমর্থ" রূপের অনুরূপ করিয়া লইবে। এইবার সাধক "বীর"। অতিস্পন্দনগুলিই, বিশেষভাবে, অরি অথবা উদাসীনকে মিত্র করিবার পক্ষে ক্ষম। Transformation এবং Sublimation ব্যাপারটি এই অতিসূক্ষ্ম পর্য্যায়ের স্পন্দন এবং স্পন্দের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। জড়ের ক্ষেত্রেও তাই দেখি। ৫। সুতরাং, এর ফলে, স্থূল, বৈখরী জপ "মধ্যমার সেতু" অতিক্রম করিয়া পশ্যন্তী ও পরায় জ্যোতিঃ এবং আনন্দে পৌছিবে। প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দের শুদ্ধ (positive phase) ভাবগুলি গ্রথিত করিয়া এই মহোদয়টি ঘটিয়া থাকে! জপ ধ্যানাদি কর্ম্ম তার উপযোগী আধার (বিদ্যা বা বিজ্ঞান ছাড়া practical আধারের কথা বলিতেছি) না পাইলে "সমর্থ"

হয়না। এখন, এবম্বিধ আধারের একটা সুসম্বদ্ধ পরিচয় নীচের নক্সায় পাওয়া যাইবে মনে হয় :—

জপের "করণ"
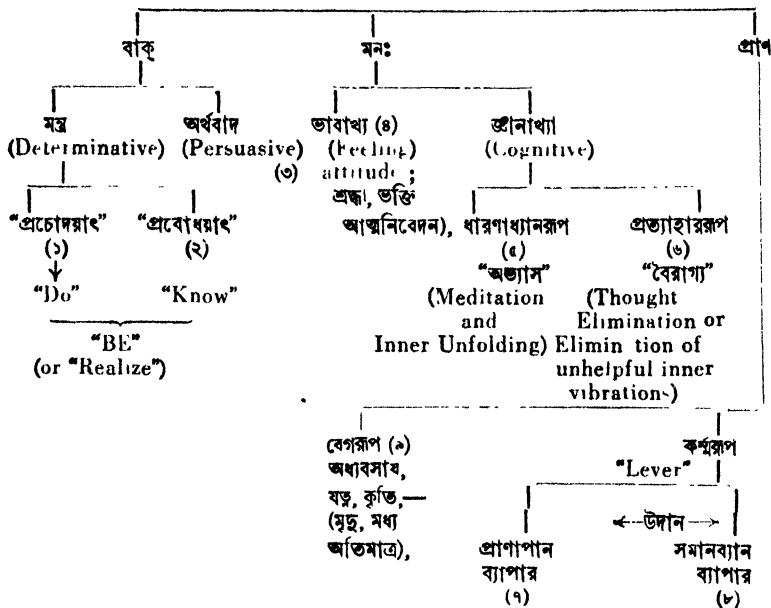
[দ্রষ্টব্য :—পূর্বে যে তিনটি নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তার ভিতর (ক) ও (গ) মুখ্যতঃ (৪), (৫), (৬) এর পর্বে পড়ে ; (খ) পড়ে মুখ্যতঃ (৭), (৮) এবং (৫), (৬) এ।]

জপের আধার "নির্মাণে" এই "জপকরণসম্পাত"টি মনে রাখিয়াই করিতে হয়। শাস্ত্র, আচার্য্য এবং গুরুবর্গ তাহাই ভাবিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইষ্টমন্ত্র জপারম্ভে বাক্, মনঃ এবং প্রাণ—এই ত্রিবিধ করণের পূর্ব্বোক্ত সম্পাত ("collaboration") সম্বন্ধী একটা "উপযোগ" (appropriate field) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। যেমন, বৈদিক সন্ধ্যায় মুখ্যকর্ম গায়ত্রীজপ ; আচমন, আপোমার্জ্জন, প্রাণায়ামাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়া দ্বারা তার উপযোগ তৈয়ারী হয়। সংক্ষেপতঃ শুদ্ধি, ঋদ্ধি ও বুদ্ধি—এই তিনের সম্মিলনে উপযোগটি তৈয়ারী হয়। যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীর "অনুগ্রহ"। বিদ্যা দ্বারা শুদ্ধি, শ্রদ্ধা দ্বারা ঋদ্ধি এবং "উপনিষৎ" বা রহস্যজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে লাভ

করিতে হয়। "বিদ্যা" বলিতে কেবল theoretical দিক্‌টা বুঝিলে চলিবে না; practical দিক্‌টাই বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। সুতরাং পাইতেছি—right (and enlightened) procedure, right attitude or disposition, and right understanding and intuition.

উপরে অঙ্কিত আধারের (১) এবং (২) এর দৃষ্টান্ত যথাক্রমে :—

(১) "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি ·····" ইত্যাদি উপনিষদের শান্তিপাঠ; "অসতো মা সদ্গময়······" ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র।

(২) "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং······" ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত্র। "আবিরাবীর্ম এধি······" ইত্যাদি।

(৩) স্তবস্তুতি বন্দনাদি।

(৪) Right Feeling-attitudeটি বজায় থাকা আবশ্যক। যেহেতু, feeling হইতেছে এই apparatusএর "tuning" factor. ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে ছন্দোনিমিত্ত বাধা দূর হয়। ভাবের দ্বারাই "ছন্দোগ" হয়।

(৫) (৬) অভ্যাস ও বৈরাগ্য (যথোক্ত অর্থে) আবশ্যক। যেহেতু, তদ্দ্বারা বিশেষভাবে "যন্ত্রের" দেশ-কাল-বস্তুনিমিত্ত বাধা দূর হ'বার সহায়তা হয়।

(৭) এবং (৮)—প্রাণের দুটি মুখ্য ব্যাপার। উদান-বৃত্তির দ্বারা leverএর মতো দুইয়ের সহায়তা করিতে হয়। (প্রাণায়াম, ন্যাসাদি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি এর অন্তর্গত)।,,

(৮)—প্রাণ as Driving force—জপাদিকর্ম্মে এই বেগাখ্যশক্তিটি মৃদু, মধ্য হইলে সমর্থ আধারের উপযোগ ঘটিতে বিলম্ব হয়। Auto-suggestion, এই সমগ্র করণসম্পাতের সঙ্ঘাতফলে হইলে মহাবীর্য্য হয়। সঙ্কল্পশক্তির সমৃদ্ধি ঘটিলে কুণ্ডলিনীর জাগৃতি হয়, এবং জাগৃতি একটা ভূমিতে পৌঁছিলে মহা-কুণ্ডলিনীর সত্য ও অমোঘ সঙ্কল্পশক্তির ধারায় অবগাহন করে। তখন প্রাণ আর ব্যক্তি বা individual ভাবে নয়, অখণ্ড সমগ্র ভাবে—"প্রাণব্রহ্ম"রূপে ক্রিয়াশীল হয়। সৃষ্টির অবসানে বা লয়ে মহাকুণ্ডলিনীর "নিদ্রা" (যোগনিদ্রা) কল্পিত হয় বটে, কিন্তু যেহেতু এটি শক্তিরূপিণী, সুতরাং স্বরূপে ইহার নিত্যোদিত বা অব্যয় ভাবটি আছেই; সুতরাং "মূলস্পন্দ" ও (Basic Harmony Structure and Function) আছে; সাধককে জপাদিসাধন দ্বারা আপন

প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করিয়া উক্ত মূলস্পন্দের সঙ্গে আদৌ অনুরূপতা এবং পরিণামে সমরূপতা ঘটাইতে হয়। ক্রিয়াদ্বারা স্পন্দনটি বত্মর্গ বা অধ্বগ, ভাবদ্বারা ছন্দোগ, এবং জ্ঞানদ্বারা ধামগ হইয়া থাকে। এ তিনকে যথাক্রমে নামগ, কামগ ও ধামগও বলিতে পারি।

সঙ্ঘাতফলের কথায় আর একটি প্রসঙ্গ মনে জাগিতেছে—জপধ্যানাদির "একান্ত" ফল আর "সঙ্ঘ" ফল (Congregational)। একান্তসাধনাই সাধারণতঃ প্রশস্ত বটে, তবু দেশ (যথা, তীর্থাদি), কাল (যথা, যোগাদি), পাত্র বা বস্তু (যথা, দেবতাবিগ্রহ, গুরু অথবা অপর মহাপুরুষ-সান্নিধ্য) এবং ছন্দঃ (যথা, ভাবের, বুদ্ধির ও কর্ম্মের সমতানতা)—এই চারের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সঙ্ঘকর্ম্ম বিশেষভাবে ফলপ্রদ। তা'তে Resonance Effect multiplied হ'বার সুযোগ পায়। Minor ছাড়া major discordance factors অধিক থাকিলে resonanceএর বদলে interference effects গুলিই বেশী হইতে পারে। মূল কথা—Total effectটি "বিষম" না হইয়া "সুষম" হওয়া প্রয়োজন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনরসেও বাধা হইয়াছিল বহির্ভাগে কোনো বহিরঙ্গ ব্যক্তি ছিল বলিয়া। Symphony বা Synthesis of the elements of Harmonyর জন্য এত mathematically precise conditions আবশ্যক হয়।

* * * *

(৫)

এখন জপ সম্বন্ধে practical problem—জপ "সমর্থ" হইবে কি প্রকারে? অর্থাৎ জপ কি প্রকারে পূর্ব্বালোচিত আধারের অন্নময়, প্রাণময়াদির শুদ্ধ (পূরক, +) ভাগগুলিকে অশুদ্ধ, মলিন (হরক,—) ভাগগুলির "আক্ষেপাদি" হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সংযুক্ত, সক্রিয়, একতান করিয়া দিবে? অথবা, এক কথায় কি করিয়া অধোমুখ, তির্য্যক্, রজস্তমোবিশাল, সঙ্কর স্রোতটাকে ঊর্দ্ধমুখ, সত্ত্ববিশাল, ঋজু শঙ্করধারায় পরিণত করিবে? অর্থাৎ মূল প্রশ্ন এই—কে বা কিসে বুদ্ধিকে ভাবরূপ ও বোধ (অথবা জ্ঞান) রূপে কুণ্ঠা-কার্পণ্য-দোষমুক্ত, শুদ্ধ, সুতরাং "যুক্ত" করিবে?

উত্তর—শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তি, জীবের পূর্ব্বালোচিত শুভ বাসনা,

শুভযোগ, শুভাগ্রহ ও শুভসন্ধি—এই চারিটির দ্বারা আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত (সুতরাং ঘনীভূত, মূর্ত্ত) হইয়া গুরুশক্তিরূপে প্রকট হ'ন। তিনি জীবের "প্রথম পুরুষ"টিকে (Surface consciousnessকে) অবলম্বন করিয়া তা'র ক্রিয়াকারকফলাত্মক অথবা পঞ্চকোষাত্মক সঙ্ঘাত (apparatus) এ প্রবিষ্ট হ'ন। প্রথম পুরুষটির শ্রদ্ধার পোষণ করিয়া তা'কে "শ্রদ্ধাবীর্য্য" করেন। "মধ্যমপুরুষ"টি (Sub-conscious এর অধিবাসী) কে মিত্রচ্ছন্দে আপূরণ করার জন্য প্রস্তুত করিয়া ল'ন। "উত্তমপুরুষ"টি (Super এর অধিবাসী)কে প্রসন্নও করেন। অবশ্য প্রথম পুরুষটিকে আবশ্যক ও যথেষ্ট পরিমাণে "সহযোগ" করিতেই হয়। ব্যাপারটা একতরফা হয় না। গুরুই সব করিয়া দিবেন—আমি তো কিছুই নই—এ শরণাগতি ও সমর্পণ একটা passivity মাত্র নয়। সুতরাং গোড়াতেই, "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" হ'বার পূর্ব্বেই, এটা স্বাভাবিক সুস্থ নয়। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য…" শ্রদ্ধাবীর্য্যসহকারে অভ্যাসযোগের পরিপক্বাবস্থাতেই স্বাভাবিক। কারণ, "ধর্ম্ম" যতক্ষণ "সর্ব্ব" না হইয়া "খর্ব্ব", ততক্ষণ তা'র "ত্যাগ" ত্যাগই নয়; ত্যাগের মিথ্যাগর্ব্ব মাত্র।

আচ্ছা, তিনটি পুরুষ গুরুশক্তি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া ত্রিবিধ "বীর্য্য" লাভ করেন। এ বীর্য্যই প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বজ্র হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষ দেন—শ্রদ্ধাবীর্য্য। মধ্যমটি দেন ভাব অথবা সংস্কারবীর্য্য (সংস্কার=state of being regrouped, rearranged, reformed)। উত্তমটি দেন বিদ্যা বা জ্ঞানবীর্য্য। গুরুশক্তি প্রথম পুরুষটিকে "আক্রমণ" করেন সাধারণতঃ এবং বাহ্যতঃ অক্ষর (মন্ত্র) রূপে। অর্থাৎ, জীবের ব্যবহারিক সঙ্ঘাতটি ব্যাবৃত্তি, হরণ, কৃপণ-সঙ্কীর্ণচ্ছন্দে বিন্যস্ত ও অভ্যস্ত। প্রকাশ ও আনন্দের সাগর এবং তার পরিপূর্ণ ঋতচ্ছন্দ ও সত্যচ্ছন্দের সন্ধান সে দিতে অভ্যস্ত নয়। সে-সন্ধান থেকে বঞ্চিত রাখাতেই সে অভ্যস্ত। সাগরের বার্ত্তা ভুলাইয়া খানা, নালা, ডোবার বার্ত্তাতেই সে বাতিকগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রিয়া-কারক-ফলসঙ্ঘাতটিকে সমাবৃত্তি, পূরণ, উদার, শুদ্ধ, মুক্ত, ছন্দে বিন্যস্ত করার ক্রিয়াটি (positive processটি) সুরু করিয়া দেন গুরুদত্ত ক্রিয়া। ইহাই মুখ্যতঃ জপক্রিয়া।

জপকর্ত্তা "normal", "sub" এবং "super" ভেদে ত্রিবিধ। ইহাদেরই আমরা "প্রথম", "মধ্যম" ও "উত্তম" পুরুষ নাম দিয়াছি। এখন, "আটপৌরে"

কর্ত্তাটি হইতেছেন "প্রথম পুরুষ"। গুরু তাঁহাকেই মন্ত্রাক্ষর শোনান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম আর উত্তম পুরুষদ্বয়ের চেতাইবার সঙ্কেতটিও ধরাইয়া দেন। "মধ্যম" পুরুষটি জাগিয়া বৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া দেন—অর্থাৎ subconscious mindএর "আপুরণ"টা জপক্রিয়ার প্রতিকূলে না হইয়া অনুকূলে করিয়া দেন। বিরাট্ সংস্কারভূমির অরিচ্ছন্দ মিত্রচ্ছন্দ হইতে থাকে। ফল্গুরীতিতে—behind the screen—মধ্যম পুরুষের কর্ম্মটি নির্ব্বাহ হইতে থাকে। প্রথম পুরুষ জপ করিলেন, থামিলেন, মধ্যম পুরুষ অলক্ষিতে জপের মালা হাতে করিলেন। জপ-ক্রিয়াটিকে শ্বাসাদি স্বাভাবিক (involuntary) ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া তা'কে "প্রাণন" ব্যাপার করিয়া লইলেন। গোড়াতে যেটি মুখ্যতঃ আয়াসসাধ্য আস্য অথবা বাক্প্রযত্নসৌষ্ঠব, সেটিকে যথাসম্ভব অনায়াস প্রাণপ্রযত্নসৌষ্ঠব করিলেন। এর ভিত্তিতে হয় চিত্ত-(মন ও বুদ্ধি) প্রযত্নসৌষ্ঠব। কাজটা শুধু এই একদিকেই সমাপ্ত হয়না। Super-consciousnessএর planeএ যে উত্তমপুরুষটি রহিয়াছেন, তাঁহারও প্রসারিত হস্ত চাপিয়া ধরার উপায় করিয়া দেন। অর্থাৎ জপক্রিয়ায় Sub, Super, Normal-তিন Planeএই একটা co-ordinated, concerted actionএর সম্ভাবনাটি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টভাবে স্পষ্ট হয়। সমর্থ বৈখরীজপে গুরুশক্তিসহায়, শ্রদ্ধাবান্ প্রথম পুরুষ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত, অভ্যাসপরায়ণ। তাঁর নিষ্ঠাতপস্যায় "ভূঃ" এবং "স্বঃ" এই দুই লোকের "তাড়িতশক্তি" যেন আকৃষ্ট, ঘনীভূত হইতে থাকে। মধ্যমটি প্রস্তুত হ'ন; উত্তমটি প্রসন্ন হ'ন। তিনের "অবস্থা" একটা সীমায় আসিলেই তিন বজ্রের একত্র মিলন।

[দ্রষ্টব্য :—(১) প্রথম পুরুষ—"পশু"⟶ মধ্যম পুরুষ—"বীর"⟶ উত্তম পুরুষ—"দিব্য"⟶সম্মিলিত পুরুষ ত্রিপুটী। (২) জাপক=প্রথম পুরুষ; জপয়িতা (গুরু)=মধ্যমপুরুষ, জপ্য (মন্ত্র)=উত্তমপুরুষ। (৩) তন্ত্র (সমর্থ-ক্রিয়া) =প্রথমপুরুষ; যন্ত্র=মধ্যমপুরুষ; মন্ত্র=উত্তমপুরুষ। এই প্রকার বিভিন্নরূপে "পুরুষ" তিনটিকে মিলাইতে না পারিলে, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই পুরুষোত্তমে মিলিত হওয়া যায় না।

উক্ত বীর্য্যত্রয়সহকৃত হইয়া জপক্রিয়াটি যতই চলিতে থাকে, "বর্ত্তমান "কারবারী" যন্ত্রের বা apparatusএর system of veilers and inhibitors, আবরক ও অবরোধক "ছাঁচ"টি, সেই পরিমাণে স্বতঃসিদ্ধ, বিপুল প্রকাশ

আনন্দ এবং তা'র পরিপূর্ণ ঋতসত্য ছন্দের releasing and revealing systemএ, উন্মোচক ও প্রকাশক ছাঁচে, transformed বা রূপান্তরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা যন্ত্রশুদ্ধি, যন্ত্রের দ্বারা তন্ত্রশুদ্ধি, তন্ত্রশুদ্ধি দ্বারা পুনশ্চ মন্ত্রশুদ্ধি—এইভাবে vicious নয়, "virtuous" circle, ধর্ম্মচক্র চলিতে থাকে। এই ক্রিয়াটি পূর্ব্বোক্ত "তিনলোক" এবং তাদের অধিবাসী পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষকেই টানিয়া লইয়া চলিতে থাকে।

এইরূপে ক্রিয়াটি উত্তরোত্তর পূর্ণতর ও শুদ্ধতর "ভাবরূপ" ও জ্ঞানরূপে" উদ্ভূত হইতে থাকে। ক্রিয়া, ভাব ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হয়; ভাব, ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপে; জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভাবরূপে। যেটা "অসৎ" তাকে "সৎ" করিয়া উদ্ভূত হয়না, বস্তুতঃ যেটি সৎ তা'কে release, reveal, recognise, reaffirm করিয়াই উদ্ভূত হয়। ক্রিয়া কোনোরূপে উদ্ভূত হইতে গেলে তার "প্রাঞ্চি" (পূর্ব্ব) ও "প্রত্যঞ্চি" (উত্তর) কতকগুলি রূপ হইয়া থাকে।

ধর, কোনো জপক্রিয়া ভাবরূপে ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হইবে। "একলাফে"ই তা' হয়না। কর্ম্মটি অবশ্য "লাফে লাফে"ই হয় (in definite quanta of energy), তবু লাফ মারিতে হয় অনেকগুলি। কর্ম্মটি যেমন যেমন একটা একটা শক্তির critical value reach করিতেছে, তখনি এক একটা "লাফ"। এক একটা sudden change বা transformationএর মতন একটা কিছু। বীজ অঙ্কুরিত হ'বার সময় যেমন। বালক age of pubertyতে আসিলে যেমন—ইত্যাদি। এইরকম "লাফ" প্রকৃতির নিয়মেই চলে বলিয়া না রক্ষা! নহিলে বিন্দু বিন্দু করিয়া কে সিন্ধুকে আহরণ করিবে?

নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু সময় বিন্দু আহরণ (যথা, বৈখরী জপ) চালাইবার পর দেখি বিন্দু আহরণকারীর ভিতরে "কুম্ভযোনি" অগস্ত্য "ভূমিষ্ঠ" হইতেছেন, (পূর্ব্বোক্ত প্রথম+মধ্যম+উত্তম বীর্য্যসমন্বিত "বজ্র") যিনি এইবার গণ্ডূষেই সিন্ধু আত্মসাৎ করিবেন! কর্ম্মটি আসলে যে release করা, ঢাক্‌না সরাইয়া লওয়া! 'হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'। কাজেই ঠিক point টা reach করার আগে পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু বোঝবার জো নেই। ভাদ্রের জমাট্ থম্‌থমে মেঘ। গুরুগুরু ডাকিতেছে, বর্ষণ কই? হঠাৎ একেবারে কড়্ কড়্ কড়্। তারপর ঝম্‌ঝম্ ঝম্। ঋগ্বেদাদিতে এই কাহিনী কতরকমে না শোনান হইয়াছে!

জপের বৈখরী ও মধ্যমায় প্রাপ্তি বা পূর্ব্বরূপগুলো, পশ্যন্তী ও পরায় প্রত্যক্তি বা উত্তররূপগুলো "উদ্ভূত" হইতে থাকে। প্রত্যেকটাতে আবার চারিটি করিয়া পাদ।

Mechanics এ যেমন কোনো load (ভার) কে (১) এমনি drag করা; (২) কোনো smooth frame এর উপর drag করা; (৩) pulley দ্বারা; (৪) lever ব্যবহার করিয়া; (৫) inclined plane বানাইয়া (যথা ঈজিপ্টে পিরামিড্ নির্ম্মাণে); এবং (৬) load টাকে resolve (বিশীর্ণ) করিয়া—এই সমস্ত উপায়ে "আয়ত্ত" করিতে হয়, জপ-ক্রিয়াতেও resistance systemকে অনুরূপভাবে জয় করিতে হয়। জপের প্রথমটায় (১) ও (২) দ্বারা জপক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব সহজ অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। তখন জপ প্রায় mechanical (যান্ত্রিক)। (৩) এবং (৪) উপায়ে প্রাণ ও মন উপযুক্তরূপে সক্রিয় সহায় হয়। (৫) এ, অর্থাৎ plane এর তফাৎ করিয়া দিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় সত্তা সহায় হয়। আর (৬) এ আনন্দ বা উজ্জ্বল রস load, আয়াস বা সমগ্র resistance টাকেই finally resolve ("গলিতকষায়") করিয়া দেয়। (৫) হইতেই resolution এর আরম্ভ (তখন "মুদিতকষায়")। অবিপককষায়ে "কুযোগী"।

অতএব, জপ চালাও। অভ্যাস যা'তে ধীর, সুস্থ, শ্বাসক্রিয়ার মত সহজ, সরল হয়, তার যত্ন কর। প্রাণের pulley আর অন্তরের lever খাটাও। বুদ্ধি-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বিচার, মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রিয়ার plane বদলাও, যাতে সে ভাব ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রেমে ও আনন্দে পৌঁছাও—তখন সর্ব্ববাধা-বিনির্ম্মুক্ত অপ্রাকৃত-অমায়িক স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক উল্লাস ও প্রকাশ।

জপ-সাধন কেবল ও সহিত ভেদে দ্বিবিধ।

অনেক মহাপুরুষ কেবল নিষ্ঠা-পূর্ব্বক (কর্ম্মনিষ্ঠা এবং ভাবনিষ্ঠা পূর্ব্বক) জপক্রিয়াতেই উত্তরোত্তর এ ভূমিগুলো লাভ করিয়াছেন। নাম বা জপই কেবল আশ্রয়। 'হরের্নামৈব কেবলম্' অথবা, শুদ্ধ প্রণব। সব কিছুই ঐ একেই ফুটিয়াছে। Everything else shall be added unto it. ইহা জপসূত্রে আলোচিত "শুশ্রূষা" জপ। শুশ্রূষাটি শ্রবণেচ্ছা এবং সেবা বা সংকার এ দুই অর্থেই। নাম এর যেটি "মর্ম্মবাণী" সেটি শোনার একান্ত সাধ

থাকিলে নামই সে সাধ পূরাইবেন। আর, নাম প্রাণপণে "সেবা" করিলে তিনিই "নামীকে" মিলাইবেন। এই এক অভিন্ন শুশ্রূষা "কাণ্ড" থেকেই বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরস-মাধুরী দুই সাধিষ্ঠ শাখা বাহির হইয়া তৎ-পরমোজ্জ্বলরস-সমাপত্তিরূপ পরম প্রয়োজনটি নির্ব্বাহ করিবে। পূর্ব্ব-শাখার প্রসারে বিবিদিষাজপ এবং বিদ্বজ্জপ, অপর শাখায় বৈধী, রাগানুগা, রাগরূপা। দুটি শাখা একেই এসে মিলিত হয়। এ সবের মূলেই যখন নাম তখন নামকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় কর। "নিরপরাধ" হইয়া আশ্রয় কর। যেটি "অপরা", যেটি "প্রাকৃত" তার অধঃ কিনা অধীন হইলে তো যিনি অধোক্ষজ তাঁকে মিলিবে না! তবে এরূপ একাগ্র শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠা সব আধারে সম্ভবে না। তাই সহিত বা mixed method prescribed (অবলম্বনীয়)। তা'তে জপক্রিয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে স্বয়ংই যেটি করিতে চায় এবং সমর্থ হইলে স্বয়ংই যেটি করিবে, ত'াকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোষের শোধনবোধনাদির অন্যবিধ উপায় (auxiliary means) দ্বারা অনুকূল করিয়া লও। তবে সাবধান! জপক্রিয়াটির co-ordinating, accumulating work টিকে (ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তিসাধনকে) বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ইত্যাদি হইতে দিলে চলিবেনা।

এখন এইটি মনে রাখিয়া বৈখরীজপ অথবা অনুরূপ সাধন ভজন চালাইতে হইবে। অবশ্য জপ-বিদ্যা বা বিজ্ঞান সমর্থ সহায় ও সাধন। শ্রুতিতে ক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যার বা বিজ্ঞানের এত স্তুতি তাই দেখি। পূর্ব্বোক্ত প্রাণের পাঁচটি মুখ্য ঋতচ্ছন্দ, আর পাঁচটি অনুগত ঋতচ্ছন্দের অনুবর্ত্তনে ক্রিয়াটিকে "শুক্লাগতি" পথে চালাইতে হইবে। অনুবৃত্তি হইলে জপই জপকর্ত্তার গুরু, 'গতি, ভর্ত্তা, সহায়, শরণ, সুহৃৎ' হইবে। কেমনা, জপের অক্ষরে যিনি প্রভু, যিনি সাক্ষী, যিনি নিবাস, যিনি "নিধানং বীজমব্যয়ম্", তিনি স্বয়ং সমাসীন।

পরিশেষে এই কয়টি বিষয়ে লক্ষ্য দাও :—

১। প্রথমতঃ জপের "আগমাপায়" এর অনুপাতগত অনুকূল পোষক (positive) সমতা রক্ষার দিকে যত্ন। "প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা"। জপকে প্রাণের একটা উদাসীন ভূমি ("মধ্যে বামনমাসীনং") হইতে নির্গত করিয়া ছন্দঃক্রমে আবার তা'তে লয় করিতে হইবে। শনৈঃ শনৈঃ। পুনঃ পুনঃ। Engineএ যেমন পালাক্রমে vacuum সৃষ্টি করা হয়। অনুপাত সমতা

সাধনের জন্য কখনো আগমে (প্রাণে) অপায়ের (অপানের) "আহুতি" দিতে হয়; কখনো বা বিপরীত ক্রমে। এ সব ধীরভাবে আলোচ্য। ফলে যেন জপক্রিয়ার সমগ্র systemএ আদান-প্রদানগত "সংখ্যাটি", proportional depositটি ধনরাশি হয়।

২। জপক্রিয়ায় নানাদিকে নানা reactionsএর (প্রতিক্রিয়া) ফলে যেসমস্ত transformations, dissipations এবং "running down" (রূপান্তর, আক্ষেপ-বিক্ষেপাদি) হইতে থাকে, তার মাঝে জপক্রিয়ার যেন "উদ্বৃত্ত" (Surplus Credit) থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জপক্রিয়া, জপের আধার ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথা জপ ব্যর্থ বা নষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু তার "ফল" গোচর হইতে বিলম্ব ঘটিবে। জপের reactions (negative, প্রতিকূল) গুলো ক্লান্তি, অবসাদ, প্রমাদ, তন্দ্রা ইত্যাদি রূপে জমাট হইতে থাকিবে। এগুলো তামস reactions; রাজস reactions (unhelpful) ও আছে। চিত্ত-চাঞ্চল্য, রিপুর প্রাবল্য, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—(১)—জপের "স্বর" বা ছন্দোগ ক্রিয়া এবং ভাষা যত বলিষ্ঠ, সক্রিয় হইতে থাকে, জপকর্ত্তার System (সঙ্ঘাত) এর এবং তার Environment (পারি-পার্শ্বিকের) এর অ-স্বর ভাবগুলোও তত প্রবল আকারে "উত্থিত" হইতে থাকে। কেন না, Nature (প্রকৃতিতে) এর একটা general stirring up (আলোড়ন) তাহাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের ফলে "aggravation" এর মতো অবস্থাও আসে। প্রকৃতির প্রবৃত্তি ধারায় যারা কায়েমি স্বত্বে ভোগদখলিকার তাদের উচ্ছেদ সহজে হয় না। স্বরাস্বর সংগ্রাম তাই সাধনসমরের আসল কথা। রক্তবীজের ঝাড় সব! জিহ্বায় রাখিয়া তবে সংহার—অর্থাৎ সমর্থ জপাস্ত্র দ্বারা।

দ্রষ্টব্য (২):—তেমনি অপরদিকে, মধুচ্ছন্দে মন্ত্রজপের ফলে সকল অন্তঃ-কোষগুলিই যে মধুচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইতে থাকে, concordant elements গুলো সংহত, আর discordant গুলো বিচ্যুত হইয়া,—তাহা বুঝিতে পারা যায় অনেক চিহ্ন ও নিদর্শন দ্বারা। যথা—সদৃশ উদ্ভূত নানাবিধ মধুর ও গভীর ছন্দোবদ্ধ আন্তর-ধ্বনি শ্রুতি দ্বারা। বিসদৃশ উদ্ভূত নানাবিধ বিচিত্র অপরূপ,

সুন্দর রূপ ও বর্ণময় মানস প্রত্যক্ষে (Visionএ)। এই উদ্ভূত আন্তর ধ্বনি, রূপ, বর্ণ, গন্ধাদি এতই অপরূপ ও সজীব (live and vivid) যে, তা'দিগকে কোনো বাহ্য প্রত্যক্ষাদির নকল (images) কিছুতেই মনে করা যায় না। বরং তারা কোনো "অপ্রাকৃত ধাম", upper world of eternal freshness and pristine purity থেকে আমাদের কারবারি এই "ধূসর লোকে" projection ("প্রক্ষেপ") বলিয়াই মনে হয়।

৩। জপক্রিয়ার সমাহার, সঙ্গতি, সমন্বয় আবশ্যক। বৈখরী ও মধ্যমায় এ কাজটি অনেকটা "যন্ত্রে তন্ত্রেই" চলে। শ্রদ্ধাবীর্য্য সহকারে দীর্ঘকাল নিরন্তর সংকারাসেবিত বিধিপালন দ্বারা। কিন্তু কাজটি বুদ্ধিপূর্ব্বক ও আনন্দসিক্ত (শুদ্ধ বিজ্ঞান ও আনন্দ কোষের অনুগ্রহযুক্ত) না হওয়া পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ তুষ্টি নেই, পুষ্টি নেই। [Realisation and Satisfactionএর ভূমি আনন্দ —এটা মনে রাখিতে হইবে। সৎ, চিৎ, আনন্দ তিনে এক হইলেও আনন্দকে বলিতে পার the core, the inmost "হৃৎ" সত্তা। "জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং"—সৎ চিৎ আনন্দকে লাভ করা। সাধন-জীবনে এই ক্রমটি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়: তা'কে অস্তিরূপে জানিলাম, ভাতিরূপেও দেখিলাম; তবু যেন একটা "ফাঁকা" রহিয়া গেল। প্রিয়ং বা রসরূপে তা'তে প্রবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা নেই। অনেক সময়, এই শেষ গ্রন্থিটি পেরুতে দেরী হইয়া থাকে। জীবনে কৃষ্টি আসিল; দৃষ্টিও ফুটিল; তবু তুষ্টি নেই। তার প্রতীক্ষায় কৃষ্টি দৃষ্টিকে আরও উদার ও অগ্র্যা হইতে হয়। শেষকালে, এমন একটা কি আসে, যাতে সব কিছুর পরিপূর্ণতা, সমাপ্তি হয়।] তবে কোন গতিকে মধ্যম পুরুষটিকে প্রস্তুত করিয়া মধ্যমার সেতু পার করাইতে পারিলে, মুখ্যপ্রাণের আপন সমাহার, সমাবৃত্তি ছন্দে জপক্রিয়া আপতিত হইল। তখন তার সমাহার ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অনায়াস, সহজ ও স্বাভাবিক। জপক্রিয়া এইভাবে সমাহৃত, সুসম্মত, সুসম্বদ্ধ হইলে একটা মহাবীর্য্য harmony (ছন্দঃ) সৃষ্টি করে। সে হয় সুরব্রহ্ম বা ছন্দোব্রহ্ম। জপসূত্রের "আধিকারিক" কল্পটি।

৪। শেষকালে জপক্রিয়ার সিদ্ধিতে ধৈর্য্য আর বীর্য্য প্রকাশ আর আনন্দের এমন একটা Permanent Solvencyর ভূমি, "অচ্যুতপদ" মেঝে, যেখানে থেকে ঐ নিরন্তর হরণ বা "running down" processএর ফলে

আর কাঁচিয়া insolvencyতে পড়ার 'ভয়' থাকেনা। জপস্থত্রের "আনপায়িক" কল্প।

দ্রষ্টব্য (৩):—জপের "ফল" গুলো অমর কিন্তু তা'রা সাধারণতঃ জমা হয়, প্রথম পুরুষের কারবারি ব্যাঙ্কে নয়, মধ্যম পুরুষের গোপন Reserve Bankএ। জমা ঠিক ঠিক হইতে থাকিলে বেশ "চক্রবৃদ্ধি"তে স্থদও জমে আসলের সাথে। কিন্তু সে ব্যাঙ্কের "পাশ বই" প্রথম পুরুষ প্রথম প্রথম দেখতেই পা'ন না। ভাবেন সবই বুঝি "জলে পড়িতেছে।" যেন আপন ঘরের আপন কারবারের সব খবরই তাঁর নখদর্পণে! শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখিয়া জপ-ক্রিয়া চলিলে—"পাশ বই" কখনো কখনো দেখিতেও পাওয়া যায়—স্বপ্ন-রূপে, অনিচ্ছাজপে (সাক্ষাৎ ক্রিয়ারূপেই); তা' ছাড়া নানাবিধ অভূতপূর্ব্ব, অসাধারণ ভাবরূপে ও দর্শনরূপেও। তখন বোঝা যায়, জপফল শুধু জমা হইতেছে এমন নয়, বেশ মোটাহারে স্থদও দিতেছে। স্থদ = Resonance Effect. তবে জপকর্ত্তার "overdraft" না করার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইতে হইবে।

৫। সর্ব্ববিধ সমর্থ জপক্রিয়ার একটা "অবসান" ভূমিও আছে। সমর্থ জপ "মহান্ আত্মা" এবং তাঁকে "যচ্ছেৎ" পর্য্যন্ত। তারপর "শান্ত আত্মনি" সব ঠাণ্ডা! এ "শান্ত" বৈষ্ণবাদি রসশাস্ত্র শান্তদাস্যাদি বলিয়া যা'কে গোড়ায় ফেলিয়াছেন, সে শান্ত নয়। শুদ্ধ ক্রিয়া, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ ভাবের অভেদ পরাকাষ্ঠায় যে "মহামৌন"—তাই। এখানে না আসা পর্য্যন্ত মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিবেন না। কঠশ্রুতির ঐ প্রসিদ্ধ সাধনটিকে যে কেবল "জ্ঞানমার্গী"র সাধন ভাবিয়াছে, ত'ার—সেই শ্রুতির ভাষায়—"শির" (মূর্দ্ধা) "পতিত" হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

কেহ মনে করিতে পারেন—জপের যখন ভাব (feeling-attitude) এবং জ্ঞান (consciousness of the meaning) রূপটাই "আসল" এবং সেইটাই যখন লক্ষ্য (end), তখন কেবল জপক্রিয়ায় (সংখ্যাদির নিয়ম রাখিয়া বাচিকাদি জপে) জোর দেওয়ার কি আবশ্যক? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এবং পূর্ব্বে বলাও হইয়াছে—যে ক্রিয়া, ভাব এবং জ্ঞান (বাক্ প্রাণ ও মন যাদের নির্ব্বাহয়িতা)—এ তিনে মিলিয়া এক অবিভাজ্য ত্রিপুটী। এরা বস্তুতঃ এবং কার্য্যতঃ পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। একের সঙ্গে অপরের উদয়,

লয়, স্থিতির ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক বিদ্যমান (organic relationship)। যেমন-ধারা বৃক্ষের "সফলতা" শাখাতে হইলেও কাণ্ড ব্যতীত সে সফলতার সম্ভাবনাই থাকে না, তেমনি যথার্থ ভাব এবং জ্ঞানে জপের পরিণতি হইতে হইলে, জপক্রিয়ারূপ শুশ্রূষা কাণ্ডটিকে আশ্রয় করিতেই হয়। ভাব ও জ্ঞানের পরিপক দশায় "ক্রিয়া"টি (ব্যক্ত স্পন্দনরূপে) মিলাইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অব্যক্তস্পন্দন (অর্থাৎ স্পন্দ, সুতরাং "কর্ম্ম") রূপে সেটি থাকে। পূর্ব্বোক্ত "শান্ত আত্মনি" অথবা "মহাভাবে" "যচ্ছেৎ" (পূর্ণাহুতি) না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। তার নীচের, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ভূমিগুলিতে, জপক্রিয়াটি জোর করিয়া থামাইতে গেলে, ফল শুভ হয় না, পূর্ব্বে যে সফলতার কথা বলা হইল, সেইটিই ব্যাহত হইয়া পড়ে। কেননা, ভাব এবং জ্ঞান দুইই তাদের "বাস্তবী তনু" (real form and character) লাভ করে, একটা সুবিন্যস্ত, সুগঠিত ক্রিয়ার কাঠামোতেই। স্পন্দনাদির অনুরূপতা এবং অনুরণনের (resonance effect) সমঞ্জস-সমুচ্চয় (harmony integration) উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ কাঠামো (যেটি স্থায়ী ভাবের উদ্দীপক এবং অকুণ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষক) তৈয়ারী হইবে না। এ নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক (শ্রদ্ধাবীর্য্য এবং ধৃতি সহকারে) জপক্রিয়াটি চালাইতে হইবেই। গোড়া থেকেই "কৈ ভাব"? "কৈ জ্ঞান" ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে ক্রিয়াটি ছেড়ে দিলে বা তাতে ঢিল দিলে চলবে না। পাখী যেমনধারা তার ডিমে তা দিয়ে যায় তেমনি ক'রে মিত্রচ্ছন্দ আশ্রয়ে অরিচ্ছন্দ ত্যাগে "জপাক্ষরে" "তা" দিয়ে যেতে হবে। তাতে সাধারণ "মৃত" অক্ষরবুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। পাখী তার ডিমটাকে একটা "জড়পিণ্ড" ভাবলে তা দিয়ে যেত কি? সঙ্গে সঙ্গে ভাবের "তাপ" এবং জ্ঞানের "আলো" যতটা যোগাতে পার ভালই। কিন্তু তা করতে যেয়ে গোড়াকার আসল কাজটায় (ঐ "তা" দিয়ে যাওয়ায়) যেন শৈথিল্য, বিচ্যুতি না ঘটে। Dissipation, defraction (আক্ষেপ-বিক্ষেপাদি) প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্জ্জনীয়। বিচ্যুতি ঘটলে—ভাবের আমেজ একটু আধটু এলেও তা "উপে" যাবে, প্রকাশের ছটা একটু খানি ফুটলেও আবার ঢেকে মিলিয়ে যাবে। যোগ এবং ক্ষেত্রের উপযুক্ত কাঠামোটি না পেলে ভাব তার চপলতা, তরলতা, আবিলতা ছেড়ে, শান্ত, প্রগাঢ় এবং স্বচ্ছ হয় না; জ্ঞানও অবাস্তব কল্পনা-আরোপ সংশয়াদি কাটিয়ে তার উজ্জ্বল নির্ম্মল প্রকাশ লাভ করে না। "কাঁচা"

কাঠামোতে অসমঞ্জস (misfit) ভাব আর জ্ঞান দুই-ই প্রতিক্রিয়া (unhelpful reactions) সৃষ্টি ক'রেও থাকে। সুতরাং জপক্রিয়াটিকে তার স্বাভাবিক ছন্দে ও গতিতে চ'লে ভাবের গভীরতায় এবং প্রকাশের উজ্জ্বলতায় গিয়ে আপনি শান্ত হ'তে দাও। বৈখরী জপকে সহজভাবেই মধ্যমার সেতু পেরিয়ে পশ্যন্তী ও পরায় যেতে দাও। "সেতু" উড়িয়ে দিতে যেও না। ওটা bad strategy, ভুল চা'ল। তাই যদি কর তা হ'লে এক মহাবীর হনুমান ছাড়া আর কে এপার থেকে ওপারে লাফ দিতে ভরসা পাবে? স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকেও যো সো ক'রে একটা সেতু বাঁধতে হ'য়েছিল যে! কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতেও কাঁঠাল ফলতে পারে বটে, কিন্তু সেটা তো সবক্ষেত্রে হয় না, আমজামের গাছেও হয় না। এই জন্য, মালাজপ বা করজপ জোর ক'রে ছেড়না—মালাই তোমায় ছাড়বে সময় হ'লে। "তজ্জপ-স্তদর্থভাবনম্"—মন্ত্রের জপেই তার অর্থ (কিনা বাচ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও জ্ঞান) হাজির হবে। অবশ্য জপকে "সমর্থ" ক'রে নেয়া চাই। সূত্র "ভাবন" (হওয়া) বললেন, "ভাবনা" (ভাবা) বললেন না, লক্ষ্য কর।

৬

উপসংহারে, জপ কর্ম্মের মূল আধারটি আর একবার সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—

মানুষের কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন "স্তর" ব্যেপে মোটামুটি পাঁচটা কোষ (অন্নময়াদি)। প্রত্যেকটা আবার তিন, তিন। পরাগ্‌বৃত্তি (নেগেটিভ্—ভূঃ—পৃথিবী); প্রত্যগ্‌বৃত্তি (পজিটিভ্—স্বঃ—দ্যৌঃ); পরস্পর-ব্যাবর্ত্তক অন্তরাল বৃত্তি (মিডিয়াম্—ভুবঃ—অন্তরীক্ষ)। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য অন্য ব্যাহৃতির মৌলিক বিশ্লেষণ মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সেখানে দেখিবে যে ভূঃ—পৃথিবী এবং স্বঃ—দ্যৌঃ এই সমীকরণ দুটি ব্যাহৃতি-দ্বয়ের অর্থ বিশেষেই করা যায়। সে যাই হোক্, সবগুলোর পজিটিভ্ (+) সংযুক্ত হ'লে অবিচ্ছেদে এক প্রত্যঙ্‌মুখী ধারা (শুক্লা সৃতি); আর সবগুলোর নেগেটিভ্ (−) সংযুক্ত হ'লে পরাঙ্‌মুখী ধারা (কৃষ্ণা সৃতি)। বিশ্বে শুক্লা ও কৃষ্ণা ধারা, পূরণ ও হরণ প্রবাহের পরস্পর মিশ্রণ এবং সঙ্কর (mixture and confusion) ঘটেছে দেখ্‌ছি। তাদের শুদ্ধরূপে পাচ্ছি

না। সর্ব্বত্র এইজন্য (+ −) plus minusএর আকর্ষণ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ মিশে এক "ধূম" ধারা (প্রাকৃত ধারা) প্রবাহিত রেখেছে ("খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ")। সেই ধূম (কুটিল, জটিল গতি সঙ্কর ছন্দঃ) প্রবাহের সঙ্গেই জীবের সাধারণ পরিচয় ও কারবার। দুটি শুদ্ধ ধারার পরস্পর বেধনিমিত্ত যে মলিন সঙ্কর (ধূম) ধারা আর জটিল সঙ্কর ছন্দঃ চলেছে, তাতেই জীব পতিত। এখন, জপের কাজ—অন্নময়ের যেটা শুদ্ধ সাত্ত্বিক "ভাগ," তাতে ক্রিয়া (স্পন্দন) সৃষ্টি করে' সেটাকে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধে (পজিটিভ্এ) পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেকটারই শুদ্ধ, অশুদ্ধ দুটো দিক্ আছে, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের ও আনন্দের শুদ্ধ (পজিটিভ্) দিক্ কি কি, তা'ও গভীর ভাবে চিন্তনীয়। জপ ভাবরূপ ও জ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট ভূমিতে আরূঢ় হ'লে জীবের ভেতরে যে নিত্য প্রকাশ ও আনন্দের ধাম বিরাজমান, সেখানে উপনীত করে।

তাহা হইলে বোঝা গেল, এই সঙ্কর মলিন ছন্দকে শুদ্ধ উজ্জ্বল ছন্দে আনাতেই কল্যাণ। এই শুভ পরিণাম (transformation) ঘটান যায় যে ছন্দে তাকে বলে মিত্রছন্দঃ; রুদ্ধ বা ব্যাহত হয় যাতে করে, তাকে বলে অরিচ্ছন্দঃ। তার ফলে জীবের মহতী বিনষ্টি। সঙ্কর ধারার মাঝে মাঝে এক একটা "শান্তভূমি" (zone of placidity) মেলে; সেখানে শুদ্ধ ঊর্দ্ধাভিমুখ ধারা যেন একটা বাহু (arm) প্রসারিত করে দেয়—সেই বাহু হয় সেতু বা "সন্ধি"। সে সন্ধিকে পাক্ড়াতে পারলে সঙ্করের অসামান্য টান থেকে কেটে শঙ্করধারায় (অনায়াস, অনাময় নিরুপদ্রব প্রশান্তবাহিতায়) গিয়ে পড়া যায়। সেই সন্ধির সন্ধান দেয় যে ছন্দঃ সেই হ'চ্ছে মিত্রচ্ছন্দঃ। সৃষ্টির চাকা ঘুরছে, জীবও তা'তে ঘুরছে। আবর্ত্তনের মাঝে মাঝে এক একটা "ফাঁক" (point of escape), ব্যাবৃত্তি বা আবৃত্তিবেগের সাময়িক অভিভব, exhaustion—জন্য সমাবৃত্তি—release ও returnএর একটা বাহু (positive component) যেন আবৃত্তির মাঝেই "প্রকট" হয়—সেখানে একটা "ফাঁক," "সন্ধি", "শান্তভূমি"র সৃষ্টি করে। তা'র ফলে একটা "শুদ্ধোন্মুখতা", প্রসাদ স্বচ্ছতা, প্রকাশাবরণক্ষীণতা, উজ্জ্বলতা আসে। তার ফলে আবর্ত্তে পতিত বস্তু তা'র আবর্ত্তনগণ্ডী ("routine of life") কেটে বেরুবার একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু সাধারণতঃ অশুদ্ধ মলিন স্তরগুলিতেই জীব (অন্ন, প্রাণ, মন এসব) কারবারী (normally functions)। এই ধূম ধূসর স্রোতের সঙ্কর ছন্দঃ (complex, confused rhythms, স্পন্দন) পাপ্মাবিদ্ধ, অসুরবিদ্ধ, অব্যবসায়াত্মিক, অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাসমাকুল"। জপ এই সঙ্করক্ষেত্রে একটা মিত্রচ্ছন্দঃ শলাকা (wedge) রূপে প্রবিষ্ট হ'য়ে, জটিল, কুটিল, সঙ্কীর্ণ ছন্দগুলোকে ভেঙ্গে অমৃত বা মধুচ্ছন্দের (শুক্ল, +) অংশকে মৃত্যু বা বিষচ্ছন্দের (কৃষ্ণ, −) "আলিঙ্গন" থেকে মুক্তি দেয়, তাকে শুদ্ধভাবে সক্রিয় করে তোলে। ইহাই সংসৃতির (ধূম-ধারার) "মন্থন"। এই মন্থন, শোধন, মোচন মুক্তি, কাজটা জপের স্পন্দনে সিদ্ধ হ'লে "জপাৎ সিদ্ধি" অবশ্যই। গুরু সঙ্কর ছন্দের মধ্যে শলাকার মতো প্রবিষ্ট হ'য়ে শুদ্ধ, উজ্জ্বল, শঙ্কর (শিব) ছন্দটি আদায়ের উপায় করে দেন। এই মন্থনের প্রসাদে মলিন, মিশ্র, সঙ্কর হ'তে উজ্জ্বল, শুদ্ধ, শঙ্কর ভাগ, "অমৃত" ভাগ "বিষ" ভাগ হ'তে তফাৎ হ'য়ে পড়ে। এ মন্থন-ক্রিয়ার সাধক-বাধক হিসাবে সুর-অসুর (মিত্রচ্ছন্দ ও অরিচ্ছন্দ) দুটি পক্ষ (components যুগপৎ সক্রিয়। কিন্তু শুদ্ধাধারাশ্রয়ে অভিরোহ (outgrowing ascent) হ'তে হ'লে মিত্রচ্ছন্দের জয়ী হওয়া আবশ্যক। জয়ী না হ'লে অবরোহ অথবা stagnation (জাড্য)। মন্থনের অবসানে যিনি শিবশঙ্কর তিনি "বিষ"কে আর তফাৎ করেন না, "আত্মসাৎ" করেন। তখন দ্বন্দ্বাতীত চিদানন্দৈকরস তিনি। কালিয়নাগের রহস্যও চিন্তনীয়।

এইবার এই নক্সটা :—

তত্ত্বালোক =			
অতদ্‌ভাবনানিবৃত্তি (নিবর্ত্তক শুদ্ধনাদরূপ ক্রিয়া)	জ্ঞান ও আনন্দরূপ (ভবৎ, প্রবেষ্টুং)	পরা	+ আনন্দময় অন্তরীক্ষ − আনন্দময় + বিজ্ঞানময়
(কারণাত্মক অব্যক্তক্রিয়া) বিপরীতভাবনা নিবৃত্তি	মুখ্যতঃ ভাবরূপ (পশ্যৎ, দ্রষ্টুং)	পশ্যন্তী	× × × − বিজ্ঞানময় + মনোময় × × ×
(স্থূল বা সূক্ষ্ম) অসম্ভাবনার নিবৃত্তি	মুখ্যতঃ স্থূলসূক্ষ্মক্রিয়ারূপ (কুর্ব্বৎ, জ্ঞাতুং)	মধ্যমা	− মনোময় + প্রাণময় × × × − প্রাণময়
		বৈখরীজপ	+ অন্নময় × × × − অন্নময়

মিত্রচ্ছন্দরূপে → গুরুশক্তির প্রবেশ

শেষে দুটো গোড়ার কথা

শেষকালে কয়টা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল। "এত কাঠখড় জোগাড়" ক'রে তবে জপে লাগতে হবে! তবে তো দেখছি জপসাধন এক প্রকার অসাধ্য সাধন—এ মনে ক'রে কেউ বা ভয়ে পেছিয়ে যেতে চাইবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উপযুক্ত "কাঠ খড় যোগাড়" না ক'রে জীবনের ব্যবহার-ক্ষেত্রে কোনও "সিদ্ধি"ই লাভ হয় না। আর জীবনের সব চাইতে সেরা যে সিদ্ধি তার জন্যে "বিনি পয়সার একটা সহজ মুষ্টিযোগ", অগত্যা "পয়সা পাঁচেকের এক সস্তা মাদুলী"—এতেই কাজ হাঁসিল করার কল্পনা দেখে মনে হয় "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"! লক্ষ্যটা যে পরিমাণে বড় তার সাধনটাও সেই অনুপাতে বড় হবারই কথা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধকদের জীবনই এর প্রমাণ! কোথাও, কোনক্ষেত্রেই, "সস্তায় কিস্তিমাৎ" হয়নি। জপ ব'লে কেন, কোনও সাধনই "সহজ" নয়। বিশেষ ক'রে, প্রারম্ভটা তো সদোষ আর আয়াসবহুল হ'য়েই থাকে। বাধা আর গ্রন্থিগুলো শেষ পর্য্যন্তই চলে, তবে তাদের "ভো'ল" বদ্‌লে বদ্‌লে যায়। গোড়ায় যেটা শক্ত সেটা পরে সহজ হ'তে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও নতুন এবং আরও শক্ত একটা না একটা কিছু এসে দেখা দেয়। আঁক শিখব, কি গান শিখব, কি আর যাই কিছু শিখব, তাতেই এই রকম। প্রথম শিক্ষার্থীর বাধাগুলো পরের শিক্ষার্থী মিটিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজেরগুলো? অত "তোড়জোড়" ক'রে জপ কেন ক'রতে হবে?—তাঁর নামে, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর; তাঁর কাছে প্রার্থনা কর; ব্যাকুল হও; তাঁর শরণ নিয়ে শান্ত হও; সরল হও, খাঁটি হও; ধেয়ান ধরো, প্রেম লাগাও—এ সব উপায়েরই বা কোন্‌টা যে "সহজ" তা কেউ ব'লে দেবে? মন্তর তন্তর ওসব কি করছো, "মন তোর আর তন তোর" নৈলে যে কিছু হবেনা—কথা তো সবই ঠিক; কিন্তু শুধু কথাতেই কি গোটা মামলাটা "জল" হ'য়ে গেল? "বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা"—কিন্তু প্রেম মেলে কিসে? সহজ কেউই নয়। "সহজ" সাধন ব'লে যেটা চ'লে আসছে অন্ততঃ বৌদ্ধযুগ থেকে, সেটা হচ্ছে "সহজ" অবস্থা লাভের জন্য সাধন, নিজে সহজ নয়। বরং একটা নিয়ম ক'রে, ফল হবে এই বিশ্বাস রেখে, জপ করাটাই কতকটা সহজ মনে হ'তে পারে।

ফলকথা, ক্রিয়াপ্রধান, ভাবপ্রধান কিংবা জ্ঞানপ্রধান যে ভাবেই সাধনটি চলুক, বিদ্যা (বিধি, পদ্ধতি), শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ (রহস্য)—এ তিনের যথানুরূপ সম্মিলন না হ'লে সে সাধন (শ্রুতির কথায়) "বীর্য্যবত্তর" হবেনা, সমর্থ ও সিদ্ধিপ্রদ হবেনা। শ্রদ্ধা বা ভাব এ তিনেরি মূল সন্দেহ নেই ; কেননা মূলে ভাব থাকলেই ক্রিয়া "স্বচ্ছন্দে" তার পথটিতে চলবে (নামগ, অধ্বগ হবে), আর জ্ঞানও "স্বচ্ছন্দে" পরম উপলব্ধি ও আস্বাদনে গিয়ে পৌছুবে (ধামগ হবে)। কিন্তু ধৃতি ও উৎসাহ সহকারে পথটি তো চলতেই হবে, আর পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে আড়াল দেওয়া "পরদা"গুলো তো পর পর সরিয়েই নিতে হবে। অন্যদিকে, শ্রদ্ধা বা ভাব গোড়াতেই "পাকাপোক্ত" হয়ে দেখা দেয় না। গোড়ায় রুচি বা রতি বড় "লাজুক" (shy), বড় "চল চপল চঞ্চলা" (fickle, variable)। একদিকে বিদ্যা, অন্যদিকে উপনিষৎ—এই দুয়ের বিশ্বস্ত আলিঙ্গনেই তাকে রক্ষা করতে হয়, আর সাবধানে, তার যেটি সম্ভাবনা তাকে "তা" দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়। এই গ্রন্থের ৪।৪।৩০ সূত্রের কারিকায় যে কল্পতরুটির কথা বলা হ'য়েছে, শ্রদ্ধা বা ভাব নিয়েই তার মূলটি আশ্রয় করতে হবে ; নিষ্ঠা দিয়ে সে কল্পবৃক্ষের কাণ্ডটা। তাই ক'রলে—সে কাণ্ড থেকে দুটি "সাধিষ্ঠ"শাখা উদ্‌গত হবে—একটি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রতি উন্মুখতা, অপরটি, ভাবভক্তি বা ভজনরসমাধুরীর উত্তরোত্তর রসঘনগাঢ়তা ; এ দুটি শাখা যেখানে আবার সামরস্যে সম্মিলিত, সেইখানেই "সান্দ্রামুকুল-মঞ্জরী"র উদ্‌গম, এবং সেইখানেই হচ্ছে পূর্ণ সমাপত্তি এবং পরম সফলতা। এই মহোদয়টি হ'তে দাও। গোড়াতেই "কুঠার" হাতে করো না, অনাবশ্যক "বাড়তি" ছেটে ফেলতে ; অমৃত কল্পতরু তোমার ভাগ্যদোষে শুধুই ঠুঁটো জল্লতরু যেন না হন !

এ না হয় হ'ল। কিন্তু জপকর্ত্তাকে সমর্থজপের নিমিত্ত স্পন্দন ও বীচি-বিজ্ঞানের "বোদ্ধা"ও হ'তে হবে, এতে সাধনার সঙ্গে একটা প্রায় অসম্ভব সর্ত্ত যুড়ে দেয়া হ'ল না কি ? উত্তর—সে রকমের কোনও সর্ত্ত যুড়ে দেয়া হচ্ছেনা। এদেশে তানসেন অথবা ওদেশে ভাগ্‌নার, বিট্‌হোফেন, মোজার্ট প্রমুখ প্রতিভাবান্ সুরশিল্পীরা গভীরভাবে শব্দবিজ্ঞান (Acoustics), সূক্ষ্মধ্বনিবিজ্ঞান (Supersonics), বীচিবিজ্ঞান (Wave Mechanics) আলোচনা না ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁদের সুরশিল্পসৃষ্টি,

যেখান থেকে যেভাবেই হোক্, ঐ সব বিজ্ঞানের "আধারেই" হয়েছে; অর্থাৎ, melody, harmony, resonance ইত্যাদি ঘটিত সূত্রগুলো মান্য ক'রেই হ'য়েছে, অমান্য ক'রে হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। শারীর-বিজ্ঞান এবং জৈবরসায়নবিদ্যা (Bio-chemistry) ইত্যাদিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পোষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য তো ঐ সব বিজ্ঞানের নিরূপিত সূত্রগুলোর ওপরই নির্ভর করে। সেইরকম, জপের পেছনেও যে মহাবিজ্ঞান র'য়েছে, সেটার কোন কোন ভাগে অভিজ্ঞ না হ'লেও জপ চলতে পারে সন্দেহ নেই; তবু সে বিজ্ঞান পরিচয়ে কাজে সুরাহাই হয়ে থাকে। জপ তা হ'লে আর আঁধারে হাতরে চলার কর্ম্ম হ'ল না। তবে এটা ঠিক যে, জপের বেলা তার পথের আলোটিকে (পদার্থ-বিজ্ঞানের মতো) "গাণিতিক বিশ্লেষণ" ক'রে অথবা লেবরেটরির যন্ত্রে যাচাই ক'রে নেবার প্রয়োজন নেই। এমন কি, সুরশিল্পী বা বর্ণশিল্পীর মতো সে আলোর অথবা ধ্বনির সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর পরদাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খতম ভাগ বিচার ক'বে নেবারও তেমন প্রয়োজন নেই। জপের বেলা যেটি relevant analysis সেটি মুখ্যতঃ subjective; তবে তার objective কাঠামো অবশ্যই আছে। কেন না, জপ মুখ্যতঃ স্থূলকে অবলম্বন ক'রে একটা অভ্যারোহ কর্ম্ম। আর, এ অভ্যারোহটি ঘ'টে থাকে মুখ্যতঃ সাধকের আপন আস্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা এবং ঊর্দ্ধতন লোকের "অনুগ্রহ" এই দুয়ের সুসঙ্গত "পরিণয়ে"। ঐই পরিণয়টিই বিশেষভাবে শেখায় জপকে ছন্দোগ হ'তে। ছন্দোগ হ'লে না অধ্বগ ও ধামগ! যে পর্য্যন্ত এবং যে পরিমাণে সেটা স্থূলে চলে, সে পর্য্যন্ত এবং সে পরিমাণে সেটা স্থূলের "শাসন" মেনে চলেই। সে শাসনটা কি ধরণের তা জানলে লাভই আছে। কেননা, সেটাকে অতিক্রম ক'রে উঠতে হবে যে! যার "আঁত-ঘাঁত "(মর্ত্তস্য ধৃত্তিঃ)" জানিনে, তাকে সহজে এড়িয়েই বা যাই কি ক'রে? আর, শুধুই—কি এড়িয়ে যাওয়া? তাকেও (অর্থাৎ তার ছন্দের শাসনটাকে) আপন মিত্রচ্ছন্দে পেতে হবে যে আমাকে! জপ প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের ও আনন্দের ভূমিতে যেতে যেতে তাদেরও আপন আপন "ঋত" (Law) গুলোকে নিজের "মিত্র" ক'রে নিতে থাকে। সবই "স্বারসিক" হ'তে থাকে। এইটের নিমিত্ত শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তি তো মূলে চাই-ই, তা ছাড়া বিদ্যা এবং উপনিষদেরও সাক্ষাৎ উপযোগ

আছে। এবম্বিধ ক্রিয়ার ফলে এই "কারবারী" প্রাকৃত অনুভবের জগৎ থেকে সেতুর পর সেতু পেরিয়ে, নতুন নতুন অনুভূতির জগতে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। আমাদের "এই" প্রাকৃত অনুভূতিটিকে যদি বলি ভূঃ, আর এর অতীত সেই দিব্য অনুভূতি ও দৈবীসম্পৎকে যদি বলি স্বঃ, তবে এ দুয়ের সেতু হ'ল ভুবঃ। আবার দৈবীঅনুভূতির যেটি পরাকাষ্ঠা বা পরমতা সেটি "তুরীয়"। জপ তাই চতুষ্পাৎ। সেতু কিন্তু প্রায় "পদে পদে" পেরুতে হয়। এক এক সেতু পেরুলাম, আর আগেকার "হা'ল চা'ল" বদলে গেল। গোড়ায় যেখানে বিধিনিষেধের নাগপাশ, সেতু পেরিয়ে দেখি, সে নাগপাশ এলিয়ে এসেছে—একটা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত উন্মেষের দেশে এসে প'ড়ছি। আরও এগিয়ে চল, আবারও সেতু পেরোও। কৃপার ("ক'রে পাওয়ার") সন্ধান—যেটি গোড়ায় কুণ্ঠিত ছিল,—"অপাবৃত" ছিল, পূরাপূরি মিলতে লাগল। এইভাবে চলতে হবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমির "আইন"গুলো উত্তর ভূমিতে "নাকচ" হয় না, বদলে আর এক রকম হ'য়ে যায় তনুরজাঃ হয়; সত্ত্ববিশাল হয়। আচ্ছা, এ যাত্রা কি আখেরে আমার, না তোমারি? "যাবন্নদ্যা নদীনাথে নৈকান্তিক-সমর্পণম্। মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেত্তি জল্পনা।" (জপসূত্রকারিকা)। নদীনাথে ঐকান্তিক সমর্পণটি হবার আগে পর্য্যন্তই নদী ভাবে—আমার বুকের এ উচ্ছ্বাস কি আমার, না তোমার? কিন্তু পূর্ণসমর্পণে?

জপসূত্রম্

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্।

ত্রিস্রো মাত্রাঃ প্রসন্নাস্ত্রিতয়মপি ভৃশং ঘ্নন্তি শিষ্যে মলানাং
কোষা নির্মোকজাড্যং জহতি চ বিমলা ভর্গসে ভান্তি পঞ্চ।
সেতুর্যাহপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবং
মাত্রাকৢপ্ত স্বমাত্রো নিয়ত উরুযশাঃ শ্রীগুরুস্তারমূর্ত্তিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরু হইতেছেন 'তার' বা প্রণব বা ওঁকারের মূর্ত্তি। ওঁকারের যে ত্রিমাত্রা—অ, উ, এবং ম—তাহারা প্রসন্ন হইলে শিষ্যের যে ত্রিবিধ মল, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মল, অথবা যাহাকে অণু, তনু ও পৃথু মল, অথবা তন্ত্রোক্ত আণবাদি মল বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সেই ত্রিবিধ মলকে নাশ করিয়া থাকে, এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের যে জড়তা, তাহার পরিহার ঘটায় এবং অতি বিশুদ্ধ যে ব্রহ্মবর্চস্ বা তেজঃ তাহাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়।

ওঁকারের যে অর্দ্ধমাত্রা, তাহা ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত তত্ত্বে লইয়া যাইবার সেতুস্বরূপ। এই অর্দ্ধমাত্রাকে আশ্রয় না করিলে কিছুতেই সে পরম অব্যক্ত তত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। একদিকে ব্যক্তরূপ—যাহা অ, উ, ম—এই ত্রিমাত্রার দ্বারা গৃহীত হয়, আর একদিকে পরম অব্যক্ত, যাহা অমাত্র বা মাত্রাতীত, অর্থাৎ কোনো মাত্রা দ্বারা গৃহীত হয় না—এই দুইয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ওঁকারের অর্দ্ধমাত্রা। ইনি নিত্যা ও বিশেষরূপে অনুচ্চার্য্যা। ইনি হইতেছেন এই দুইয়ের সংযোগকারক সেতু, অর্থাৎ ইঁহাকে আশ্রয় করিলেই ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে প্রবেশ লাভ হয়।

ওঁকারের মধ্যে ছন্দঃ, প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত এবং তাহা হইতে জাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পুটিত থাকে বলিয়া ওঁকারের যে শক্তি তাহা সাধারণের দৃষ্টি-

গোচর হয় না, কিন্তু এই শ্রীগুরুরূপে প্রকট যে প্রণবমূর্ত্তি তিনি নিয়ত যশোমণ্ডিত—তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি সম্যকভাবে প্রস্ফুটিত। তিনি সর্ব্বলোকনয়নগোচর হইয়া তাঁহার অনন্ত মহিমা খ্যাপন করেন। এই ওঁঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে মাত্রাতীত বা অমাত্র। এই মাত্রাতীত স্বরূপ অক্ষুন্ন রাখিয়াই তিনি ত্রিমাত্রা এবং অর্দ্ধমাত্রার মধ্যে কপ্ত বা কল্পিত।

ওঁঙ্কারের ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা—এই পঞ্চাবয়বের সহিত শ্রীগুরুর অভিন্নতা নির্দ্দেশই এই প্রথম শ্লোকের লক্ষ্য ॥১॥

গন্ধেন স্থূলসূক্ষ্মং যদশিতমিতরদ্ বা পুনীতেঽসবশ্চ
যস্যাস্যাব্জপ্রকাশাদমৃতরসকণৈরাচরন্তীহ সাধু।
রূপং চেতঃ পুনীতে রুতিরবতি ধিয়ং স্পর্শ আনন্দমাত্রা
গন্ধাদ্যৈঃ পঞ্চশুদ্ধীর্বহতি স পরমোঽস্পর্শশব্দাদিতত্ত্বঃ ॥২॥

শ্রীগুরুর যে দিব্য অঙ্গগন্ধ, তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভোগ্য, তাহাদিগকে শুদ্ধ করে। যাহা অন্নরূপে অশিত কিনা ভক্ষিত হয়, শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাও যাহা আহৃত হয়, সেই সমস্ত আহারই শ্রীগুরুর দিব্য অঙ্গগন্ধ দ্বারা শোধিত হইয়া যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের আহারশুদ্ধিই হইতেছে শ্রীগুরুর দিব্য অঙ্গগন্ধাস্বাদনের ফল। ইহা ক্ষিতিতত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর বদনকমলের যে মধুর হাস্য, তাঁহার নয়নকমলের যে প্রসন্ন দৃষ্টি, তাঁহার মুখকমলাবয়বের যে শান্ত, স্নিগ্ধ মধুর ভঙ্গী—তাহারা সকলে যে অমৃতরস ক্ষরণ করিতে থাকে, তাহার দ্বারা শিষ্যের আচার শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সে তখন সাধু, শোভন অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীগুরুর পরম সুন্দর, পরম রমণীয়, শুদ্ধ মধুর বিমোহন ভঙ্গী দর্শনে প্রাণ পুলকিত হয় ও শুদ্ধ হয়। প্রাণশুদ্ধির ফলে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পবিত্র হইয়া যায়। যে একবার শ্রীগুরুর প্রসন্ন ভঙ্গিমা দর্শন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিয়াছে, যে শ্রীগুরুর মুখপদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃতরসকণা পানের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার দ্বারা আর অসাধু অশোভন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা অপ্‌তত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর বিশ্ববিমোহন রূপ যাহার মনোমধ্যে প্রতিফলিত হয়, যে সর্ব্বদা সেই মনোহর মূর্ত্তির ধ্যান করে, যাহার চিত্ত সেই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পরম পবিত্র মূর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বদা ভরিত হইয়া থাকে, তাহার চিত্ত বা বিচার শুদ্ধ হইয়া যায়। অন্য কোনো চিন্তা বা বিচার আর তার মনে স্থান পায় না। শ্রীগুরুর বিশুদ্ধ মূর্ত্তির ধ্যানে মন তার নিবিষ্ট হইয়া যায় ও পবিত্র হইয়া উঠে। ইহা তেজস্তত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর মুখনিঃসৃত বাক্য দ্বারা শিষ্যের ধী অর্থাৎ বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগুরুই সর্ব্বধীসাক্ষী। শ্রীগুরুর বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে চালিত হয়। শ্রীগুরুবাক্যই মহামন্ত্র। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্। শ্রীগুরুর বাক্য, শ্রীগুরুর উপদেশ হৃদয় মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরক হয়। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে, বুদ্ধিকে ফুটাইয়া তুলিতে শ্রীগুরুবাক্যের ন্যায় শক্তিধর আর কিছুই নাই। শ্রীগুরু-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে বুদ্ধি আর বিপথে চালিত বা প্রচারিত হইতে, ছড়াইতে পাবে না। তাই শ্রীগুরুবাক্যই প্রচারশুদ্ধির হেতু। "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"—বুদ্ধির পারে যে পরতত্ত্ব তার উপলব্ধির উপায়ও গুরুবাক্য হইতেই হইয়া থাকে। ইহা আকাশতত্ত্বের শুদ্ধি।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্য স্পর্শ শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গে আনন্দলহরী তুলিয়া দেয়। শ্রীচরণস্পর্শমাত্রই শিষ্য কি যেন এক দিব্য আনন্দ, কি যেন এক মধুর শিহরণ, কি যেন এক দিব্য পুলক অনুভব করে। কি যেন এক শক্তির সঞ্চার এই স্পর্শের ফলে ঘটে। জীবের স্বাভাবিক আনন্দমাত্রার পোষণ ও পরিপূরণে ইহা সর্ব্বোত্তম। এটি বায়ুতত্ত্বের শুদ্ধি।

যদিও শ্রীগুরুর এই অঙ্গগন্ধ, মুখপদ্মের অমৃতরসকণা, অপরূপ রূপ, শুদ্ধ শান্ত হৃৎকর্ণরসায়ন শব্দ এবং আনন্দময় স্পর্শ—আহার, আচার, বিচার, প্রচার ও সঞ্চার—এই পঞ্চবিধ শুদ্ধি আনয়ন করে, তবুও পরমার্থতঃ শ্রীগুরু কিন্তু অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস অর্থাৎ ব্রহ্মাভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপই। ইহাতে মূল শুদ্ধি, কিনা, মূলাবিদ্যার শুদ্ধি। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ শ্রীগুরুতত্ত্বের পর্য্যবসান হইলেও শ্রীগুরু ভগবানের প্রকৃতিত্রয়ের (অপরা, পরা, পরমা) এবং শক্তিত্রয়ের (অন্তরঙ্গাদি) ত্রিবেণীসঙ্গম। সুতরাং স্থূল হইতে পরম পর্য্যন্ত সকল "গ্রামেই" গুরুতত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রভাব। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।

অতএব মূলসহিত পঞ্চশুদ্ধির কারক যে শ্রীগুরু তাহাই এই দ্বিতীয় শ্লোকে দেখান হইল ॥২॥

বাগ্‌বুদ্ধিপ্রাণমূলং গময়তি কৃপণং ভ্রষ্টমূলং গবর্ণো
মূর্দ্ধন্যেনাপি ধাম্না রসয়তি বিধুরং ক্ষয্যতৃষ্ণং রকারঃ।
উচ্ছেদং মোহমূলং বিমলসমুদয়ং নেষ্যতো দ্বাবুবর্ণৌ
নীয়াচ্ শীর্ণং শ্রিয়ৈ শ্রীঃ পরমমুপরমং শ্রীগুরৌ যো বিসর্গঃ ॥৩॥

'শ্রীগুরুঃ' এই পদটির মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে : শ্রী, গ, উ, র, উ এবং বিসর্গ এই পাঁচটি। দুইটি ,উ'কে একটি বর্ণই ধরিতে হইবে। এখন 'গ' কারের উচ্চারণস্থান হইতেছে জিহ্বামূল। ইহা কি সূচনা করিতেছে? মূল হইতে ভ্রষ্ট যে দীন জীব, তাহাকে বাক্ বুদ্ধি ও প্রাণের মূলে যে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব রহিয়াছেন, সেই আত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করায় এই 'গ' বর্ণ। আর 'র'কারের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। সুতরাং ইহা যেন জানাইয়া দিতেছে যে 'গুরু'শব্দস্থ 'র'কার ক্ষয়শীল বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্ত অথবা যার তৃষ্ণা ক্ষয়প্রবণ হইয়াছে, এমন কাতর জীবকে মূর্দ্ধাস্থিত তেজঃ বা প্রকাশ দ্বারা সঞ্জীবিত করে। আর দুইটি 'উ'কারের মধ্যে একটি মোহের মূলে যে অবিদ্যা তাহাকে উৎপাটিত করে, অর্থাৎ সমূলে বিনাশ করে, এবং আর একটি বিমল তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করে। একটি 'উ'কারের দ্বারা অজ্ঞানের **উচ্ছেদ**, আর একটি 'উ'কারের দ্বারা জ্ঞানের **উদয়** বুঝাইতেছে। এতদ্দ্বারা একভক্তিরূপ যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান তাহাও বুঝিতে হইবে। 'উ'কারের এই দ্বিবিধ বৃত্তি। উকারের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। এই ওষ্ঠ দ্বারা সব বর্ণ নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ কোন কোন স্থলে ছিন্ন (inhibited) হয় এবং ইহা দ্বারাই আবার বর্ণের বহিঃপ্রকাশ বা উদয়ও (exhibition বা expression) ঘটিয়া থাকে। ইহা আমাদের মুখে (এবং লক্ষণায় সৃষ্টির সর্ব্বত্র) যেন valve-এর মত কাজ করে—সবকিছুর গতাগতি ইহাই যেন নিয়ন্ত্রিত করে।

এখানে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে; 'নেষ্যতঃ' পদে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ দ্বারা এই অজ্ঞান-উচ্ছেদ ও জ্ঞান-উদয় যে পরে ক্রমশঃ হইবে—তাহাই

দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দুইটিতে 'গময়তি' ও 'রসয়তি' পদে বর্ত্তমান কাল প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে এদুটি—অর্থাৎ বৃথা অমূলক বস্তুর পিছনে ভ্রাম্যমাণ জীবের মূলাভিমুখে গমন ও বিষয়তৃষ্ণাকাতর জীবের দিব্য-রস আস্বাদন—শ্রীগুরু কৃপালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে।

আর আদিতে শ্রী শব্দটি, যাহা শীর্ণতার দরুণ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শ্রীসম্পন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলে—ইহাই বুঝাইতেছে। আর 'শ্রীগুরুঃ' পদে সর্ব্বশেষে যে বিসর্গ, তাহার দ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চোপশমাত্মক পরম উপরম বা শান্তং শিবং অদ্বৈতং রূপ পরম তত্ত্ব সূচিত হইতেছেন। তাহা হইলে শ্রীগুরুঃ পদের পাঁচটি বর্ণ—মূল তত্ত্ব প্রাপণ (গময়তি), তেজঃসঞ্চার বা বলাধান (রসয়তি), অজ্ঞানের উচ্ছেদ এবং জ্ঞানের উদয় এবং অভ্যুদয় (শ্রী) ও উপশমাত্মক জ্যোতীরসাভিন্ন পরম মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স—(বিসর্গ)—এই পাঁচটিকে সূচনা করিতেছে। 'শ্রীগুরুঃ' এই মন্ত্রটি বা শব্দটির মধ্যেই এত অপূর্ব্ব রহস্য !

প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠঃ স ধীরঃ পরিহরতি সনাৎ সংগ্রহাদ্ বৈ পরাঞ্চি
যস্যাঙ্গীকারলেশাৎ প্রভবতি বিশদং ব্রহ্মসৌখ্যং চ দৌঃস্থ্যে।
লীয়েতামূর্ত্তমাত্রং ঘটপটবিষয়ং বিগ্রহাদ্ যস্য মূর্ত্তং
কারুণ্যেনাবতীর্ণং জয়তু শিবগুরোরঙ্ঘ্রিজং পঞ্চগঙ্গম্ ॥৪॥

শ্রীগুরুশক্তি পরাঙ্‌মুখী বা বহির্মুখী সমস্ত বৃত্তিকে প্রত্যঙ্‌মুখী বা অন্তর্মুখী করিয়া শিষ্যকে ধীর করিয়া দেয়, যাহাতে সে বাহিরের বিষয়ে আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া অন্তরাত্মাকে, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। বাহিরে বহুদিকে প্রসারিত, বহু বিষয়ে প্রধাবিত শক্তিনিচয়কে সংগ্রহশক্তি দ্বারা শ্রীগুরু প্রত্যঙ্‌মুখী করিয়া দেন।

আর দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃস্থ জীবকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিবামাত্র তিনি তাহাকে পরম প্রসন্ন যে ব্রহ্মানন্দ তাহা অনুভবযোগ্য করাইয়া দেন। এই শিষ্যরূপে স্বীকার বা প্রতিগ্রহ দ্বারা, এই অঙ্গীকারের লেশমাত্র দ্বারাই ত্রিবিধ তাপক্লিষ্ট দুঃখতপ্ত জীবকে তিনি সর্ব্বোত্তম ভজনানন্দ এবং অপার ব্রহ্মানন্দের অনুভবযোগ্য করিয়া তোলেন। ইহাই তাঁর প্রতিগ্রহশক্তির মহিমা।

আর শ্রীগুরুর বিগ্রহশক্তি দ্বারা তিনি মূর্ত্ত হইয়া প্রকটরূপে দেখা দিয়া অর্থাৎ দেহরূপ বিগ্রহধারী হইয়া মূর্ত্ত বা স্থূল ঘট-পটাদি বিষয়কে অমূর্ত্ত পরমতত্ত্বে লীন বা লয় করাইয়া দেন। নিজে স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত হইলেও মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া মূর্ত্তকে অমূর্ত্তে লইয়া যাইবার কারণ হ'ন। এমনই তাঁর মূর্ত্তি-ধারণের বিচিত্র রহস্য! যে মূর্ত্তি তিনি ধারণ করেন সেটিও 'অমায়িক, অপ্রাকৃত'।

এই মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যে তাঁর অবতরণ ইহাই তাঁর পরিগ্রহ শক্তি। শ্রীভগবানের অবতাররূপ পরিগ্রহ নৈমিত্তিক, কিন্তু শ্রীগুরু-বিগ্রহরূপে অবতরণ নিত্য। কালেনানবচ্ছেদাৎ। মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।

এই সব—তাঁহার সংগ্রহ, প্রতিগ্রহ, বিগ্রহ, এবং পরিগ্রহ—সবই তাঁহার করুণা, তাঁহার অনুগ্রহশক্তিরই লীলা, অনুগ্রহশক্তিরই রূপায়ণ।

শিবের মস্তক হইতে মা গঙ্গার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু শিবের প্রকটমূর্ত্তি শ্রীগুরুর শ্রীচরণ হইতেই গঙ্গার উদ্ভব। হরজটাজাল হইতেও আবার একটি মাত্র গঙ্গার উৎপত্তি, আর এখানে সাক্ষাৎ শঙ্করমূর্ত্তি শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে কিন্তু পঞ্চগঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে।

সংগ্রহ, প্রতিগ্রহ, বিগ্রহ, পরিগ্রহ এবং অনুগ্রহ এই পঞ্চশক্তিরূপা পঞ্চগঙ্গা, শ্রীগুরুর এই শক্তিধারা পরমপাবনী মন্দাকিনী ধারার মতই শুদ্ধকরী।

ভারং কর্ম্মার্পিতমতিগুরুং ঘোরতাদিপ্রবৃদ্ধং
মগ্নামুর্বীমিব পয়সি যো লীলয়াপ্যুদ্দিধীর্ষুঃ।
ধত্তে বীজং শ্রুতিপথচরং বর্চসে চাত্মমন্ত্রং
ক্লেশব্যূহচ্ছিদুরুমুখভৃচ্ শ্রীগুরুঃ পঞ্চমূর্ত্তিঃ ॥৫॥

অনন্ত জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের গুরুভারে শিষ্য যখন একেবারে অতল জলধিজলে ডুবিয়া যাইতে থাকে, ঘোর, মূঢ় প্রভৃতি গুণের দ্বারা ঐ কর্ম্মভার যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে, তখন প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী মগ্ন হইয়া যাইবার সময় শ্রীভগবান্ বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেমন দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরাকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীগুরুও গুরুভারাক্রান্ত পৃথিবীর ন্যায় অনন্ত কর্ম্মভারাক্রান্ত শিষ্যকে 'লীলয়া' অর্থাৎ অনায়াসে বা করুণাবশতঃ উর্দ্ধে ধারণ করেন, উদ্ধার করেন।

আবার শ্রীগুরু শ্রুতিপথে বীজমন্ত্র ধারণ করেন। এই মন্ত্র হইতেই আত্ম-চৈতন্য উদ্ভাসিত হয়। মীন অবতারে যেমন শ্রীভগবান্ সমস্ত পৃথিবীর বীজ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই সমস্ত পৃথিবী (এখানে পৃথিবী—Earth নয়। পৃথু, কিনা, বিস্তারিত ভাবে থাকার "ভূমি" হইল পৃথ্বী বা পৃথিবী) পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল, শ্রীগুরুও তেমনি এই বীজমন্ত্র ধারণ করেন ও শিষ্যের শ্রুতিপথের গোচর করেন এবং এই বীজ হইতেই মূলতত্ত্ব আবির্ভূত হয়। আত্মবস্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান, তথাপি তাহার যেন বীজমন্ত্র হইতে আবির্ভাব হয়। উপলব্ধিই তাহার আবির্ভাব। সমস্ত সৃষ্টিও বীজাকারে থাকে, পরে এই বীজ হইতে পুনরায় আবির্ভূত হয়। আবার, কূর্ম্ম অবতারে যেমন শ্রীভগবান্ সমুদ্র মন্থনের সময় মন্থনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুও সেইরূপ ব্রহ্মবর্চঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত শিষ্যের আত্মাকে মন্থন করিবার দণ্ড স্বয়ং ধারণ করিয়া থাকেন।

পুনঃ, নৃসিংহ অবতারে শ্রীভগবান্ যেমন হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীর পাপ হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীগুরুও শিষ্যের ক্লেশব্যূহ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশের সমষ্টিকে নিঃশেষে বিনাশ করেন।

শেষ, বামন অবতারে শ্রীভগবান্ উরুক্রমরূপে যেমন বলির যজ্ঞকে ভরণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে শ্রীগুরুও শিষ্যের 'উরু', কিনা, বিস্তীর্ণ পদবী বা অভ্যুদয় লাভের জন্য যে 'মখ', কিনা যজ্ঞ, তাহাকে ভরণ বা পালন করিয়া থাকেন।

এইরূপে শিষ্যকে ঊর্দ্ধে ধারণ, তা'র বীজমন্ত্র সংরক্ষণ, তা'র মন্থনদণ্ড ধারণ, তা'র ক্লেশ বিদারণ ও স্বাধ্যায়াদি যজ্ঞভরণরূপ পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা দেখান হইল শ্রীগুরু একাধারে মীন, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ এবং বামন এই পঞ্চাবতারের প্রকট মূর্ত্তি ॥৫॥

মন্তব্য :—'ওঁঙ্কার শব্দটি অনেক স্থলে এভাবে লিখিবার হেতু, শেষ প্লুতধ্বনিটির নির্দ্দেশ। অর্থাৎ, মকারে যাইয়াই প্রণবের সহসা ধ্বনি বিরাম হইতেছে না। পুনশ্চ, 'ভর্গ' শব্দটিকে অকারান্ত না করিয়া 'স্'কারান্ত করাতেও মূলীভূত প্রাণ প্রযত্ন বিশেষের আকৃতিটি (Pranik Function Pattern) সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বেদাদি মন্ত্রশাস্ত্রে এবম্বিধ 'মূল আকৃতি' গুলিই দেখিতে পাই। লৌকিক প্রয়োগে শক্তি এবং আকৃতি উভয়েরই সঙ্কোচ ঘটিতে দেখা যায়।

শ্রীগুরুপঞ্চকে যে 'অর্দ্ধমাত্রা', সেটি জপসূত্রে বিশেষ সূত্রদ্বারা লক্ষিত এবং কারিকায় আলোচিত হইয়াছে। এটি একটি মৌলিক রহস্য। বলা বাহুল্য, 'অর্দ্ধ' মানে 'অর্দ্ধেক' নয়। পরে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে এমন একটা 'পরিচয়' শ্লোক এখানে সানুবাদ দেওয়া হইতেছে :—

অব্যক্তস্ফোটযোনিঃ স্ফুটমুদয়মিতা চোর্ম্মিরূপাস্তি মাত্রা
স্ফোটঞ্চাব্যক্তমাপ্তা স্বরসলিলচয়ে বীচিবিশ্রান্তিমেতি।
ব্যক্তেগ্র্ামানতীত্য প্রসরতি তনুগা ঋধ্যমানা স্ববৃত্তৌ
দ্বে কাষ্ঠে নাদবিন্দূ ত্বসকলযুগলা সাঽর্দ্ধমাত্রা হ্যমাত্রম্ ॥

আমাদের বোধে অব্যক্ত কিন্তু পূর্ণবোধে যে নিত্য অকুণ্ঠিত স্ফুটীভাব (স্ফোট), সেটি এক নিস্তরঙ্গ অগাধ মহোদধিতুল্য, অথচ বিশ্ববোধে অসংখ্যেয় শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়রূপে সেটি আবার তরঙ্গায়িতও হইতেছে। সেই অব্যক্ত স্ফোটের আধারে ঊর্ম্মিরূপে জাত হইয়া যেটি স্ফুট আকারে উদিত হইতেছে, সেটিকে (মূল আকৃতিভাবে—as Pattern) দেখিলে বলা যায় 'মাত্রা'। অর্থাৎ সমস্তই মূলতঃ স্পন্দ এবং ঊর্ম্মিরূপে উদিত হইতেছে। উদিত হইয়া তার বীচিরূপের বিশ্রাম ভূমি কোথায় পায়? নিখিল অভিব্যক্ত স্বরাদির 'সলিলচয়', কিনা লীনতার স্থান যে অব্যক্তস্ফোট, তাকেই আবার প্রাপ্ত হয়। যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই ফিরিয়া শান্ত হয়। এই উত্থান এবং অবসানের মধ্যে যে অভিব্যক্তি, সেটি নানা গ্রামে, নানান্ পরদায় হইতেছে। যখন কোনও গ্রামে অভিব্যক্তি হয়, তখন সে গ্রামটিকে উর্দ্ধ এবং অধঃ (ultra এবং infra) উভয় দিকেই অতিক্রম করিয়া মাত্রা (Measure Principle) সূক্ষ্মগতি (তনুগা) হইয়া স্বকীয় বৃত্তিতে (স্বকীয় সামর্থ্যে ও ছন্দে) 'ঋধ্যমান' হইতে থাকে। এই যে ঋধ্যমানতা (Progression), ইহার দুই দিকে সীমা ('কাষ্ঠা')—একটি বিস্তারের দিকে (নাদ), অপরটি কেন্দ্রীণ ঘনীভাবের দিকে (বিন্দু)। দুটি কাষ্ঠার অভিমুখে অসংখ্য অভিব্যক্ত 'কলায়' মাত্রার এবম্বিধ যে ঋধ্যমানতা, তাই 'অর্দ্ধমাত্রা'। অর্দ্ধমাত্রা একদিকে নাদ অপরদিকে বিন্দু পর্য্যন্ত ঋধ্যমানতার পরিপূর্ণ রূপ। আবার, 'অসকলযুগলা', কিনা, নাদবিন্দুকলাতীত বা রহিত রূপে এটি হইতেছে 'অমাত্রম্' ॥

জপসূত্রম্‌

অথ জপসূত্রে

উপোদ্‌ঘাতঃ

নাস্ত্যস্তীতি প্রতীতৌ নিয়তমনুগতং শ্রৌতসত্যং হ্যনন্তং
ভানেঽভানে বিভাতি প্রতিপদবিদিতং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাবিঃ।
ভূয়স্ত্বেনৈব কাষ্ঠা শ্রুতিগণশিখয়াঽদর্শি যো বৈ রসঃ স
ভূমেতি প্রত্যগাত্মাঽস্ত্বনপিহিতমুখঃ শ্রেয়সে প্রেয়সে বঃ ॥১॥

ঘটশরাবাদি পদার্থে মৃত্তিকা যেমন নিয়ত অনুগত থাকে, সেই প্রকার অস্তি এবং নাস্তি—এই উভয় প্রকার প্রতীতিতে অস্তিতামাত্ররূপ যে সৎ নিয়ত অন্বিত রহিয়াছে, তাহাই উপনিষদ্‌-প্রতিপাদ্য সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। দেশ, কাল, বস্তু ও সম্বন্ধজন্য কোনো পরিচ্ছেদ তা'তে নাই এবং কোনোপ্রকার অভাবের প্রতিযোগী বিষয়ও সেটি নয়; সুতরাং সেই সৎ অনন্ত। পুনশ্চ, জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি অবস্থায় যখন বিষয়ের ভান হয়, অথবা সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদিতে যখন কোনো বিষয়ের ভান হয় না, তখনও চিজ্জ্যোতিরূপে সাক্ষাৎ নিরবচ্ছিন্ন এটি স্ব-প্রকাশ; ইহা সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ এবং ইহার প্রকাশেই আর সমস্তের প্রকাশ হইয়া থাকে এবং এই স্ব-প্রকাশ সংবিদের উদয়-অস্তও নাই। এই সংবিৎ প্রতিবোধ-বিদিত, অথচ ইহা বিদিত ও অবিদিত—এই দুইএর কোনোটাই নয়। বস্তুতঃ ইহা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতিগণশিখা, বেদশিরোমণি ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে "ততো ভূয়ঃ" এই ক্রমে যে শেষ সীমা দেখাইয়াছেন, তাহা হইতেছে সাক্ষাৎ সুখ বা রসস্বরূপ ভূমা। অল্পে, খণ্ডিতে, পরিচ্ছিন্নে তাহা নাই। অতএব, সদ্‌বস্তু কেবল যে অনন্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ, এমন নয়—ইহা আবার নিরতিশয় সুখস্বরূপ। সেই ভূমা প্রত্যগাত্মা (Inner Self) রূপে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রবিষ্ট হইয়া আপন মায়াশক্তিতে সেই সত্য প্রত্যগাত্মার স্বরূপ

(সাক্ষী, চেতয়িতা, রসয়িতা, বিভর্ত্তা) আবরণ করিয়াছেন। তোমাদের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত এবং পরমানন্দরূপ প্রেয়োলাভের জন্য সত্যের সেই মুখ নিরাবরণ হউক্ ॥১॥

হংসো যো হংসবত্যামৃচি ঘৃণিরিতি বা প্রাণ ইত্যেবমূচে
গায়ত্র্যা যদ্ বরেণ্যং প্রণব ইতি গিরোদীরিতঞ্চাপি ভর্গঃ।
গা মাধ্বীরিন্দুবিন্দূনৃগপি মধুমতী মন্ত্রবর্ণৈরদুগ্ধ
সূর্য্যো বহ্নিশ্চ সোমঃ সপদি বিজয়তামৈকপদ্যেন হৌংসঃ ॥২॥

হংসবতী ঋক্, যাঁ'কে 'হংস' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন, অন্যত্র যিনি 'ঘৃণি' কিম্বা 'ভাস্বান্' প্রাণরূপে কথিত হইয়াছেন; গায়ত্রী ঋক্ ওঁঙ্কার এই বাকের দ্বারা যে বরণ্যে জ্যোতিঃকে কীর্ত্তন করিয়াছেন; মধুমতী ঋক্ "মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা যে অমৃতবর্ষিণী গাভীকে দোহন করিয়া সোমবিন্দু বর্ষণ করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য গুহ্যাতিগুহ্য হংস, বহ্নি, ও সোম "হৌংসঃ" এই মহাবীজে একপদে মিলিত হইয়া জয়যুক্ত হউন্ ॥২॥

আবীরূপেণ নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম বিশ্বাশ্রয়ং যদ্
গত্যাত্মা সোঽপি হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্তবৃত্তিশ্চ বায়ুঃ।
রূপাণাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্ম্মমে নাম বহ্নিঃ
সর্ব্বেষাং লীনতোকঃ সলিলমিতি পুনর্ধারণেঽভূদ্ ধরিত্রী ॥৩॥

সৃষ্টির অভিমুখে ব্রহ্মের যে আদিম অভিব্যক্তি তাহা হইতেছে আবিঃ, এবং সৃষ্টির মূলীভূত পরাবাক্‌রূপে ব্রহ্ম হইতেছেন (পরম) নাদ। এতদুভয়ের সম্মিলনে, অর্থাৎ পরাবাক্ আবীরূপে,—প্রণব। এই প্রণবের মূল অভিব্যক্তি সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বব্যাপী আকাশ। সেই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী আকাশ পরিদৃশ্যমান ভূতাকাশ, এমন কি মহাকাশ মাত্র নয়; ইহা ব্রহ্মাকাশ, আকাশরূপ সচ্চিদানন্দ সামগ্রী। এই নিমিত্ত কেবল মাত্র স্থূলসৃষ্টির আধার ইহা নয়; সূক্ষ্ম এবং কারণেরও আধার এই আকাশ। এইটি ব্রহ্মের অথবা তদ্‌বাচক প্রণবের আবার

মূল আবীরূপ। এই মূল অভিব্যক্তিতেই যখন ক্রিয়োন্মুখ-কারণতারূপ গতি দেখা দেয়, তখন সেটি হয় হংস অথবা প্রাণ। আশ্রয়রূপে দেখিলে যেটি আকাশ, গতিরূপে সেটি প্রাণ, এবং স্বরূপে সেটি আনন্দ। এই প্রাণ বা হংস জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ব্যাপাররূপে বৃত্তিমান্ হইলে হয় কাল ও বায়ু। জগতে অন্তর্বহিঃ যে অপরূপ চিত্রশালা—তা'র নির্ম্মাতা হইতেছেন দিগ্‌দেশাদিপটচিত্রক অগ্নি বা বহ্নি। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের যেটি লীনতার স্থান, অর্থাৎ যেখানে গিয়া সর্ব লয় পায়, তাহাই হইল সলিল। আর যেটি এ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাই হইল ধরিত্রী বা পৃথিবী।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া এই পাঁচটি তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। ধর, বায়োস্কোপের চলচ্চিত্র দেখিতেছ। সেখানে প্রথমেই একটি আধারপট বা screen প্রয়োজন, যার উপর ছবিগুলি পড়িবে। এইটিকে আকাশরূপে কল্পনা করিতে পার। তারপর, ছবিগুলি পরপর আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে—এই যে সঞ্চরমাণতা বা গতি—এটিকে বায়ুরূপে দেখ। ছবিগুলির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপ না থাকিলে তাহা আমাদের নয়নগোচর হইতে পারে না। যাহা ছবিগুলিকে বিস্পষ্ট বা মূর্ত্ত করিয়া আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরিতেছে, সেই principle বা তত্ত্বটিকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। তারপর, ছবিগুলি দেখিতেছি কোনোটাই থাকিতেছে না, চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তা'রা যাইয়া শেষে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে বা লয় পাইতেছে? একটা জায়গায় নিশ্চয়ই তা'রা গিয়া আশ্রয় লইতেছে বা জমা হইতেছে। সেই লয়ের বা আশ্রয়ের স্থান হইতেছে সলিল বা অপ্। শেষে, দেখ প্রত্যেকটি চিত্রের বা বস্তুর একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, প্রত্যেকটা অপরটি হইতে স্বতন্ত্র। তা'দের এই নিজস্ব বিশিষ্টতাকে বজায় রাখে কে? তা'দের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ধারক যদি কোনো তত্ত্ব না থাকিত, তাহা হইলে তো সব মিলিয়া মিশিয়া একরূপ হইয়া (confused) পড়িত। তাহা তো হয় না, প্রত্যেকেই তা'র স্বকীয়বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখিয়াই চলে। ইহা সম্ভব হয় মূলে একটি ধারক তত্ত্ব থাকার দরুণ। ইহাই ধরিত্রী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকাশ সব কিছুর ধারক, আবার ধরিত্রীকেও ধারকতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, আকাশ সব কিছুর ধারক সামান্যভাবে আর ধরিত্রী বিশেষভাবে, অর্থাৎ নিখিল পদার্থব্যষ্টিকে ধরিয়া আছে। আকাশ তা'দের সকলের সামান্য আধার, Common Gronnd বা

Basis রূপে, আর ধরিত্রী প্রত্যেকটির নিজস্ব রূপকে, বিশিষ্ট রূপকে ধরিয়া রাখিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে সকল কিছুর পরম আধার প্রথম শ্লোকোক্ত সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব, তারপর, সামান্য আধার আকাশ এবং শেষ, বিশেষ আধার ধরিত্রী। প্রথমটি সর্ব্বাধার, দ্বিতীয়টি বিশ্বাধার, তৃতীয়টি কৃৎস্নাধার (support of individuality)। প্রকারান্তরে, ধরিত্রী="এই" প্রতীতির আধার ব্যোম="এই" এবং "সেই" দুই প্রতীতির আধার; আর অক্ষর পরম="এই", "সেই" এবং "না-এই-না-সেই" এই তিনেরি আধার। পরে ব্যাখ্যাত হইবে। অতএব, পরম অব্যক্তের আবীরূপ হইতে হইল প্রণব। প্রণবের আবীরূপ আকাশ। প্রণবের প্রাণরূপে প্রকাশ 'হংস' এই মন্ত্র। প্রণবের আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশ হইতেছে হং, যং, রং, বং, লং—এই পাঁচটি মূল বীজ। ক্ষরাক্ষর সর্ব্ববিধ তত্ত্বই এই গুলিতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥৩॥

মীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রৈধতে গূঢ়সন্ধি
র্নাভাবাসীন ঈষ্টেঽখিলমিহ কমঠঃ সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমশনিনখৈর্হন্তি দৈত্যান্ নৃসিংহো
যৌষ্মাকীণং সুভদ্রং সপদমপি শিরচ্ছন্দসাং মাতুরব্যাৎ ॥৪॥

সকল ছন্দের মাতা গায়ত্রী, তাঁর যেটি শির সেটি, সপ্তব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদ সহিত, তোমাদের সুমঙ্গল রক্ষা করুন; জীবের সুষুপ্তিতে অথবা প্রলয়ে যখন সকল পদার্থ লীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই লীনতার স্থান সলিলরাশিতে স্বয়ং নিগূঢ়সন্ধি রহিয়া ছন্দোমাতা গায়ত্রী মীনশক্তিরূপে নিখিল বীজ ধারণ করিয়া পুনশ্চ অভিব্যক্তির অপেক্ষায় বিদ্যমান থাকেন; আবার ইনি নিখিল বীজের নাভিতে আসীন হইয়া কূর্ম্মশক্তিরূপে তা'দিগকে সংগ্রহ ও শাসন করিয়া থাকেন; ইনিই আবার কালশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বারাহী তনুতে বিশ্বভুবনকে অধঃ হইতে উর্দ্ধে ধারণ করেন; এবং নারসিংহী তনুতে যাবতীয় ব্যূঢ় বাধা বিদীর্ণ করেন, যেমন নৃসিংহ তাঁহার বজ্রনখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়াছিলেন ॥৪॥

পূর্ব্বশ্লোকে সৃষ্টির উপাদানরূপে আকাশাদিকে যেমন দেখান হইয়াছে, এখানে তেমনি নিমিত্তরূপে চারিটি অবতার শক্তিকে দেখান হইল। সৃষ্টির সকল

বস্তুকে ধারণ করেন মীনশক্তি, তা'দের basic pattern, প্রত্যেকটির যথাযথরূপ বজায় রাখেন; আর সব কিছুকে শাসন করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখেন কূর্ম্মশক্তি; আর তা'দের ধাপে ধাপে উন্নয়ন বা উদ্‌বর্ত্তন ঘটান বরাহ; এবং বিকাশের পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন বিদারণ করেন নৃসিংহ। পঞ্চমাবতার বামনের তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এই পাঁচটিই বিশ্বব্যাপী (cosmic) ও নিত্যসক্রিয় (eternally functioning) তত্ত্ব। সর্ব্ববিধ সৃষ্টিতেই এই তত্ত্বপঞ্চক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। "পৌরাণিক ঘটনা" মাত্র এগুলি নহে। ধর সুষুপ্তি থেকে জাগৃতি; (১) সব কিছু অব্যাকৃতরূপে লীন রহিয়াছে, কিন্তু তাতে তাদের সংস্কারগুলি, পুনরভিব্যক্তির সম্ভাবনাটি বিদ্যমান; (২) প্রতিটি সংস্কার বা বীজ কোনও এক "নাভিশক্তি" (Nuclear Power) দ্বারা সংগৃহীত, শাসিত, যে কারণে তারা অব্যক্ত হইয়াও স্বরূপে (আপন Norm এবং Patternএ) বর্ত্তমান; (৩) যেগুলিকে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তোলার কোনও আবেগ (Urge) ও বর্ত্তমান; (৪) তাদের বিকাশের মুখে বাধাগুলি নিরসনের কোনও সামর্থ্যও আছে; (৫) তাদের পরিণতির এক সীমা নির্দ্দেশক—অবধি-নিয়ামক—একটা কিছু আছে। এইটি সীমা এবং সীমার পার এ দুয়েরি নিরূপক হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র।

জীবান্তর্য্যামিভেদাদ্ দ্বিবিধগতিরসৌ সংগ্রহাখ্যৈকধারা
গৃহ্ণাতেরাদিতশ্চ প্রতিলিখনবলাল্লভ্যতে যা দ্বিতীয়া।
সা স্পর্শাবেশবৃত্তির্বিপরিসহচরী যা তৃতীয়া তুরীয়া
যৈষা পূর্ব্বানুযোগাৎ প্রবহতি পরমেত্যাশ্রয়েৎ পঞ্চগঙ্গম্ ॥৫॥

পঞ্চগঙ্গাকে আশ্রয় কর। সেই পঞ্চগঙ্গার একটি ধারা সংগ্রহাখ্যা বা "সংগ্রহ" নামক। এই সংগ্রহাখ্যা ধারা জীব এবং অন্তর্য্যামী ভেদে দ্বিবিধ গতি। গ্রহ ধাতুর আদিতে "প্রতি" এই উপসর্গ যোগে 'প্রতিগ্রহ' এই যে সংজ্ঞা লাভ হয়, তাহাই হইতেছে দ্বিতীয় ধারা। এই দ্বিতীয় ধারার স্পর্শ এবং আবেশ—এই দ্বিবিধ বৃত্তি। এই ভেদগুলি পরে ব্যাখ্যাত হইবে। "বি" এবং "পরি" দুই উপসর্গ যোগে "বিগ্রহা"খ্যা এবং "পরিগ্রহা"খ্যা —এই তৃতীয় এবং চতুর্থ ধারা। আদিতে "অনু" এই উপসর্গ যোগে

'অনুগ্রহা'খ্যা—এই পঞ্চম এবং পরম ধারা। এই পঞ্চগঙ্গা সৃষ্টির সব কিছুতে অবতরণ করিয়া অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। সুতরাং এই পঞ্চগঙ্গার সমাশ্রয় ব্যতীত বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপয়ান্তর নাই। অতএব,

বিষ্ণুর পরম পদ পাইতে চাহিলে।
পঞ্চগঙ্গা ধারা ধর মহা কুতূহলে॥
'সংগ্রহ' প্রথম ধারা, জীব অন্তর্যামী।
'প্রতিগ্রহ' ধারা পরে স্পর্শাবেশগামী॥
'বিগ্রহ' ও 'পরিগ্রহ' তৃতীয় চতুর্থ।
'অনুগ্রহ' শেষ ধারা পরম পদার্থ॥
এ পাঁচে আশ্রয় ছাড়া না আছে উপায়।
বিষ্ণুর পরম পদ যাহে পাওয়া যায়॥৫॥

তিস্রো মাত্রা অকারাদ্যা নাদবিন্দূ চ মূর্দ্ধনি।
এবমোঙ্কারমীক্ষস্ব পঞ্চগঙ্গা যথাক্রমম্॥৬॥

ওঁঙ্কারকেই যথাক্রমে এই পঞ্চগঙ্গায় দর্শন কর! অকার, উকার, মকার এই তিন মাত্রা এবং মূর্দ্ধায় নাদ ও বিন্দু এই দুইটি—এই পঞ্চই হইল যথাক্রমে পঞ্চগঙ্গা। সুতরাং প্রণবকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে হইবে॥ ৬॥

আচারসঞ্চারবিচারশুদ্ধি
মাহারপূর্ব্বামপি সন্দধীত।
যুঞ্জীত তাভির্জিতসঙ্গদোষঃ
প্রচারশুদ্ধিং ক্রতুসিদ্ধিগোপ্ত্রীম্॥৭॥

সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ের নিমিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক: আহারশুদ্ধি, আচারশুদ্ধি, বিচারশুদ্ধি, প্রচারশুদ্ধি ও সঞ্চারশুদ্ধি। এ সকল শুদ্ধির মধ্যে প্রচারশুদ্ধি, সাধনক্রিয়ার যাহা সিদ্ধি সেটিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।' আহার, আচার ও বিচারশুদ্ধির দ্বারা সঙ্গদোষ জয় করা যায় এবং সঞ্চারশুদ্ধি দ্বারা যুঞ্জান ও যুক্ত হওয়া যায়॥ ৭॥

পুনাতি হ্যন্নমাহারোঽসূনাচারস্ততঃ ক্রমাৎ।
অঞ্জসৌপয়িকাশ্চান্যে পুনন্তি কোষপঞ্চকম্ ॥৮॥

আহারশুদ্ধি অন্নময় কোষকে শোধন করে, আচারশুদ্ধি প্রাণময় কোষকে; বিচারশুদ্ধি মনোময়কে; প্রচারশুদ্ধি বিজ্ঞানময় এবং সঞ্চারশুদ্ধি আনন্দময় কোষকে শুদ্ধ করিয়া থাকে। এইভাবে শুদ্ধিপঞ্চক কোষপঞ্চক-শোধনের নিশ্চিত ও প্রকৃষ্ট উপায় ॥ ৮ ॥

অণুতনুপৃথুভেদৈর্গৃহ্যতে কোষদোষ-
স্ত্বধিকরণনিধানাৎ পার্থিবাদিত্বমেতি।
ত্রিতয়মপি মলানাং পাঞ্চমল্যং পুনর্বা
প্রণবপুটিতশুদ্ধিস্তানপাস্তান্ করোতি ॥৯॥

কোষপঞ্চকে যে দোষ বা মল রহিয়াছে, তাহা অণু, তনু ও পৃথুভেদে ত্রিবিধ। ইহার ভিতরে যেটি মলের সূক্ষ্মতম বা কারণ অবস্থা, তাহাকে বলে অণু বা 'আণব' মল। সূক্ষ্ম মলকে বলে তনু বা 'মানস'; আর স্থূল বা ব্যক্ত মলকে বলে পৃথু বা 'পার্থিব'। শৈবাগমের আণবাদি মলত্রয়ও এ স্থলে অলোচ্য। এই মল আবার অধিকরণ অনুসারে, অর্থাৎ কোথায় রহিয়াছে এই বিচারে, অন্নাদিরূপে পঞ্চবিধ, অর্থাৎ অন্নগতমল, প্রাণগতমল ইত্যাদি। মল ত্রিবিধই হউক আর পঞ্চবিধই হউক, প্রণব (অথবা ঈশ্বরবাচক) জপাশ্রিত আহারাদিশুদ্ধি তাহাদিগকে বিদূরিত করে ॥ ৯ ॥

পঞ্চমাত্রা অকারাদ্যা আহারাদিকপাবকাঃ।
তাভিঃ পুনীত বাচস্ত তনূঃ পুনীত তৈরপি ॥১০॥
পঞ্চগঙ্গাঃ পুনীরন্ গাঃ পঞ্চগব্যানি বৈ তনূঃ।
মূলস্পন্দনবৈরূপ্যে সারূপ্যং বিদ্ধি পাবনম্ ॥১১॥

প্রণবাদি বীজমন্ত্রে অকারাদি পঞ্চমাত্রা হইতেছে পঞ্চগঙ্গা, আর আহারাদি পঞ্চশুদ্ধি হইতেছে পঞ্চগব্য। পঞ্চগঙ্গার দ্বারা বাক্‌কে পবিত্র কর, এবং পঞ্চগব্যের—আহারাদি পঞ্চপাবকেরদ্বারা স্থূল সূক্ষ্মাদি তনু পবিত্র কর। মূলীভূত

স্পন্দন কোনও কারণে বিরূপ হইলে যাহার দ্বারা তাহার আবার সারূপ্য ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই পাবন অথবা শুদ্ধি বলিয়া জানিবে। অতএব মূল স্পন্দনে বিরূপতা দূর করিয়া তাহার স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্য পুনরায় আনয়ন করাই সকল শুদ্ধির লক্ষ্য ॥ ১০—১১ ॥

অরিচ্ছন্দো বিষচ্ছন্দঃ স্পন্দস্য প্রাতিকূল্যতঃ।
মিত্রচ্ছন্দো মধুচ্ছন্দো যদানুকূলতান্বয়ম্ ॥১২॥

স্বভাব ও স্বচ্ছন্দের প্রতিকূল স্পন্দন যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে অরিচ্ছন্দঃ ও বিষচ্ছন্দঃ; এবং যদ্দ্বারা স্বভাব স্বচ্ছন্দের অনুকূলতা অক্ষুণ্ণ থাকে, অথবা ক্ষুণ্ণ হইলে আবার সেটি স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বলে মিত্রচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দঃ ॥ ১২ ॥

বিপশ্চিচ্ছন্দসাং মাতুর্ব্রহ্মযোনেঃ স্বরূপতাম্।
সমীহতে মধূচ্ছন্দঃ ক্রমবর্ত্মানুসারতঃ ॥১৩॥

যিনি ব্রহ্মযোনি ছন্দোমাতা গায়ত্রী, যিনি সাক্ষাৎ অমৃত দোহন করেন, ধীর এবং বিজ্ঞ সাধক, মধুচ্ছন্দে ক্রমবর্ত্ম অনুসরণ করিয়া তাঁহারই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্নবান্ হ'ন ॥ ১৩ ॥

আনুরূপ্যঞ্চ সারূপ্যং প্রাতিরূপ্যৈকরূপতে।
চতুর্ণামনুযোগিত্বমভাবস্য বিরূপতা ॥১৪॥

যে বস্তু যাহা ঠিক সেইটিই তাহার স্বরূপ। এই স্বরূপের অনুগত এবং অনুকূল হয় চারিটি:—অনুরূপ, সমরূপ, প্রতিরূপ এবং একরূপ। ইহার ভিতর স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয়—এই তিনপ্রকার ভেদের কোনোটিই না থাকিলে, সেটি হয় স্বরূপের সঙ্গে একরূপ; স্বগতভেদ অল্পবিস্তর থাকিলেও সজাতীয় ভেদ যদি না থাকে, তবে হয় সমরূপ বা সরূপ; স্বগত এবং সজাতীয় এই উভয় ভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি বিজাতীয় ভেদের অভাব হয় তবে হয় প্রতিরূপ; আর বিজাতীয় ভেদ কিয়ৎপরিমাণে রহিয়াও যদি সেটি স্বরূপের অনুগত ও অনুকূল হয়, তবে হয় অনুরূপ। এখন এই চারিটিরই (অর্থাৎ অনুরূপতা ইত্যাদির) অভাব যেখানে থাকে তাহাকে বলে বিরূপতা বা

বৈরূপ্য। মিত্রচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দঃ দ্বারা মূলস্পন্দনের সঙ্গে বিরূপতা বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ অনুরূপতা, প্রতিরূপতা, সমরূপতা এবং একরূপতা হইয়া থাকে ॥ ১৪।

দিবৌকসৌ যদিচ্ছন্তোঽবারিয়ুর্বেদমাতরম্।
অমৃতচ্ছন্দসা স্বেন তদমৃতমদূদুহৎ ॥১৫॥

সকল ছন্দের মাতা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী স্বয়ং হইতেছেন পরম মধুচ্ছন্দঃ। প্রণবের ছন্দ গায়ত্রী। প্রণবে এই ছন্দ ব্যক্তভাবে না থাকিলেও অব্যক্ত বীজভাবে রহিয়াছে। সেই অব্যক্ত বীজের ভিতরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়। ব্রহ্মবর্চ্চঃ (অগ্নি) প্রণবের দেবতা, সুতরাং ব্রহ্মবর্চ্চসের অনুগ্রহে প্রণবের মধ্যে নিগূঢ় ছন্দোমাতাকে প্রকাশিত করার নামই প্রণবের সাধনা। প্রকাশিত হইলে, প্রণব সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই বাঙ্ময় রূপ; সুতরাং এই বিশ্বই প্রণবের রূপ। 'ওঁঙ্কারমেবেদং সর্ব্বম্'। দেবতারা যেটিকে ইচ্ছা করিয়া বেদমাতাকে বরণ করিয়াছিলেন, বেদমাতা আপন অমৃতচ্ছন্দ দ্বারা দেবতাদের নিমিত্ত সেই অমৃত দোহন করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

অধ্মাসীচ্ছ্রুতিসারমূর্জিতমৃতং শঙ্খং য এবাপিপদ্
যঃ সৌদর্শনমধ্বরং কুশলকৃচ্ছন্দোভিরাতীতনৎ।
যোঽদারীন্মধুকৈটভোরুসহসং কৌমোদকীং গীর্পতি
র্ধৃত্বাজং ব্যচকাশদাশু সুধিয়াং বোধায় তস্মৈ নমঃ ॥১৬॥

শ্রুতিসার যে প্রণব, সেই প্রণবের যাহা নিরতিশয় শুদ্ধ ও সমর্থ স্বরূপ (ঋতং ঊর্জিতং), সেটিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খরূপে যিনি বাদন করিয়াছিলেন (অধ্মাসীৎ); কুশলকর্ম্মা যিনি আবার এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ যজ্ঞকে তাঁর সর্ব্বতোভদ্র সুদর্শন চক্ররূপে চালিত করিয়াছিলেন (আপিপৎ) এবং বিচিত্র ছন্দসমূহের দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছিলেন (আতীতনৎ); পুনশ্চ যিনি এই বিশ্বযজ্ঞের মহাবাধা-স্বরূপ মধুকৈটভের বিপুল সাহসকে কৌমোদকী গদা ধারণ পূর্ব্বক বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, (কৌ—বেদে, মোদক—রসয়িতা; অতএব, কৌমোদকী—বেদমন্ত্রসমূহের যাহা চেতয়িতা ও রসয়িতা), সেই গীষ্পতি ভগবান্ এই

সমস্ত বাধা নিরসন পূর্ব্বক স্বয়ং পদ্মপাণিরূপে প্রজাপতির বুদ্ধিরূপ (বাঙ্‌মনোরূপ) কমল আশু বিকশিত করাইয়াছিলেন (ব্যচকাশং), সুধীগণের বুদ্ধি যাহাতে সম্যক্ বেদোজ্জ্বলা হয় (বোধায়), সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্‌কে সেই নিমিত্ত নমস্কার করিতেছি ॥ ১৬ ॥

ঋতং বিদ্যান্মহাকালীং সত্যং বিদ্যাৎ সরস্বতীম্ ।
ছন্দো বিদ্যান্মহালক্ষ্মীং যোজিতে যেন তে উভে ॥১৭॥

ঋতকে মহাকালী বলিয়া জানিবে এবং সত্যকে মহাসরস্বতী বলিয়া জানিবে এবং যে ছন্দ ঋত এবং সত্যকে পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া রাখে, তাহাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া জানিবে ॥১৭॥

ঋতাধ্বনা লয়ং যাতি প্রপঞ্চোপশমং পুনঃ ।
অস্তিতয়া চকাস্তীদং সত্যেন সচ্চিদাত্মনা ॥১৮॥

ঋতকে আশ্রয় করিলে এই প্রপঞ্চের উপশমরূপে যে লয়, সেই লয় প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ সচ্চিদাত্মস্বরূপ যে সত্য তাহা দ্বারা এই সমস্ত অস্তিতা ও ভাতিতারূপে রহিয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে ॥১৮॥

পিহিতস্যাপি সর্ব্বস্মিন্নানন্দস্যাবগুণ্ঠনম্ ।
যদপাবৃণুতে সুষ্ঠু মধুচ্ছন্দস্তদীরিতম্ ॥১৯॥

অস্তি ও ভাতিরূপে সব কিছু রহিয়া এবং প্রকাশিত হইয়াও তাহাদের আনন্দস্বরূপ যেন কি একটা অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ; এই নিমিত্ত সমস্ত কিছুই যে আনন্দ এবং আনন্দই ব্রহ্ম এ ভাবে ভান হইতেছে না। যদ্দ্বারা স্বরূপগত আনন্দের যেটি অবগুণ্ঠন সেটির সর্ব্বথা উন্মোচন হইয়া থাকে, তার নাম মধুচ্ছন্দঃ ॥১৯॥

ঋতং তদনৃতং জ্ঞেয়ং যদৃচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ।
অবস্থত্যালয়ঞ্চৈকমন্যদ্দ্বৈতং নিরস্যতি ॥২০॥

যেটির কেবলমাত্র গতিই আছে, কিন্তু স্বরূপতঃ স্থিতি নাই, সেটিকে অনৃত বলিয়াই জানিবে, সেটি ঋত নয়। যাতে অনৃত থাকে, অথবা যেটিকে অনৃত

আশ্রয় করে, সেটি শ্রম, ক্লান্তি, মৃত্যুর অধিকারেই থাকে, কিন্তু ঋত সকল দ্বৈত, সুতরাং ভয় নিরসনপূর্ব্বক, নিত্যস্থিতিতে লইয়া যায় ॥২০॥

খড়্গমুণ্ডকরা সব্যে করালী প্রলয়ঙ্করী।
বরাভয়করাঽসব্যে কালী কৈবল্যদায়িনী ॥২১॥

মা কালী বামে খড়্গমুণ্ডকরারূপে করালী প্রলয়ঙ্করী সাজিয়াছেন, তিনিই আবার দক্ষিণে বরাভয়করারূপে কালী কৈবল্যদায়িনী হইয়াছেন। এখানে একদিকে অনৃতের অথবা মৃত্যুর রূপ, অন্যদিকে ঋতের অথবা অমৃতের রূপ ॥২১॥ (কালিকারহস্য উপোদ্ঘাতের শেষাংশে।)

অস্তীতি চ চকাস্তীতি সংসর্গবিরহাদিমে।
ঋতস্য ছন্দসো বোধে প্রমাত্বেতরতামিতঃ ॥২২॥

আমাদের সকল কিছু বোধ অস্তি এবং ভাতি এইভাবে হইলেও তা'র মধ্যে কোনোটা বা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হয়, আবার কোনোটা বা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হয়। যেমন, রজ্জুসর্প, গন্ধর্ব্বনগর ইত্যাদি। এরূপ হওয়ার কারণ কি? অস্তি ও ভাতিরূপে সর্ব্বত্র তো একই রূপ। যথার্থ জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের ভেদ কি প্রকারে আসিয়া থাকে, এটি বুঝিতে গেলে আমাদের বিচার করিতে হয় যে অস্তি ও ভাতিমাত্র এই বোধের সঙ্গে অপর এক বস্তু বিদ্যমান আছে অথবা নাই। সে অপর বস্তুটি বিদ্যমান থাকিলে প্রমা হয়, অন্যথা অপ্রমা। সেই অপর বস্তুটির নাম ঋতচ্ছন্দ। সুতরাং ঋতচ্ছন্দ সহকারে যে অস্তি ও ভাতির বোধ, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, এবং সেটির আশ্রয় ব্যতিরেকে যে অস্তি ও ভাতির বোধ সেটি মিথ্যাজ্ঞান ॥২২॥

ঋতস্য ছন্দসো জ্ঞেয়া সত্যত্বে ব্যবসায়িতা।
মধুচ্ছন্দঃ সমাবৃত্ত্যা চানন্দে পর্য্যবস্যতি ॥২৩॥

ঋতচ্ছন্দ তাহাকেই জানিবে যাহা দ্বারা সত্যত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে; এবং মধুচ্ছন্দ তাহাকে জানিবে যেটি সমাবৃত্তি দ্বারা আনন্দে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয় ॥২৩॥

উভাত্মকেন ছন্দসা ভূমা যো বৈ রসোঽপি সঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্য স্বারূপ্যমীহ্যতে ॥২৪॥

উভয়াত্মক ছন্দ দ্বারা, অর্থাৎ সম্মিলিত ঋতচ্ছন্দ ও মধুচ্ছন্দ দ্বারা সাক্ষাৎ রসস্বরূপ যে ভূমা, সেই ভূমার স্বারূপ্য, অন্বয়মুখে এবং ব্যতিরেকমুখে লাভ করিতে চেষ্টিত হও। "মধু বাতা ঋতায়তে"—ইত্যাদি হইল অন্বয়মুখে অন্বেষণ; এবং "নেতি নেতি" করিয়া সকল অল্প এবং খণ্ডিত নামরূপ পরিহারপূর্ব্বক যে শুদ্ধ একরস ব্রহ্মানুভূতি হয়, সেটি হইল ব্যতিরেকমুখ ॥২৪॥

উভাত্মকতয়া সম্যগাব্রহ্মাকারবৃত্তিতা।
বর্ত্তিতা যেন তচ্ছন্দঃ সমাবৃত্তিতয়োদিতম্ ॥২৫॥

এখন বিচার করিতে হইবে সমাবৃত্তি কাহাকে বলে। যে ছন্দ ঋতচ্ছন্দ ও মধুচ্ছন্দ এই দুইরূপে সম্যক্ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি পর্য্যন্ত উপনীত হওয়ার যেটি ধারা, সেটিকে প্রবর্ত্তিত করে, সেই ছন্দই 'সমাবৃত্তি' এই নামে কথিত ॥২৫॥

সত্যমেব সকারঃ স্যান্ মকার ইতি যন্মধু।
আনন্দশ্চ য আকারো বকারো ব্রহ্মতা পুনঃ ॥২৬॥
ঋতং বিদ্যাদৃকারেণ তর্ত্তুং তপ্তুঞ্চ তদ্বয়ম্।
জনিমৃতিস্হতেঃ পারমাত্মনীয়াদিসংজ্ঞকঃ ॥২৭॥

এইবার 'সমাবৃত্তি' এই শব্দের অক্ষরগুলি বিচার করিয়া দেখ। সত্যই 'স'কার, সেটি মধু সেটি 'ম'কার, আনন্দ 'আ'কার, 'ব'কার হইতেছে ব্রহ্মত্ব, 'ঋ'কার হইতেছে ঋত, দুইটি 'ত'কারের মধ্যে একটি হইতেছে তরণ এবং অপরটি হইতেছে তৃপ্তি, অর্থাৎ একটি শ্রেয়ঃ, অপরটি প্রেয়ঃ; বাকী যে হ্রস্ব 'ই'কার থাকিল তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের পারে যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বরূপ রহিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপে লইয়া যাইতে সমর্থ। ইহাই 'হ্রি'কারের রহস্য ('ই' ধাতু = গমন) ॥২৬—২৭॥

সমিতি চানুসন্ধত্তে ধামেত্যাকারসূচিতম্।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্ত ইতি চরমবৃত্তিতা ॥২৮॥

পুনশ্চ বিচার কর—'সম্' এই শব্দের দ্বারা 'অনুসন্ধান কর' এই অভিপ্রায়

বুঝিতে হইবে ; সম্‌এর পর যে 'আ'কার রহিয়াছে, সে আকার ধামবাচক। কিন্তু সে ধাম কোন্ ধাম ? যে ধামে যাইয়া আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই পরম ধামই লক্ষ্যার্থ। সুতরাং সমাবৃত্তি বলিলে সেই প্রকার অনুসন্ধান বুঝিতে হইবে যাঁহা পরম ধামে 'বৃত্তি' কিনা, বিশ্রান্তি ঘটাইয়া দেয় ॥২৮॥

গায়ত্র্যাকার আয়াতি মধুমত্যা সমিত্যৃচা।
হংসবত্যা চ বৃত্তিত্বং হৌংস ইত্যর্থ্যতে ত্রিভিঃ ॥২৯॥

মধুমতী ঋক্ হইতে 'সম্', গায়ত্রী ঋক্ হইতে 'আ'কার, হংসবতী ঋক্ হইতে 'বৃত্তি'—এইভাবে 'সমাবৃত্তি' এই শব্দে তিনটি ঋকের ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। আবার যেহেতু আমরা দেখিয়াছি যে "হৌংসঃ" এই বীজে ঐ তিনটি ঋক্ সম্মিলিত হইয়াছেন, অতএব সমাবৃত্তির মন্ত্র হইতেছেন "হৌংসঃ" ॥২৯॥

সমিত্যস্য ত্রিধা বৃত্তিরাকারস্য পুনস্তথা।
তদ্ধানিমদবৃত্তিত্বং সমাবৃত্তিরিতীরিতম্ ॥৩০॥

পরে আমরা দেখিতে পাইব যে 'সম্' ইহার ত্রিবিধ বৃত্তি এবং আকারেরও ত্রিবিধ বৃত্তি। সুতরাং 'সমা' এই শব্দের উক্ত ত্রিবিধ বৃত্তি যেস্থলে নাই, সেস্থলে সমাবৃত্তিও নাই—এইরূপ অনুমান করিতে হইবে ॥৩০॥

সত্ত্বং জ্যোতিষ্টরসত্বে মা গময় ইতি শ্রুতিঃ।
সমাবৃত্তিমৃতে তু স্যান্ মা গমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৩১॥

শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"অসৎ হইতে সৎ-এ লইয়া চল। তমঃ হইতে জ্যোতিঃতে এবং মৃত্যুরূপ মহাদুঃখ হইতে সাক্ষাৎ রসস্বরূপ অমৃতে"—এই গমন বা অভ্যারোহ সমাবৃত্তি ব্যতীত সম্ভবে না। সমাবৃত্তিব্যতিরেকে অসত্য, অজ্ঞান ও মৃত্যুর পারে অনন্তকালেও উত্তীর্ণ হইবে না ॥৩১॥ ('গময়' প্লুতভাবে উচ্চারিত, সেইজন্য সন্ধি হইল না।)

কিঞ্চিদ্ বা বাধতে সম্যক্ সম্যগন্বেতি কিঞ্চন।
বিশিনষ্টি পুনঃ সম্যক্ তিস্রঃ সমিতি বৃত্তিতাঃ ॥৩২॥

এইবার সেই ত্রিবিধ বৃত্তি যে কি—তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। 'সম্যক্

এই শব্দটির ভিতরেই ঐ তিন প্রকার বৃত্তি লক্ষ্য করিতে হইবে। কিরূপে? কোনো কিছু সম্যক্‌রূপে বাধিত হয়, আবার কোনো কিছু সম্যক্‌রূপে অন্বিত হয়, আবার অপর কিছু সম্যক্‌রূপে বিশেষিত বা নিরূপিত হয়। এই তিন প্রকার "সম"এর বৃত্তি বুঝিতে হইবে। কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন, কোথায় কোথায় সে-তত্ত্বটির অন্বয় রহিয়াছে, তাহার দর্শন এবং তত্ত্বটির স্বরূপে প্রবেশ এই তিনটি সর্ব্বথা না হওয়া পর্য্যন্ত সমাবৃত্তি হয় না ॥৩২॥

সঞ্জানীতে সমাবৃত্তৌ সমীক্ষতে সমেতি চ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুঞ্চ স্বরূপতো যথাক্রমম্ ॥৩৩॥

অতএব সমাবৃত্তিতে সম্যক্‌রূপে জানে, সম্যক্‌রূপে দেখে এবং সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হয়, কি না, তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া যায়। যে কোনো তত্ত্বকে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হইতে গেলে এইটিই ক্রম বলিয়া জানিবে—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুঞ্চ" ॥৩৩॥

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চাগ্নাষোমৌ চ নাদবিন্দুকৌ।
প্রাণাপানাবিতি দ্বন্দ্বাশ্চাধ্যাত্মিকাদয়স্ত্রয়ঃ ॥৩৪॥
সম্যগ্‌বর্ত্তেরনস্যাং বৈ সমাসসমতাম্বিতাঃ।
অতএব সমাবৃত্তিরিতি ব্যুৎপাদ্যতে হি সা ॥৩৫॥

সূর্য্য ও চন্দ্রমা, অগ্নি ও সোম, নাদ ও বিন্দু, প্রাণ ও অপান ইত্যাদি বিবিধ দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এবম্বিধ সর্ব্বপ্রকার ত্রিপুটীভেদ যে অবস্থায় পরস্পরের বৈষম্য ও বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক সুষম সমন্বয় লাভ করে, সেই অবস্থা সমাবৃত্তির লক্ষ্য জানিতে হইবে। সমা—সমঞ্জসা, বৃত্তি গতি ও স্থিতি। ধর,—প্রাণ ও অপান এই দুইটি বৃত্তি। এই দুইটি বৃত্তি পরস্পরের সহিত সঙ্গত রহিয়াছে বটে, কিন্তু সচরাচর সুসঙ্গত হইয়া নাই, অর্থাৎ প্রাণ ব্যাপার ও অপান ব্যাপারের মধ্যে সমতা রক্ষিত হইতেছে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই সমতা রক্ষার যত্ন করিতে হয়—"প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা" অগ্নি ও সোম প্রভৃতি যুগ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও এবম্বিধ সমতা বিধানের যত্ন করিতে হইবে। এই সমস্ত সাধনই সমাবৃত্তির অঙ্গ ॥৩৪-৩৫॥

ছন্দসাং সমতাবৃত্তিঃ সমাসতঃ সমঞ্জসা।
সমাবৃত্তির্হি সা জ্ঞেয়া ব্যাসবিষমতাং বিনা ॥৩৬॥

পুনশ্চ, যখন সমাস অথবা অবিভক্ত অবস্থা হইতে ব্যাস অথবা বিভক্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে, তখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ব্যাস-বিষমতা আসিয়া উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ বিভক্ত হইয়াও যেন প্রাণাপানাদি বিষমতা প্রাপ্ত না হয়। যথা, কুম্ভকে বায়ু স্থির হইয়া প্রাণ ও অপানের স্বতন্ত্র বৃত্তিদ্বয়ের লয় ঘটায়; কুম্ভকের অবসানেও এটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রাণ ও অপান বৃত্তিদ্বয় সুষমভাবেই প্রবর্ত্তিত হইল, বিষমভাবে নয়। মন্ত্রসহকারে জপাদি সাধনেও এই দুইটি মূল সূত্র অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—সমাসে অথবা জপস্পন্দনসমূহের সমুচ্চয়ে সমতা রহিবে, এবং সমুচ্চয় হইতে আবার বিচয়ের ভূমিতে ফিরিয়া আসিলেও বিষমতা উপস্থিত হইবে না। প্রাণায়ামের ফলে যেরূপ প্রাণাপানাদির লয় হইয়া বায়ুর স্থিরতা বা কেবল কুম্ভক উপস্থিত হয়, সেরূপ জপ করিতে করিতেও শুদ্ধ প্রণবে অথবা অনাহত ধ্বনিতে অথবা নাদে জপের লয় হইয়া যায়। এবম্বিধ লয়ের অবস্থা শান্ত অবস্থা। ক্ষোভ অথবা উত্তেজনা রহিলে বুঝিতে হইবে সমাস-সমতা ঘটে নাই। কোনও বাধা দ্বারা আহত হইয়া জপ মূর্চ্ছিত ও স্তব্ধ হইয়াছে মাত্র। এইপ্রকার জপমূর্চ্ছা কাম্য নহে। পুনশ্চ, অব্যক্ত শান্ত ভূমি হইতে জপ যখন ব্যক্তরূপে সক্রিয় হয়, তখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ব্যাস-বিষমতা দোষ আক্রমণ না করে। জপজন্য যে সত্ত্বোদ্রেক হয় তা'র ফলেই উক্তপ্রকার অব্যক্ত শান্ত ভাব। কিন্তু সত্ত্বেও উদ্রেক হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মে রজঃ ও তমের দিক্ দিয়া প্রতিক্রিয়া হ'বার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। পুরাণের আখ্যায়িকায় ইহাই হইল মধু ও কৈটভের প্রাদুর্ভাব। জপজন্য যে তন্ময়ভাব সেটির অবসানে যখন আবার স্পষ্টতঃ জপক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ'বার উপক্রম করি, তখন রজঃ ও তমের সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়াটি বাস্তবরূপে দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে ব্যাস-বিষমতা দোষ আসিবে। অতএব, লক্ষ্য রাখিতে হইবে জপের তন্ময়তা হইতে নামিয়া আসিয়াও যাহাতে জপের নিরুপদ্রব প্রশান্তবাহিতায় রহিয়া যাইতে পারি। "সমাবৃত্তি" বলিলে আরোহ ও অবরোহ—দুই ক্ষেত্রেই নিরুপদ্রব সমতাটি বুঝিতে হইবে ॥৩৬॥

নাদবিন্দুকলাত্মা যঃ প্রণবাদিবপুশ্চ যঃ।
গিরাং চতুষ্টয়ং যস্য চত্বারো বাহবঃ ক্রমাৎ ॥৩৭॥
শঙ্খেন বৈখরীং বাচং গদয়া মধ্যমাং গিরম্।
সুদর্শনেন পশ্যন্তীং পদ্মেন চ পরাং ভ্রিয়াৎ ॥৩৮॥
একদন্ত উদগ্রেণ দতা ব্যামোহদারকঃ।
মূষিকো বাহনং যস্য সোঽব্যাদ্রহস্যবিগ্রহঃ ॥৩৯॥

যিনি নাদবিন্দুকলাত্মা, প্রণবাদি বীজমন্ত্র যাঁহার শরীর, বাক্‌চতুষ্টয় যাঁহার চারিটি বাহু, সেই গণপতিকে স্মরণ করিতেছি। তিনি শঙ্খের দ্বারা বৈখরী বাক্ গদা দ্বারা মধ্যমা, সুদর্শনের দ্বারা পশ্যন্তী এবং পদ্মের দ্বারা পরা বাক্ ভরণ করিতেছেন। সেই রহস্যবিগ্রহ (Mystic Figure) ভগবান্ একদন্ত তাঁহার উদগ্র দন্তের দ্বারা ব্যামোহ বিদারণ করিয়া থাকেন ; মূষিক তাঁহার বাহন ; তিনি আমাদের রক্ষা করুন্ ॥৩৭-৩৯॥

দ্বে রূপে মূষিকস্যাস্য সিতাসিতেঽখিলাত্মনঃ।
কৃৎস্নচ্ছিদশ্চ ভূতানামন্তঃকুহরগাহিনঃ।
নক্তন্দিবঞ্চ সর্ব্বেষামায়ুর্মূলানি কৃন্ততঃ ॥৪০॥

তাঁহার বাহন মূষিক অখিলাত্মা বিশ্বরূপ ; সেই মূষিকের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি রূপ। তিনি নিখিল ভূতের অন্তঃকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত 'কর্ত্তন' অর্থাৎ ছিন্ন করিতেছেন, এবং রাত্রি ও দিবা (কৃষ্ণ ও শুক্ল) এই দুই রূপে চরাচর সর্ব্বভূতের আয়ুর মূল কাটিয়া যাইতেছেন ॥৪০॥

ব্যস্তৌ চ বিষমৌ যৌ তু নাসাবিবরচারিণৌ।
রূপে মূষিকবর্য্যস্য তৌ জানীয়াদ্ বিশেষতঃ ॥৪১॥

প্রাণীর নাসাবিবরচারী ব্যস্ত ও বিষম যে দু'টি বায়ু—প্রাণ ও অপান —সেই দুটিকে বিশেষভাবে মূষিকবরের রূপ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নাসিকারূপ ছিদ্রের মধ্যে একবার প্রবিষ্ট হইতেছে ও আবার বাহির হইয়া আসিতেছে যে প্রাণ ও অপানরূপ বায়ু, তাহাই যেন মূষিকের

প্রকট রূপ, কারণ ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর আয়ু অজ্ঞাতসারে ক্ষয় বা নাশ প্রাপ্ত হইতেছে ॥৪১॥

সমাসেন সমত্বেন সংযমেন সমীহয়া।
তয়োঃ সন্ধৌ সমারোহং নাদবিন্দুকলাত্মনঃ ॥৪২॥
ওঙ্কারস্য বিজানীত মাতৃকাগণগীঃপতেঃ।
সমাবৃত্তিং গণেশস্য যা বহুশ্রেয়সী মতা ॥৪৩॥

প্রাণ-সংযম ও মনঃসংযম দ্বারা এই ব্যস্ত ও বিষম বায়ুদ্বয়ের সমাস-সমতা বিধান পূর্ব্বক তাহাদের যেটি স্থির সন্ধি তাহাতে সমারোহণ করিতে হইবে।

যিনি নাদবিন্দুকলাত্মা ওঁঙ্কার, তিনি মাতৃকাগণ-বাচস্পতি স্বয়ং গণেশ, অর্থাৎ গণেশই ওঁঙ্কারের প্রকট মূর্ত্তি। প্রাণ-মনের সংযমন দ্বারা ব্যাস-বিষমতা পরিহার পূর্ব্বক সমাস-সমতায় ওঁঙ্কারের শান্তস্বরূপে স্থিতি—ইহাকেই সমাবৃত্তি বলিয়া জানিবে। এবম্বিধ সমাবৃত্তি বহু শ্রেয়োলাভের হেতু ॥৪২-৪৩॥

সমাবৃত্তৌ সমাধানং প্রত্যাবৃত্তৌ প্রতিক্রিয়া।
পরাবৃত্তৌ পরেত্যস্য পারীণবৃত্তিতা মতা ॥৪৪॥

[ওঁঙ্কারের অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু, শান্ত, শান্তাতীত—এই সাতটি লোক আছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটিতে প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল অকার, উকার, মকার—এই তিনের আশ্রয়ে প্রণবজপে আমাদের এই ব্যস্ত ও বিষম অবস্থায় ফিরিয়াই আসিতে হয়। যদি নাদ ও বিন্দুর অনুগ্রহ লাভ ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যাবর্ত্তনের বেগ কাটাইয়া শান্ত ভূমিতে আরূঢ় হ'বার বেগ লাভ হয়। এই দ্বিতীয় বেগটি না আসা পর্য্যন্ত আমরা সমাবৃত্তি ধারায় পতিত হইতে পারি না।] সমাবৃত্তিতে লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে ব্যবধান দূর হইয়া থাকে। ব্যবধান দূর হইলেই সমাধান হয়। প্রত্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিযোগী ক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই দুইটি ব্যতীত আরও একপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহার নাম পরাবৃত্তি। এই পরাবৃত্তির অর্থ—যে ভূমিতে বা স্তরে যেভাবে বৃত্তি হইতেছে, সে ভূমি, স্তর, বা ভাব অতীত হইয়া যাওয়া।

যেমন প্রণবজপের ফলে যদি শান্ত ভূমিতে উপনীত হই, তাহা হইলে যে বৃত্তির দ্বারা আবার সেই শান্ত ভূমিরও পারে—শান্তাতীতে, গতি হয়, তাহাকে পরাবৃত্তি বলা যাইবে ॥৪৪॥

অনুক্রমোঽনুবৃত্তৌ চ ব্যাবৃত্তৌ ব্যূঢ়বাধনম্ ।
অন্যোন্যতা পরীতৌ চ বৈকল্পিকী হ্যতাদৃশী ।
এবং ভেদা ইমে পঞ্চ বিদ্যন্তে সর্ব্ববৃত্তিষু ॥৪৫॥

এইস্থলে সকল প্রকার বৃত্তিতে পাঁচটি ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথমে, ব্যাবৃত্তি। ইহার দ্বারা সর্ব্বভূত ও নিখিল প্রাণী এক একটি ব্যূহরূপ ধারণ করিয়াছে। এই ব্যূহরূপ ধারণের ফলে তাহাদের ব্রহ্মস্বরূপ অথবা ওঁঙ্কারস্বরূপের বাধ হইয়াছে। ব্যূহরূপতা প্রাপ্তির ফলে সমস্ত কিছুই অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের বিষয় হইয়াছে। যখন এই ক্লেশসঙ্কুল ব্যূহরূপতা নিজেকে শিথিল বা মুক্ত করার চেষ্টা করে, তখন যে বৃত্তিটি উদিত হয়, সেটি হইল দ্বিতীয়—অনুবৃত্তি। কিন্তু অনুবৃত্তি উদিত হইলেই তাহাতে নিরুপদ্রব নৈরন্তর্য্য আসে না; অর্থাৎ, এই বৃত্তিটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং ব্যাহত হয়। প্রকৃতি-জন্য প্রতিক্রিয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ব্যূহটি খুলিতে খুলিতে আবার বন্ধ হইয়া যায়, ঋজু হইতে হইতে আবার কুটিল হইয়া পড়ে। এই তৃতীয় বৃত্তির নাম—প্রত্যাবৃত্তি। কিন্তু ব্যূহমোচনের অনুকূলে যেটি বেগ, সেটি যদি ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে ব্যূহের সম্প্রসারণ এবং শঙ্খাবর্ত্ত ভঙ্গীতে ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হইতে থাকে। এইটি চতুর্থ বৃত্তি—পরিবৃত্তি। কিন্তু পরিবৃত্তি আরম্ভ হইলেই বিপদ কাটিয়া গেল না; কেননা, তখনও ব্যূহাকারে বদ্ধ রহিবার যে বেগ এবং ব্যূহ হইতে মুক্ত হইবার যে বেগ—এই দুই বেগের অন্যোন্যতা অর্থাৎ পারস্পারিক অপেক্ষাটি রহিয়া যায়। সুতরাং এই পরিবৃত্তির ক্ষেত্রে আসিয়াও আমাদের সাবধান হইতে হয় যাহাতে বৃত্তি বৈকল্পিকী না হয় এবং অতাদৃশী না হয়। বৈকল্পিকী অর্থ—যেটি লক্ষ্য এবং যেটি লক্ষ্য নয়—এই দুইএর মধ্যে অনিশ্চয়বৃত্তিতা; কোন্‌টি মিত্রছন্দ, কোন্‌টি মিত্রছন্দ নয়—ইহাতে সংশয়-দোলায়মান অবস্থা। অতাদৃশী অর্থ—গতি ও স্থিতির যেটি ঋত ও সত্যরূপ, সেটির অনুরূপ না হইয়া বিরূপ হওয়া। এই দ্বিবিধ অন্তরায় পরিহার পূর্ব্বক শঙ্খাবর্ত্তে ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে যখন আবৃত্তি হইতে একান্তভাবে মুক্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যখন

ব্যূহসাধক শক্তি এবং ব্যূহবাধক শক্তি—এতদুভয়ের অনুপাতের অপেক্ষা আর না করিতে হয়, তখন যে চরম বৃত্তিটি হয়, সেইটি পঞ্চম—পরাবৃত্তি। বলা বাহুল্য, এই পরাবৃত্তি দুস্তর-ভব-সাগর-পারীণ। অনুবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এই চরম পরাবৃত্তি পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি যদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হয়, তাহারই নাম সমাবৃত্তি। অতএব প্রণবাদি জপ সমাবৃত্তির অঙ্গীভূত ॥৪৫॥

অনুবৃত্তিরকারস্যোকারস্য বৃত্তিতা দ্বিধা।
একয়াপোহতে বাধমন্যয়েষ্টে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৪৬॥

অতঃপর ওঙ্কারের দ্বারা সমাবৃত্তি বিচার করিতে হইবে। ওঙ্কারের যেটি প্রথম মাত্রা 'অ'কার, তদ্দ্বারা অনুবৃত্তি আরব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের দ্বিবিধ বৃত্তি—একের দ্বারা অনুবৃত্তির পথে যে বাধা সেটিকে অপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, অপরটির দ্বারা অনুবৃত্তির ফলে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই প্রতিক্রিয়াকে বশীভূত করে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সাধনের দ্বারা কোনও অনুকূল বৃত্তির সূচনা হইলেই অন্তরায় দুই আকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ যে ব্যূহ ভেদ করিয়া মুক্ত হইতে চাহিতেছি তার জড়তা অথবা নিজস্ব সংস্কারগুলি সম্মুখে একটা প্রস্তরের দেউলের মতন মস্তক উত্তোলন করে, কিছুতেই অগ্রসর হইতে দেয় না। যে যন্ত্র আমার ব্যবহার হইতেছে, সেই যন্ত্রেরই জড়বেগ (momentum) আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি না। এইটি হইল প্রথম অন্তরায়। যন্ত্রপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি যে যত্ন করি, তা'র ফলে সেই যন্ত্রে এবং তা'র পারিপার্শ্বিক সব কিছুতে একটি প্রতিক্রিয়াও (reaction) উপস্থিত হয়। যথা—এই শরীরে কোনো ব্যাধি হইয়াছে। সেই ব্যাধিটি সারাইবার জন্য কোনো ঔষধ খাইলাম। ঔষধ সেবনের দ্বিবিধ ক্রিয়া—রোগজন্য শরীরের স্বচ্ছন্দতার যে বাধা উপস্থিত হইয়াছে, সে বাধা দূর করা; এবং শরীর যন্ত্রে বিশেষ একপ্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। এই প্রতিক্রিয়াটি স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য অনুকূলও হইতে পারে, আবার প্রতিকূলও হইতে পারে। যদি প্রতিকূল হয়, তবে সে প্রতিক্রিয়াটি অপক্রিয়া বা বিক্রিয়া। এইজন্য ঔষধ সেবনের ফলে শরীরের কোনো বিক্রিয়া উপস্থিত হইল কিনা, এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধনমাত্রেই এই নিয়মের দৃষ্টান্ত মিলিবে।

কোনো মন্ত্র জপ করিতেছি। জপের ফলে জপকর্ত্তার যন্ত্রে অবশ্যই একটি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। সে প্রতিক্রিয়াটি অনুকূল হইলে শুভ। প্রতিকূল অথবা বিক্রিয়া হইলে সেটিকে দমন (control) করিবার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হওয়া চাই। এখন প্রণবের যেটি দ্বিতীয়, মাত্রা 'উ'কার, সেটি দুই ভাবেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়—যন্ত্রের যেটি জড়বেগ বা momentum সেটিকে কাটাইতে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রতিক্রিয়াটি যাহাতে বিক্রিয়ায় পর্য্যবসিত না হয়, সে বিধানটিও করে ॥৪৬॥

বাধাপ্রতিক্রিয়ে যেঽপি রিপুচ্ছন্দোঽনুগচ্ছতঃ।
ঋতস্য বর্ত্মনি যাভ্যামনৃজুত্বঞ্চ জন্যতে ॥৪৭॥

তারপর, লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাধা এবং প্রতিক্রিয়া রিপুচ্ছন্দের অনুবর্ত্তী হইতে পারে অথবা মিত্রচ্ছন্দের অনুবর্ত্তী হইতে পারে। প্রতিক্রিয়ার মত বাধাও অনুকূল, প্রতিকূল—শুভ, অশুভ—দ্বিবিধ। বদ্ধ সংস্কারের যে বাধা তাহাই অশুভ বাধা; এ বাধা অরিচ্ছন্দের অনুগত, যেহেতু ব্যূহবন্ধন কাটাইয়া এ বাধা বাহির হইতে দেয় না। কিন্তু জপাদি সাধনের দ্বারা যতই আমার ভিতরে জপাদির সংস্কার দৃঢ় হইতে থাকিবে, ততই, অথবা সেই পরিমাণে, শুভ সংস্কার পূর্ব্বতন অশুভ সংস্কারগুলিকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে। সংস্কার মাত্রেরই একটি নিজস্ব বেগ আছে। শুভ সংস্কারের বেগ প্রবল হইলে অশুভ সংস্কারের বেগকে সেটি সফল বাধা দিতে সমর্থ হয়। Positive দিকে momentum সৃষ্টি করিয়া negative momentum কাটাইয়া উঠিতে হয়। এই যে শুভ সংস্কারের বেগনিমিত্ত শুভ বাধা, এটি মিত্রচ্ছন্দের অনুবর্ত্তী। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, রিপুচ্ছন্দের অনুবর্ত্তী বাধা এবং প্রতিক্রিয়া—সেটি ঋত ও সত্য সাধনার যেটি সরল পন্থা, সেটিকে সরল থাকিতে দেয় না—বক্র কুটিল করিয়া দেয় ॥৪৭॥

তয়োর্নিরসনে হি স্যাদুকারস্যায়মুদ্যমঃ।
মিত্রচ্ছন্দস্যৃজুত্বে চ মকারবৃত্তিতা ভবেৎ ॥৪৮॥

এই বক্র কুটিলতার নিরসনের নিমিত্তই ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের উদ্যম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যখন প্রথম মাত্রা 'অ'কার উচ্চারিত হইল,

তখন অনুবৃত্তি অথবা অনুকূল প্রবাহের সূচনাটি হইল। কিন্তু বাধা-প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবাহটি সরল স্বচ্ছন্দগতি হয় না, বক্র, কুটিল হইয়া যায়, স্তব্ধও হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কার উচ্চারিত হইয়া এই স্তব্ধতা ও বক্রতা নিরসন করিয়া থাকে। তৃতীয় মাত্রা যে 'ম'কার সেটি মিত্রচ্ছন্দকে আশ্রয় করে এবং ঋজুতা আনয়ন করে। ॥৪৮॥

লীনা বৈকল্পিকী নাদে বিন্দাবতাদৃশী পুনঃ।
ওমিত্যস্য সমাবৃত্তির্যয়া সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥৪৯॥

পূর্ব্বে যে বৈকল্পিকী ও অতাদৃশী এই দ্বিবিধ অন্তরায়ের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈকল্পিকীর লয় হয় নাদে এবং অতাদৃশীর লয় হয় বিন্দুতে; অর্থাৎ অকার, উকার, মকার—এই তিন মাত্রার উর্দ্ধে যে অর্দ্ধমাত্রা নাদ-বিন্দু, তা'তে জপের যেটি সংশয় বৃত্তি এবং যেটি অযথার্থ বৃত্তি—সেই দুইটি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন প্রণব নিঃসংশয়রূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। ওঙ্কারের সমাবৃত্তি এইভাবে বুঝিতে হইবে—যে সমাবৃত্তি দ্বারা সর্ব্ব সমাপন হইয়া যায় ॥৪৯॥

বীজং যদ্ বিশতি ক্ষেত্রং শেতে তু জাড্যমূর্চ্ছিতম্।
তদ্ জাগর্ত্তি যদা বাধা প্রতিবধ্নাতি নোদয়ম্ ॥
অকারবৃত্তিতাব্যাপ্য এষ এব হ্যনুক্রমঃ।
অব্যাকৃতে বীজমাত্রে জিজাগরিষতি পুনঃ।
চঞ্চল্যতে সুপ্তমীনস্তদা স্যাদঙ্কুরোদ্গমঃ ॥
উকার তনুভাগ্ ভাস্বান্ বরাহো হেতুরুদ্গমে।
যেন বাধাবিক্রিয়ে চ তৃহ্যেতে অবলীলয়া ॥৫০-৩॥

এইবার একটি স্থূল বীজের দৃষ্টান্ত লইয়া এই সমাপন ক্রিয়াটি বুঝিতে যত্ন কর। ক্ষেত্রে বীজ পতিত রহিয়াছে, কিন্তু সে বীজ জড়তায় মূর্চ্ছিত, তাতে প্রাণসঞ্চারের কোনো লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু সেই বীজের জাগরণ হয় কখন? যখন কোনো বাধা তাহার উদয়ের প্রতিবন্ধক না হয়, তখন। বীজটি যখন জাগিতে ইচ্ছা করে, তখন বীজের নাভিতে যে ওঙ্কার বিরাজ করিতেছেন, সেই ওঙ্কারের যে প্রথম মাত্রা 'অকার' তাহার ব্যাপার আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ যেটি অব্যাকৃত, অব্যক্ত বীজমাত্র ছিল, সেটি অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করে। আমরা দেখিয়াছি যে এই উপক্রম বা অনুক্রমই হইতেছে অকারের বৃত্তি। বীজের মধ্যে যে প্রসুপ্ত মৌনশক্তি রহিয়াছে, সে শক্তির স্তব্ধতার ঘোর যেন কাটিয়া যায়, সে শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠে। এইটিকে বীজের উচ্ছূন অবস্থা (swelling) বলে। এখনও কিন্তু অঙ্কুর উদ্গম হয় নাই। সুষুপ্তি ভাঙিল, কিন্তু জাগরণ এখনও হয় নাই। এটি সুপ্তি-জাগরণের সন্ধি অবস্থা। তারপর, সুপ্ত মৌন-শক্তি চঞ্চল হইবার পরে বীজের মধ্যে উকারতনুধৃক বা তনুধারী তেজস্বতী যে বারাহী শক্তি, সেই শক্তির উদ্রেক হয়। উদ্রেকের ফলে বাধা ও বিক্রিয়া অবলীলায় বিদূরিত হয় এবং বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। ৫০-৩॥

সাংগ্রহিকশ্চ ধাতূনামসূনাং পরিপোষকঃ।
প্ররোহয়তি কূর্ম্মো যো মকারমধিতিষ্ঠতি ॥৫৪॥

কিন্তু বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইলেই তো সেটি পূর্ণ বিকাশ হইল না। অঙ্কুরের যাহা উপাদান সেটি সংগ্রহ করিতে নিপুণ এবং তন্মধ্যে যে প্রাণস্রোতগুলি বহমান রহিয়াছে, সে সমূহের পরিপোষক কোনো এক শক্তি তন্মধ্যে বিরাজ করা আবশ্যক। সে শক্তিটি বর্ত্তমান না থাকিলে বীজ হইতে যে অঙ্কুরটি উদ্গত হইয়াছে, সেটি একটি বিশেষ রূপ ও ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া কোনো এক বিশেষ জাতীয় পাদপে পরিণত হইতে পারে না। বীজাভ্যন্তরে এই সংগ্রহ-কুশল, পোষক শক্তিটিকে কূর্ম্মশক্তি বলে। প্রণবের যে তৃতীয় মাত্রা 'ম'কার, সেটি হইতেছে এই কূর্ম্মশক্তি ॥৫৪॥

নাদবিন্দূ চ বিজ্ঞেয়ৌ নৃসিংহবামনৌ ততঃ।
বেবিষ্টে পূর্ব্বয়া বৃত্ত্যা পুনর্বীজায়তেঽন্যয়া ॥৫৫॥

নাদ এবং বিন্দুকে যথাক্রমে নৃসিংহ ও বামন বলিয়া জানিবে। নৃসিংহরূপ নাদশক্তি বীজকে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে বিস্তার করেন; এবং বামনরূপে বিন্দুশক্তি সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাদপকে আবার বীজরূপে রূপায়িত করেন ॥৫৫॥

অম্ভসাত্র বিজানীত লীনসংস্কারসঙ্করাম্ ।
ক্লেশপঙ্কমূলাবিদ্যাং যত্রাসতেঽস্মিতাদয়ঃ ॥৫৬॥

এখানে যে মীন কূর্ম্মাদি পঞ্চশক্তির কথা বলা হইল, শ্রীগুরুই যে একাধারে ঐ পঞ্চশক্তি বা পঞ্চাবতার রূপ তাহা শ্রীগুরু-পাদাব্জ-পঞ্চকের শেষ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে শ্রীগুরুর পঞ্চমূর্ত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে যে পয়ঃ বা জলের কথা বলা হইয়াছে ('মগ্নামুর্ব্বীমিব পয়সি'); সে জল কোন্ জল ? অম্ভঃ বা জল বলিতে বুঝিতে হইবে স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বা অবিদ্যা—যাহাতে শুভ অশুভ, শুক্ল-কৃষ্ণ অনাদি সংস্কার সমূহ লীন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যেটি ক্লেশপঙ্কের মূল, সুতরাং যেটি হইতে অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের অর্থাৎ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥৫৬॥

উর্ব্বীং বিদ্যাৎ ত্রয়ীমত্র নাদাবিন্দুকলাত্মিকাম্ ।
সোমাগ্নিসূর্য্যরূপাং বোষধিবনস্পতী চ গাম্ ॥৫৭॥

"জলে মগ্না উর্ব্বীর মতন"—এই স্থলে উর্ব্বী বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? মূল তত্ত্বসমূহের যেটি উরু বা ব্যক্তরূপ, তাহাই উর্ব্বী শব্দের অর্থ। এই উর্ব্বী হইতেছে ত্রয়ী যে ত্রয়ী নাদবিন্দুকলাত্মিকা, সোমাগ্নিসূর্য্যরূপা, অথবা ওষধি, বনস্পতি, গাভীস্বরূপা ॥৫৭॥

তত্ত্বানামুরুরূপত্বং লীয়তেঽব্যাকৃতেঽম্ভসি ।
যদম্ভো হি নাসদীয়ে সৃষ্টিসূক্তে চ কল্পিতম্ ॥৫৮॥

তত্ত্বসমূহের যেটি উরুরূপ, সেটি অব্যাকৃত হইয়া যাহাতে লীন থাকে, সেটিকে বেদের নাসদীয় সূক্ত এবং সৃষ্টিসূক্তে, যথাক্রমে 'অম্ভঃ' ও 'সমুদ্রঃ' বলা হইয়াছে ॥৫৮॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ভর্গোরূপঞ্চ তত্তপঃ ।
যতোঽভীদ্ধাদৃতং সত্যমধ্বরায়াধ্যজায়ত ॥৫৯॥

শ্রুতি বলিতেছেন—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"। এ তপঃ যে জ্ঞানময় তাও, শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন। সুতরাং তপঃ বলিতে ভর্গই বুঝিতে হইবে।

জগৎ-সবিতার এই বরণীয় ভর্গকেই গায়ত্রীমন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়। সৃষ্টিরূপ যজ্ঞবিস্তারের নিমিত্ত অভীদ্ধ তপঃ হইতে প্রথমে ঋত ও সত্য জাত হইল—এই কথা সৃষ্টিসূক্ত বলিতেছেন ॥৫৯॥

তপস আবিরায়াতি সর্গতাবচ্ছিন্নতা সতঃ।
বীজাঙ্কুরপ্ররোহাণাং বিশেষাভাবরূপতা ॥৬০॥

একমাত্র সৎ বস্তু রহিয়াছেন। সর্গ বা সৃষ্টি হয় নাই। এমত অবস্থায় সদ্‌বস্তু সৃষ্টির সামান্য সংকল্পরূপ অথবা সর্গাভিমুখীন যে আদিম অব্যক্ত ভাবটি সেইটিকে সদ্‌বস্তুর আবীরূপ বলা হইবে। এই আবিঃ অবস্থায় বীজ, অঙ্কুর প্ররোহ প্রভৃতি কোনো বিশেষ এখন পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই ; অর্থাৎ আবিঃকে সৃষ্টির বীজ অথবা অঙ্কুর অথবা প্ররোহ এ সব কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ—"সদ্‌বস্তু কল্পনা করিয়াছিলেন, কামনা করিয়াছিলেন, ঈক্ষণ করিয়াছিলেন"—ইত্যাদিরূপে সৃষ্টির যে বীজাবস্থার কথা শ্রুতি আমাদের বারংবার বলিয়াছেন, সে অবস্থাটিও 'আবিঃ'র যেন পরবর্ত্তী অবস্থা। এই নিমিত্ত সকল প্রকার অভিব্যক্তির আদিতে যে 'আবিঃ' সেটি সকল প্রকার বিশেষ বা নিরূপকের অভাব বশতঃ স্বয়ং অব্যক্ত ॥৬০॥

পয়োধের্নিস্তরঙ্গস্য প্রাগ্‌বীচিভঙ্গতো যথা।
বায়ূর্জিতস্য দৃশ্যেত কদাপ্যুচ্ছ্বসিতাগতিঃ ॥৬১॥

বাহিরের এক চিত্র দিয়া এটি বুঝিতে চেষ্টা কর। সীমাহীন মহাসমুদ্র নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে বীচিভঙ্গ দেখা দিবার পূর্ব্বে বায়ু প্রভাবে সমুদ্রবক্ষে একটা উচ্ছ্বাসমাত্র প্রথমে পরিলক্ষিত হয়। বিচিত্র নামরূপ বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপে দেখা দিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের বা 'সৎ' বস্তুর যে আবির্ভাব—সেটিকে কতকটা এই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গাঢ় সুষুপ্তির পরে জাগরণের ঠিক আরম্ভে এই প্রকার একটা অব্যক্ত অবস্থা হইয়া থাকে ॥৬১॥

বিশেষসর্গতাদৌ যা বিশেষাভাবরূপতা।
উচ্ছ্বাসমাত্রভাবেনাকল্পনীয়া তু কল্প্যতে ॥৬২॥

সর্ব্বপ্রকার বিশেষ সৃষ্টির আদিতে বিশেষের এই প্রকার একটি অভাব-

রূপতা বিদ্যমান থাকে। সেটিকে অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাসমাত্ররূপে আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ সেটি কল্পনার যোগ্য নহে ॥৬২॥

আনন্দস্য য উল্লাসারাম্ভোপক্রম এব চ।
আত্মপ্রত্যয়গম্যোঽপি যোঽবাঙ্‌মনসগোচরঃ ॥৬৩॥

আনন্দের স্বভাবই এই—যখন আনন্দের যেটি উল্লাস, তার আরম্ভ ও উপক্রম হয়, তখন সেটিকে আমরা আত্মপ্রত্যয়ে জানিতে পারি বটে, কিন্তু সেটিকে আমরা কি বাক্য, কি মন—এ দু'য়ের কোনোটা দ্বারা ধারণা করিতে পারি না ॥৬৩॥

নান্তঃপ্রজ্ঞো বহিঃপ্রজ্ঞো ন চাপ্যুভয়রূপতা।
নাস্তি যত্র ঘনপ্রজ্ঞা যত্রোপক্রমতে সনাৎ ॥৬৪॥

যেটি বহিঃপ্রজ্ঞও নয় আবার অন্তঃপ্রজ্ঞও নয়, যেটিকে উভয়তঃ-প্রজ্ঞ বলা যায় না, এমন কি যেটি ঘনপ্রজ্ঞও নয়—এমন যে অলক্ষণ, অনিরুক্ত, অব্যবহার্য্য সৎ বস্তু সেটি হইতে এই সকল বিবিধ প্রজ্ঞার যেটি সূচনা বা আরম্ভ, সেটি কোন্ মনের দ্বারা ধারণা করা অথবা কোন্ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব? ॥৬৪॥

অহর্নিশং গতং সন্ধিং যত্রাহর্ন চ শর্ব্বরী।
ন জাগৃতি র্ন সুপ্তি র্বা তস্যাবিশেষতা মতা ॥৬৫॥

দিন ও রাত্রি যেখানে সন্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যেখানে দিনও নাই, রাত্রিও নাই, জাগরণও নাই, সুপ্তিও নাই—সেইটিকে অবিশেষভাব বলিয়া জানিবে ॥৬৫॥

ভর্গোরূপাদভীদ্ধাত্তজ্‌ জাতমাবিরিতীর্য্যতে।
তস্য প্রতিকৃতী রাত্রি র্যা রাত্রিসূক্ত মন্বিতা ॥
যতোঽধিকৃত্য চাত্মানং ভাবোঽতশ্চ স্বভাবতা।
ব্রহ্মমুখীনতাবির্হি সর্গাভিমুখতা ক্ষপা ॥৬৬-৭॥

আত্মাকে অধিকার করিয়া, আত্মার সম্বন্ধে যে ভাব, তাহাকে 'স্বভাব'

বলিয়া জানিবে। স্বভাব সত্যস্বরূপ ও ঋতস্বরূপ। তত্ত্বতঃ বস্তুরূপে যেটি সত্যস্বরূপ, গতিরূপে সেটি হইল ঋতস্বরূপ। এ গতিও তত্ত্বতঃ গতি—আমাদের কল্পিত বা অনুমিত গতি নহে। যে কোনও পদার্থ সম্বন্ধে আমরা এ দুইটি মূল প্রশ্ন করিতে পারি—পদার্থটি তত্ত্বতঃ কি এবং যথার্থ কিভাবে তার বৃত্তি হইতেছে? এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের উত্তর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন লৌকিক সাধারণ জ্ঞানে এক প্রকার, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে অন্যপ্রকার, আবার যোগজ জ্ঞানে হয় তো বা তৃতীয় প্রকার। কিন্তু যোগজ জ্ঞানেরও নানা স্তর বা ভূমি রহিয়াছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা রহিয়া যায়—পদার্থটির নিরতিশয় রূপটি বা কি, গুণই বা কি, বৃত্তিই বা কি? একটা অনন্ত সোপান শ্রেণীর ধাপে ধাপে আমরা অগ্রসর হইতেছি। শেষ বা চরম ধাপে উপনীত হইলে পূর্ণ প্রজ্ঞান—এইটি 'বেদ' শব্দের মুখ্য অর্থ। পূর্ণ-প্রজ্ঞার ভূমিতে উপনীত হইলে বস্তুর স্বভাবের যে তত্ত্বদৃষ্টি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, সেই তত্ত্বদৃষ্টিই আমাদের দেখাইয়া দেয় সত্য কি এবং ঋত কি। বলা বাহুল্য, এই দুইটি সম্বন্ধে আমাদের সকলকারই ধারণা অল্পবিস্তর ভ্রান্ত-কল্পনাদিমিশ্রিত, সুতরাং অযথার্থ। সকল সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্মাভিমুখীন ভাবে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে যে প্রতিভাত হইতেছে, এইটি হইল আবিঃ এবং বিচিত্র নামরূপাত্মক প্রপঞ্চরূপে স্বরূপকে আবরণ করিয়া তা'দের যেটি প্রকাশ, তাহার নাম ক্ষপা বা রাত্রি।

অভীদ্ধ যে ভর্গঃ বা তপঃ তার যেটি আদিম রূপ সেইটি আবিঃ। রাত্রি তাহার প্রতিকৃতি, কি না, 'উল্টা' রূপ, সুতরাং যেটি আবিঃ সেইটিই রাত্রি—যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে এ দুটিকে আলোক ও অন্ধকারের মত বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টির সর্ব্বত্র এই দুইটি—আবিঃ ও রাত্রি—পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত রহিয়াছে। সামনে একটা গাছ দেখিতেছি। অস্তি ও ভাতিরূপে এটি আবিঃ। কিন্তু স্বরূপগত যে আনন্দ এবং আনন্দের যেটি ভূমত্ব—এই সকল স্বরূপের পরিচয় আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষটিকে খণ্ডিত এবং পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র ধর্ম্মবিশিষ্টরূপেই দেখিতেছি। এই আবরণ হইল রাত্রি। নিজের আত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ—ভান হইয়াও অভান হইতেছে, আবার অভান হইয়াও ভান হইতেছে। আবিঃ এবং রাত্রি—দুয়ে মিলিয়া এটি ঘটাইতেছে। ইহার ফলে সব কিছুই ব্যক্তাব্যক্ত। সৃষ্টিসূক্তে এবং

প্রসিদ্ধ রাত্রিসূক্তে এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী রাত্রির কথাই বলা হইয়াছে। আমরা পরে দেখিব যে এই রাত্রির আবার বিচিত্র মূর্ত্তি—মহারাত্রি, মোহরাত্রি, কালরাত্রি ইত্যাদি ॥৬৬-৭॥

সত্যে ব্রহ্মস্বরূপে স্যাদভিমুখানতা কুতঃ।
ঋতমৃতে প্রসজ্যেত নাভিমুখীনবৃত্তিতা ॥৬৮॥

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে দিক্, দেশ, কালাদির কোনো পরিচ্ছেদ নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মসম্বন্ধে অভিমুখীনতাই বা কি, বিমুখীনতাই বা কি? বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপে অভিমুখীনতাদির প্রশ্ন অনবকাশ। তবে আবিঃ ও রাত্রির যে পরস্পর ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেটি সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? বলা বাহুল্য, ব্রহ্মস্বরূপে, অথবা যেটি সত্য তাহাতে অথবা তৎসম্বন্ধে, কোনো গতি কল্পিত না হইলে এবংপ্রকার অভিমুখীনতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কেন না, গতিরই দিক্ আছে, সত্যের দিক্ নাই। অতএব, "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এইভাবে দ্বিধা অভিব্যক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আবিঃ ও রাত্রির ভেদ কল্পিত হইতে পারে না ॥৬৮॥

আবীরাত্রী ইতি দ্বে চ ব্যোমবায়ূ ইতীরিতে।
সত্যেঽনবসরত্বেঽপি স্যাতামৃতস্য বৃত্তিতে ॥৬৯॥

আবিঃ ও রাত্রি—এই দুইটি যথাক্রমে ব্যোম ও বায়ুরূপেও কথিত হইবে। এই উপোদ্ঘাতের তৃতীয় শ্লোকে ব্যোম ও বায়ুর প্রসঙ্গ আমরা করিয়াছি। সত্যকে ব্যোম ও বায়ু—এই দুইয়ের কোনোটি দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা যায় না; কিন্তু "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এইভাবে সেটি যুগ্মতত্ত্ব হইলে তার ব্যোম ও বায়ু এবং অন্যান্য তত্ত্বরূপে বিবর্তিত হইতে বাধা নাই ॥৬৯॥

অভীদ্ধাদিতি জানীয়াদাবিরভিমুখানতা।
পরাঞ্চি খানি মন্ত্রে তু পরাক্ প্রত্যগিতি দ্বিধা ॥৭০॥

"অভীদ্ধাৎ"—এই মন্ত্রে আবীরূপে যে অভিমুখীনতার কথা উঠিতেছে সে অভিমুখীনতা পরাক্ এবং প্রত্যক্ এইভাবেই দ্বিবিধ। শ্রুতি "পরাঞ্চি খানি", ইত্যাদি মন্ত্রে সেটি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রভেদ এই যে—প্রত্যগ্ দৃষ্টিতে

শুদ্ধ (আবরণ ও বিক্ষেপ তিরস্কার পূর্ব্বক) আবিষ্কার; অপর পক্ষে, পরাক্ দৃষ্টিতে অশুদ্ধ (আবরণ ও বিক্ষেপ সহকারে) আবিষ্কার। দুই স্থলেই আবিষ্কারটি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অস্তি-ভাতিরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ এই ভাবেই জ্ঞানটি হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক, পারমার্থিক—কোনো স্তরেই ইহার ব্যতিক্রম নাই ॥৭০॥

র ইতি বাগ্নিরূপত্বমত্রীতি ন ত্রিধা মতা।
অভীদ্ধাত্তপসো বায়ুরগ্নিতাময়তে যতঃ।
অগ্নিরেবাদিমা রাত্রিরব্যাকৃতবিধাত্রয়ঃ ॥৭১॥

অথবা রাত্রিকে এইভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। রাত্রি=র+অ+ত্রি। র=অগ্নি। এই র বা অগ্নি 'অত্রি' অর্থাৎ এখনও ত্রিধা ব্যাকৃত হয় নাই। অগ্নি-সূর্য্য-সোম, অথবা ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ—এইভাবে অগ্নির ত্রিধা ব্যাকরণ হইয়া থাকে। সে ব্যাকরণটি বা বিস্তারটি এখনও হয় নাই। সুতরাং রাত্রিরূপ যে অগ্নি, সেটি হইতেছে বিশ্বের মূলীভূত অব্যাকৃত শক্তিপিণ্ড। ইহা তেজঃ স্বরূপ, সাক্ষাৎ ভর্গেরই পরিণাম বলিয়া এ শক্তি অচেতন জড়শক্তি নয়। রাত্রিসূক্ত চিৎশক্তিই কীর্ত্তন করিয়াছেন। মূল সদ্বস্তুটিকে গতি বা বৃত্তিরূপে দেখিলে সেটি হইতেছে ঋত=বায়ু; এবং গতির জনক ও গতিজন্য শক্তিরূপে দেখিলে তাহাই হইতেছে অগ্নি। 'আবিঃ' এ শব্দের শেষ অক্ষরটি 'র্' (অথবা 'স্') লক্ষ্য করিতে হইবে—অর্থাৎ ব্রহ্মের মূল প্রকাশ শক্তিরূপেই হইয়া থাকে। শক্তি ও শক্তিমানে কিন্তু ভেদ নাই। ব্রহ্মস্বরূপে যেটি প্রকাশ, সৃষ্টির অভিমুখে সেইটিই আবার ভর্গঃ=তেজঃ=অগ্নি। এইভাবে সেই আদিম রাত্রি হইল অগ্নি ॥৭১॥

আবিরিতি প্রকাশস্য মূলা বৃত্তিশ্চ বিস্তৃতেঃ।
তদেবান্বেতি সর্ব্বাসু পরাসু সর্গবৃত্তিষু ॥৭২॥

"আবিঃ"—এই প্রকাশ এবং বিস্তৃতির যেটি মূলরূপ, সেটি সৃষ্টির সকল বৃত্তিতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। কি ভাবে? আবিঃ=আ+বি+র্। এই তিন অক্ষরে আমরা যথাক্রমে বায়ু, বিয়ৎ বা আকাশ ও বহ্নি—এই তিনটিকে প্রাপ্ত হই। মধ্যে বিয়ৎ বা ব্যোমরূপে ব্রহ্ম আপনার অসীম বিস্তার করিয়াছেন। এ বিস্তার কেবলমাত্র দেশে বিস্তার নহে, এমন কি মাত্র কালেও নহে। দেশ-

কাল-কারণাদির যে সীমাহীন ব্যাপ্তি, সেইটিই হইল এই বিশ্বের মৌলিক আধারপট। শব্দতত্ত্বের দিক হইতে ব্রহ্মের এই রূপটি হইল নাদ। এইজন্য এই উপোদ্ঘাতের তৃতীয় শ্লোকে 'আবীরূপেণ নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম সর্ব্বাশ্রয়ং যদ্'—এইভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই ব্যোম বা নাদরূপে দেশ, কাল, কারণতা প্রভৃতি সম্বন্ধের এখনও ব্যাস বা ব্যাকরণ হয় নাই। এই জপসূত্রের একটি সূত্রে "ওমেব ব্যোম" এইভাবে 'ওম্' ও 'ব্যোম' এই দুইয়ের অভিন্নতা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ মাত্র এইটুকু যে 'ব্যোম' এই শব্দে একটি অতিরিক্ত 'বি' আছে যেটি=বিয়ং বা বিস্তৃতি। তারপর আবিঃ এই শব্দে লক্ষ্য কর যে মধ্যস্থলে 'বি'-কে আশ্রয় করিয়া দু'টি পক্ষ রহিয়াছে—একটি আ=বায়ু (গত্যাত্মক), অপরটি র্ অথবা স্=অগ্নি অথবা প্রাণ=বিশ্বের আদিম শক্তিরূপ। সুতরাং 'আবিঃ' এই শব্দে বুঝিতেছি যে ওঁকার ক্রিয়াত্মক ও শক্ত্যাত্মক—এই দুইভাবে এই বিশ্ব প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। প্রণবের মূর্ত্তিতেও এই রহস্যটি আমরা দেখিতে পাই—একদিকে, অকার, উকার, মকার—এই কলাত্রয়রূপে প্রণবের বা নাদের ক্রিয়ারূপ; অন্যদিকে বিন্দুরূপে নাদের শক্তিরূপ। অতএব স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ওঁকার হইতেই এই সমস্তের অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং এ সমস্তই হইতেছে প্রণবের রূপ ॥৭২॥

সমুদ্রোঽর্ণব আয়াতি হ্যাকারে রাত্রিমন্বিতে।
সংপবিষ্বক্তরূপোঽয়মব্যক্তত্বেঽপি চান্যথা ॥
উচ্ছূনতা সমুদ্রেণ চার্ণবেনৈজনং সনাৎ।
তয়োরেব সমাসেন কারণস্য ক্রিয়োদ্যমঃ ॥৭৩॥

তারপর সৃষ্টিসূক্তে দেখিতেছি—"সমুদ্রোঽর্ণবঃ"। এটি কোথা হইতে কি ভাবে আসিল? সকল সৃষ্টির আদিতে যে অনির্ব্বাচ্য অব্যাকৃত অবস্থা, সেইটিই রাত্রিনামে অভিহিত হইয়াছে। ব্যষ্টির জীবনে এটি সুষুপ্তি। সুষুপ্তির সময়ে অজ্ঞান বা আবরণেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বিরাট্ বিশ্বেরও সুষুপ্তির মত একটা অবস্থা আছে। নিখিল সুষুপ্তিরূপ রাত্রি যখন 'আ'কার, কিনা, গত্যাত্মক বায়ুর দ্বারা ক্ষোভিত হয়, অর্থাৎ সেই মহাসুষুপ্তির স্তব্ধতা যখন ভঙ্গোন্মুখ হয়, তখন তাহার কুক্ষিতে যে অনন্ত সংস্কাররাশি স্থিরভাবে ছিল, সেগুলি

যেন চঞ্চল হইয়া উঠে; অথচ এখন পর্য্যন্ত তাহাদের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিটি কার্য্যতঃ হয় নাই। এ অবস্থাটিও প্রায় অব্যক্ত হইলেও সুষুপ্তি বা রাত্রির মত একান্ত অব্যক্ত নহে। আমাদের সাধারণ অনুভূতির দিক্ হইতে সেই আদিম রাত্রিকে আমরা অন্য ভাবেও কল্পনা করিতে পারি। রূপ, রসাদি যাহা কিছু আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের কিম্বা বিহরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে, সেগুলি তো দেশকালের পটভূমিতে চলচ্চিত্রের মত। সেগুলি আসে কোথা হইতে, সেগুলির পশ্চাতে কি রহিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের কোনো একটি ধারা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—এইভাবে ক্রমশঃ একটা মহা অজানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। গীতা তাই বলিয়াছেন—ভূতসমূহ আদিতেও অব্যক্ত, অন্তিমেও অব্যক্ত, কেবল মাঝখানে কিছুটা ব্যক্ত। এই যে আদি এবং অন্তে একটা মহা অজানা, সেইটিই রাত্রি। অনেকের তত্ত্বদৃষ্টি জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে এর বেশী আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রাত্রির ওপারে কি আলোক, না রাত্রি জগতের মূল সম্বন্ধে শেষ কথা? আমরা আবিঃ ও রাত্রি এই দুই দিক্ দিয়া মূলটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। দুইটিই অনিরুক্ত ও অলক্ষণ বটে, তথাপি একটি প্রকাশস্বরূপ, অপরটি আবরণস্বরূপ। সৃষ্টির অভ্যন্তরে কোনো দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে দেখিলে, সৃষ্টির মূলটি রাত্রিই সন্দেহ নাই। বেদের নাসদীয় সূক্ত এবং মনুসংহিতা গোড়াতেই এই লক্ষণহীন, মহা অজানার কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আবার "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—তমের পারে সাক্ষাৎ ভাস্বর আদিত্যের মত এক পরম প্রকাশ রহিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। এমন কি, সেই মূল রাত্রিকেও তিনিই প্রকাশ করেন। নচেৎ "আসীদিদং তমোভূতং"—এভাবে জ্ঞানই বা হইবে কিরূপে? সুষুপ্তিতে যেরূপ কিছুই ছিলনা—এই প্রকার অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, জগতের সুষুপ্তি সম্বন্ধেও সেরূপ একটি নিত্য জ্ঞান অবশ্যই রহিয়াছে। চলচ্চিত্র আলোকে ফুটিতে থাকিলেও সেই নিত্যজ্ঞানই সেটিকে জানে, এবং চলচ্চিত্র অন্ধকারে মিলাইয়া যাইলেও সেই লয়টিকেও তাহা জানে। এ ছাড়াও সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ নিত্য-অকুণ্ঠিত-জ্ঞান যদি কোনো পুরুষ রহেন, তবে তাঁর দৃষ্টিতে জগতের কাছে যেটি তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, সেটি হয় পৌর্ণমাসীর রাত্রি। রাত্রি হইয়াও, সেটি সেই পুরুষের পরম দৃষ্টিতে আপন মহা অজানার ভাণ্ডার আর অজানা করিয়া রাখিতে

পারিতেছে না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ : সমগ্রভাবেও জানেন, আবার বিশেষ বিশেষ ভাবেও জানেন। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"—গীতার এই সংযমীটি যে কে তাহা ভুলিলে চলিবে না। রাত্রির এই দ্বিবিধ প্রকাশ (শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ ও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদের দ্বারা প্রকাশ) ছাড়াও তৃতীয় আর এক প্রকাশও আছে বা হইতে পারে। সেইটি হইতেছে রাত্রির শুক্লপক্ষে কলা বা আংশিক প্রকাশ। যে ভূমিতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ নাই, অথচ বুদ্ধির স্বচ্ছতাবশতঃ সর্ব্বজ্ঞতার মত একটা বোধ উদিত হইয়াছে, সে স্থলে রাত্রি শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসী না হইলেও তদপেক্ষা ন্যূন কোনো তিথির রাত্রি হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টি যোগজ দৃষ্টি। জগতের মূলটি এ দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে জ্ঞাত না হইলেও আংশিকভাবে জ্ঞাত, এবং সে জ্ঞান ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষ রহিত বলিয়া যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য।

এইবার রাত্রি হইতে সমুদ্র ও অর্ণবের উৎপত্তি হইল—বেদের এই অংশের অর্থ আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। সমুদ্র শব্দটির অক্ষর-সন্নিবেশ পরীক্ষা করিলে সমুদ্রতত্ত্বের যেটি অগাধ রহস্য সেটির কতকটা আভাস আমরা পাইতে পারি।

সমুদ্র = সম্ + উৎ + র। ইহার দ্বারা কি বুঝিব? সৃষ্টির মূলে রাত্রিরূপ যে অব্যক্ত মহাবীজটি রহিয়াছে, সেটি যেন কিসের প্রেরণায় আপনাকে অভিব্যক্ত করার নিমিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। নিস্তরঙ্গ মহাসাগরে বায়ুবেগে যেমন একটা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়—সেইপ্রকার। এখনও কোনো তরঙ্গ দেখা দেয় নাই। অব্যক্ত কারণের অভিব্যক্তির নিমিত্ত এই প্রকার যে আদিম উচ্ছ্বাস, 'সমুদ্র' এই শব্দের দ্বারা সেইটাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র বিশ্বসৃষ্টির আদিতে নহে, সকল প্রকার সৃষ্টির আদিতেই এই অব্যক্ত উচ্ছ্বাসটি রহিয়াছে, দেখিতে পাই। কবি বা শিল্পী যখন তাঁর কাব্য বা শিল্প সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হ'ন, তখনও তাঁর মধ্যে এই মৌন উচ্ছ্বাসটি প্রথমেই দেখা দেয়। এই উচ্ছ্বাস এখনও পর্য্যন্ত কোনো ভাষা বা চিত্র, অথবা সুরে নিজেকে ফুটাইয়া তোলে নাই। বাহিরের সৃষ্টিতেও এইটি ঘটিতে দেখি। একটা বীজ পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। অঙ্কুর উদ্গমের সূচনা যখন হয়, তখন বীজের অভ্যন্তরে ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া নিজেকে

ছড়াইয়া দিতে চায়। তার ফলে, বীজ স্ফীত হইয়া উঠে। যে আবরণে সেই বীজের বিকাশের প্রস্রবণটি এতদিন রুদ্ধ ছিল, সে আবরণটি যেন সহসা ফাটিয়া যায়। বীজটি যতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল, ততক্ষণ বীজের পক্ষে সেটা 'রাত্রি'। অঙ্কুরের জন্য যখন সে ভাঙিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, তখন বীজের ভিতরে যে অবস্থাটি আমরা পাই, সেইটি হইতেছে বীজের পক্ষে 'সমুদ্র'। এই সমুদ্রের আবার দুইটি রূপ : একটি হইল তা'র উচ্ছ্বাসরূপ, অপরটি হইল তা'র চঞ্চলতা। বীজ আর চুপটি করিয়া রহিবে না; সে আপন আবরণটি ভাঙিয়া বাহির হইল, অঙ্কুরাদিক্রমে বিচিত্র বিকাশের পথে সে এইবার যাত্রা করিবে। এইটি হইল তা'র চঞ্চল গতিরূপ। এই রূপটির বৈদিক পরিভাষা হইতেছে অর্ণব। গত্যর্থক ঋ (অথবা ঋণ) ধাতু এই শব্দের বীজ। সুতরাং 'সমুদ্র' —এই শব্দের দ্বারা উচ্ছ্বাস বা উচ্ছূনতা এবং 'অর্ণব' এই শব্দের দ্বারা 'এজন' বা গতি—এই দুইটি দিক্ই আমরা একসঙ্গে পাইতেছি। মূলে রাত্রিতে উপাদানভূত শক্তিসমূহের যে সাম্যাবস্থা ছিল, এখন পর্য্যন্ত সে সাম্যাবস্থায় বিসদৃশ পরিণাম স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। শক্তিগুলি পিণ্ডাবস্থা হইতে পরস্পর তফাৎ হইতে চাহিয়াও এখনো পর্য্যন্ত পরস্পরের আলিঙ্গনমুক্ত হইতে পারে নাই। রাত্রির অবস্থায় শক্তিব্যূহের যে pattern বা আকৃতিটি ছিল, সেটি চঞ্চল হইয়াও এখনও বজায় রহিয়াছে। এইটাকে 'সম্পরিষ্বক্ত' অবস্থা বলে। এ অবস্থাটি অব্যক্ত হইয়াও আবার অব্যক্ত নহে। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি এই অবস্থার প্রতীক। অব্যক্ত এবং ব্যক্তের মাঝখানে এই অবস্থাটি আসিয়া থাকে। যে কোনো কারণ হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে গেলে এই সম্পরিষ্বক্ত অবস্থা—অর্থাৎ বেদের "সমুদ্রোঽর্ণবঃ" অবশ্যই পাইতে হয়॥৭৩॥

আবিরিতি তমশ্ছিদ্ যা রাত্রৌ গম্ভীরবাধতা।
বিদ্যুত্বত্যম্ভসাং রোধরূপতয়া চ কল্পিতা।
মঘবামোঘবজ্রেণ তাং বারয়তি বৃত্রহা ॥৭৪॥

তমশ্ছিদ্ বা তমোহারী যে প্রকাশ, সেইটি আবিঃ। রাত্রিতে প্রকাশের একটা গহন গম্ভীর বাধরূপতা বিদ্যমান থাকে। বেদের অনেক উপাখ্যানে মেঘে জলের রোধ বা বাধারূপে এইটি কল্পিত হইয়াছে; অর্থাৎ মেঘ হইয়াছে, বিদ্যুতেরও চমক দেখিতেছি কিন্তু বৃষ্টি পড়িতেছে না। কি বা কিসে যেন

মেঘের জলবিন্দুকে মিলিত এবং ভূতলে পতিত হইতে দিতেছে না। এই রোধরূপতাকে বেদ অনেক স্থলে 'বৃত্র' এই আখ্যা দিয়াছেন। ইন্দ্র তদীয় অমোঘ বজ্রের দ্বাধা এই রোধিকা শক্তিকে বিচূর্ণ করিয়া বারিবর্ষণের সম্ভাবনা ঘটাইয়া দেন। কেবল মেঘ বলিয়া নয়, নিখিল পদার্থের বিকাশের মুখে এই রোধরূপ বাধা বিদ্যমান থাকে। আমরা পরে দেখিব যে এই রোধরূপ বাধা চতুর্ব্বিধ—দেশনিমিত্ত (অবরোধ), কালনিমিত্ত (প্রতিরোধ), ছন্দোনিমিত্ত (বিরোধ), এবং বস্তুনিমিত্ত (নিরোধ)। 'সমুদ্র'-এই অবস্থায় এই চতুর্ব্বিধ বাধাই এখনও রোধরূপে রহিয়াছে, কিন্তু সে বাধাটি বিদূরিত করার নিমিত্ত একটা আবেগ বা প্রয়াসও যেন ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অবস্থাটির নাম উচ্ছ্বাস বা উচ্ছূনতা ॥৭৪॥

ক্রিয়ামারভমাণে চার্ণবে কলনবৃত্তিতা।
যয়া রূপায়তে বিশ্বং সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাৎ ॥৭৫॥

তারপর, 'সমুদ্র' যখন 'অর্ণব' হইল, তখন তা'তে একটি অভিনব বৃত্তি দেখা দিল। সেই বৃত্তিকে বলিব কলনবৃত্তি। ইহাই কালশক্তি। এ পর্য্যন্ত মূলতত্ত্বের যে পরিণাম, সেটি কালকে আশ্রয় করিয়া নহে। সেটি অকাল বোদ্ধ পরিণাম। কিন্তু 'অর্ণব' অবস্থায় কলনবৃত্তি, সুতরাং কালিক পরিণাম আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ক্রমে নিখিল বিশ্ব রূপায়িত হইতে থাকে ॥৭৫॥

সাবির্ভবতি তস্যা হি সংবৎসর ইতীক্ষণম্।
যতো দ্বৈতমহোরাত্রং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পুনঃ ॥৭৬॥

সেই আদি কলনবৃত্তি 'আমি সংবৎসর হইব' এইভাবে ঈক্ষণ করেন। তাহা হইতে সংবৎসররূপ ক্রমিক কালের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কালের যেটি কলন, সেটি অক্রমিক এবং ক্রমিক—এই দুই রূপেই বুঝিতে হইবে। কলাকাষ্ঠাদিরূপে কাল ক্রমিক হইলে তাহার আখ্যা হইল সংবৎসর। 'বৎসর' এবং 'সংবৎসর'—এই শব্দ দুইটিকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। সৃষ্টিসূক্তে যে 'সংবৎসর' শব্দটি রহিয়াছে, সেটি কলনবৃত্তির একটি বিশেষ রূপ তা' যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। 'সংবৎসর'—এইরূপ ঈক্ষণের পর 'অহোরাত্র' এবং তাদের বিধায়ক সূর্য্য ও চন্দ্রমার উৎপত্তি হইল। একটা অনন্ত ক্রমিক কলনধারার মধ্যে

আবৃত্তি বা পালা দেখা দিল। সকল প্রকার আনুক্রমিক গতি বা rhythmic movement-এর বীজ এইখানে। স্থূলে, সূক্ষ্মে—সর্ব্বত্র। এখন কালস্রোত কেবলমাত্র একটি ধারা নহে; এই ধারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; হেলিতেছে, দুলিতেছে, তরঙ্গায়িত হইতেছে; চক্রগতিতে কিম্বা শঙ্খাবৃত্ত গতিতে ইহা নিজেকে রূপায়িত করিতেছে। এবম্প্রকার গতির নিমিত্ত দুইটি পক্ষ এবং দুইটি সীমার আবশ্যকতা হয়। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—'অহোরাত্র' এবং 'অহোরাত্রে'র গতিসীমা যদ্দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহার সাধারণ সংজ্ঞা—হইতেছে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ"। বলা বাহুল্য, এগুলিও বিশ্বের মূলীভূত তত্ত্ব, স্থূলভাবে বুঝিলে চলিবে না ॥৭৬॥

অহঃ শুক্লং ক্ষপা কৃষ্ণা দ্বে গতী সর্ব্ববৃত্তিষু।
ঋচা সাম্না চ কল্প্যেতেঽর্কেন্দূ চ ভর্গরোচিষী ॥৭৭॥

পুনশ্চ, অহঃকে শুক্ল এবং ক্ষপাকে কৃষ্ণা—এইভাবে অভিহিত করা হয়। সকল পদার্থের সকল বৃত্তিতে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুইটি গতি অনুসন্ধান করিতে হইবে। একটি প্রকাশ বিকাশের দিকে গতি, অপরটি বিক্ষেপ ও আবরণের দিকে গতি। একটি ধন, অপরটি ঋণ। ঋক্ এবং সাম—উভয়ই ঋক্ এবং উদ্গীথ দ্বারা অর্ক এবং ইন্দুরূপে, এবং ভর্গঃ ও রোচিঃরূপে এই দুইটিকে কল্পনা করিয়াছেন ॥৭৭॥

সূয়ত ঋধ্যতে যেন তেজো ভুবননাভিষু।
সবিতেতি চ তং বিদ্ধি পূষেতি ভর্গরূপিণম্ ॥৭৮॥

নিখিল ভুবনের নাভিতে যে তেজঃ শক্তি রহিয়াছে, সেই তেজঃ শক্তিকে যিনি প্রসব করেন ও পোষণ করেন, সেই সাক্ষাৎ ভর্গরূপী দেবতাকে সবিতা ও ও পূষা বলিয়া জানিবে ॥৭৮॥

নিখিলনাভিনিষ্ঠেন সূর্য্যনারায়ণেন বৈ।
অরনেমিবিভেদেন কল্পিতা বিশ্বচক্রতা ॥৭৯॥

নিখিল পদার্থের নাভিনিষ্ঠ ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ, অর ও নেমি এই প্রকার বিভাগ দ্বারা এই ভুবনচক্রটিকে কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং

কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া অর, নেমি বিস্তারপূর্ব্বক এই ভুবনচক্র রচনা করিয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ও পোষণ করিতেছেন ॥৭৯॥

অণীয়ানণুতোঽকঃস্থ মহীয়ান্ ব্যোমনীশ্বরঃ।
সঙ্কর্ষণঃ স নোদেতি নাস্তমেতি স্বরূপতঃ ॥৮০॥

তিনি 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে' ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্ররূপে অনুপ্রবিষ্ট; আবার মহৎ হইতে মহান্ যে ব্যোম, তাহাতে মহীয়ান্‌রূপে তিনি ঈশ্বর, কিনা, প্রভু। ইঁহাকে মহাসঙ্কর্ষণরূপে জানিবে। পরিদৃশ্যমান সূর্য্যের মত ইঁহার স্বরূপতঃ উদয়ও নাই, অস্তও নাই ॥৮০॥

নাভৌ সঙ্কর্ষণোঽব্যান্নো নেমৌ প্রদ্যুম্নবিগ্রহঃ।
অরেষু চানিরুদ্ধশ্চ বাসুদেবো হি সর্ব্বতঃ ॥৮১॥

নাভিতে সঙ্কর্ষণ আমাদের রক্ষা করুন, নেমিতে যিনি প্রদ্যুম্নবিগ্রহ তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অরসমূহে অনিরুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন, এবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিকে সর্ব্বভাবে বাসুদেব আমাদের রক্ষা করুন ॥৮১॥

সঙ্কর্ষণঞ্চ কূর্ম্মাখ্যং বিন্দুরূপমপি ক্রমাৎ।
তৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ চ বরাহমীনবিগ্রহৌ।
বিজানীয়াৎ কলানাদৌ বাসুদেবং পরাৎপরম্।
বিন্দুনাদকলাত্মানং বিন্দুনাদকলাতিগম্ ॥৮২॥

পুনশ্চ, সঙ্কর্ষণকে বিন্দুরূপে ও কূর্ম্মরূপে জানিবে, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধকে কলা, নাদরূপে এবং বরাহ মীনরূপে জানিবে, এবং পরাৎপর বাসুদেবকে বিন্দুনাদকলাত্মা এবং বিন্দুনাদকলাতীত—এই দুইভাবেই জানিবে ॥৮২॥

কলারূপতয়া নেমি র্বিদধানা ক্ষয়োদয়ৌ।
নাভেররাগতানংশূংশ্চিন্বানা কেন ছন্দসা ॥৮৩॥

নেমি কলারূপতা-বশতঃ সকল পদার্থের ক্ষয় ও উদয় বিধান করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকল পদার্থের ক্ষয় এবং উদয় হইয়া থাকে এই কারণেই যে তা'দের যেটি আকৃতি ও অবয়ব সেটি কলাধর্ম্মী; তা'দের কলা আছে, সুতরাং তা'দের

ক্ষয় ও পূরণরূপ পরিবর্ত্তন ধর্ম্মটিও আছে। কিন্তু নাভি হইল সকল তেজঃ বা শক্তির ভাণ্ডার। নাভিকেন্দ্র হইতেই শক্তি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যবস্থিত রেখায় নাভিকেন্দ্র হইতে শক্তিরশ্মিসমূহের বিকিরণ হয়, সেইগুলিকে বলে অর। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে এই যে নাভিকেন্দ্র হইতে যে রশ্মিসমূহ (radiations) বিকীর্ণ হইতেছে, কলাত্মক নেমি কোন্ ছন্দঃ দ্বারা সেগুলিকে আপন ক্ষয় ও পূরণের নিমিত্ত বাছিয়া লইয়া থাকে ? ॥৮৩॥

পুষ্ণাত্যন্নঞ্চ সর্ব্বস্মৈ যদোষধ্যুপলক্ষণম্।
সোম গতাগতিচক্রং বিভর্ত্তি ক্ষয়পূরণাৎ ॥৮৪॥

(পরা জাতিভাবে দেখিলে সেই ছন্দঃ দ্বিবিধ—সোমচ্ছন্দঃ এবং অগ্নিচ্ছন্দঃ)। এই বিরাট্ গতাগতিরূপ ভুবনচক্রের ক্ষয়ের পূরণার্থ যে ছন্দঃ, (জড়, উদ্ভিদ্, চেতন) সকলের নিমিত্তই "অন্ন"কে পোষণ করেন, তাঁকে সোম বলিয়া জানিবে ; "ওষধি" একটি তাঁর উপলক্ষণ ॥৮৪॥

নেমিবৃত্ত্যা পরাগ্ বৃত্তিরাবৃত্তির্ধূমযানতঃ।
নাভাবর্কং তু বিধ্যেতার্চিরাদিনা য ঈয়িষুঃ ॥৮৫॥

(বলা বাহুল্য, অগ্নিচ্ছন্দঃ দ্বারা সকল কিছুর দহন, পচন, ক্ষরণ হইতেছে। আমরা দেখিব যে ইহার কালাগ্নিরুদ্র প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়াত্মক বিবিধ রূপ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, নিখিল পদার্থের অঙ্গসমূহ রূপান্বিত করিয়া আছেন অগ্নি—রূপ,—পৃথুলেখ, তনুলেখ, অণুলেখ যে ভাবেই দেখিনা কেন।)

এই মহা গতাগতিচক্রের নেমি (নী ধাতু) বা পরিধিতেই যদি বৃত্তি চলিতে থাকে, তবে সেটি পরাগ্বৃত্তি। তার ফলে, ধূমযান দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই হইতে থাকে। এই "চলতি চাকি"র ঘূর্ণন ও পেষণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নিরন্তর আবর্ত্তনটি কাটাইবার নিমিত্ত যিনি অর্চিরাদি মার্গে চলিতে ইচ্ছুক, তাঁকে প্রত্যগ্বৃত্তি আশ্রয় করতঃ ভুবনের নাভিতে (Nucleusএ) যে (কাল ও যমরূপে) অর্ক রহিয়াছেন, তাঁকেই ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। চক্রের নাভির ভিতর দিয়াই সেই ক্ষুরের ধারের মত নিশিত পথ ॥৮৫॥

ভূরিতি নেমিতা জ্ঞেয়া হ্যরতেতি ভুবর্ম্মতা।
নাভিতা স্বরিতীত্থঞ্চ সর্গে কল্পিতচক্রতা ॥৮৬॥

'ভূঃ' এইটি নেমিতা, 'ভুবঃ' এইটি অরতা, 'স্বঃ' এইটি নাভিতা—এইভাবে স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যষ্টি-সমষ্টি ইত্যাদি সকল সর্গের চক্রতা কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥৮৬॥

নাভিনেমিক্রিয়াশক্তি-তরতমতয়া পুনঃ।
অরাণামন্তরীক্ষস্য সংস্থাবিশেষভাবনাৎ।
সপ্তব্যাহৃতিভিশ্চক্রে শঙ্খাবৃত্তেন বৃত্তিতা ॥৮৭॥

নাভিতে স্বঃ, নেমিতে ভূঃ—উভয়ত্র শক্তি। নাভিতে শক্তির ঘন (কারক) রূপ, নেমিতে বিতত (ক্রিয়া) রূপ। এই নাভিশক্তি (Nuclear Evolving Power) এবং নেমিশক্তি (Revolving Power) সর্ব্বত্র পরস্পরের সঙ্গে একই অনুপাত রাখিয়া নাই; অনুপাতে তরতমতা রহিয়াছে। এই কারণে 'চক্র'টি স্থির (stable) নয়, সঙ্কোচ-বিকাশধর্ম্মী। চক্রের যেটি বর্ত্তমান সংস্থা (configuration scheme) সেটির নিরূপক (determinant) হইতেছে 'অন্তরিক্ষ' = 'অর' = দেশকালাদিগত ব্যবধান (Time-space-power-interval)। এই ব্যবধান বা সংস্থানিয়ামক যে অন্তরিক্ষ বা অরসমূহ, সে সকল যখন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ব্যাহৃতি দ্বারা 'রূপায়িত' হয়, তখন চক্রের যে বিশেষ ভঙ্গীটি হইয়া থাকে, তা'কে বলে শঙ্খাবৃত্তভঙ্গী। সুতরাং তখন চক্রের বৃত্তিতা শঙ্খাবৃত্তবৃত্তিতা (Movement in accordance with spiral pattern) আকার ধারণ করে ॥৮৭॥

শঙ্খাবৃত্তেধুরং বিদ্ধ্যক্ষরূপামূর্দ্ধগাং পুনঃ।
সৌষুম্নমার্গমিত্যেবং চক্রভিদ্ বিরজা যতঃ ॥৮৮॥

শঙ্খাবৃত্তিতে যেটি 'ধুর', সেটিকে 'উর্দ্ধগ অক্ষ' (Axis of Ascent) রূপে বুঝিতে হইবে। নিখিল পদার্থে এইটি 'সৌষুম্নমার্গ'। ইহা দ্বারা চক্রাবৃত্তি হইতে শঙ্খাবৃত্তবৃত্তিতে অক্ষাশ্রয়ী উর্দ্ধপ্রবাহ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং

ইহার আশ্রয়ে 'চক্রভেদ' হয় এবং তা'র ফলে শান্তরজাঃ এবং বিরজাঃ হইতে পারা যায়। জড় ও প্রাণের ক্ষেত্রেও 'সৌষুম্নমার্গ' আশ্রয়েই পদার্থের বস্তু এবং শক্তির (matter and momentumএর) নৈসর্গিক জড়তা (inertia) কাটাইয়া অভ্যুদয় ও বিবর্ত্তন (Evolution and Emergence) সম্ভবপর হইয়া থাকে ॥৮৮॥

অকারশ্চক্ররূপঃ স্যান্মকারে শঙ্খরূপতা ।
উকারেণাক্ষসূত্রেণ চক্রং শঙ্খায়তেঽঞ্জসা ॥৮৯॥

চক্র শঙ্খাকারে সত্বর রূপায়িত হইবে কিরূপে? প্রণবই হইতেছে তাহার মুখ্য সাধন। প্রণবের 'অ'কারে চক্ররূপতা আছে এবং 'ম'কারে শঙ্খরূপতা আছে; মধ্যে যেটি 'উ'কার সেইটি হইতেছে অক্ষ। এই 'উ'-কাররূপ অক্ষের আশ্রয়েই যেটি চক্ররূপ সেটিকে শঙ্খরূপে পরিণত করিতে হইবে ॥৮৯॥

শঙ্খত্বে নাদতাব্যক্তিঃ শঙ্খোঽপি কমলায়তে ।
নাদবিন্দুকলাত্বেন ভূয়স্যা গদয়া গিরা ॥৯০॥

চক্র যখন শঙ্খায়মান হয়, তখন নাদের অভিব্যক্তি সম্ভব হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রণব অথবা অন্য কোনো বীজমন্ত্রের চক্রাবৃত্তি মাত্র হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাদের অনুসন্ধান হয় না। প্রণবের 'অ'কার, 'উ'কার, 'ম'কার—এই মাত্রাত্রয় আবৃত্তি করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহাদের সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের মূলাধারস্বরূপ যে নাদ, তিনি আমাদের কৃপা করিতেছেন না। জপাদির ফলে যখন আবৃত্তিচক্র আর চক্র না রহিয়া শঙ্খাকারে ঊর্দ্ধগ অক্ষাশ্রয় লাভ করে, তখন নাদের কৃপা আমরা প্রাপ্ত হই। তখন সংখ্যাজপ শঙ্খাবৃত্ত জপে পরিণত হয়। পুনশ্চ, শঙ্খ আবার গদা এবং পদ্ম—এই দুইভাবেও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই বিবর্ত্তনের ফলে মন্ত্র নাদ-বিন্দু-কলা এই তিন স্বরূপে এবং এই তিন স্বরূপের অতীতরূপেও নিরতিশয় প্রকাশ প্রাপ্ত হন। কমলরূপে নাদবিন্দুকলার পূর্ণ বিকাশ এবং গদারূপে পরম অব্যক্ত যে পরাবাক্ তা'তেই নাদবিন্দুকলার লয় হইয়া থাকে। প্রণবাদি বীজমন্ত্রের সাধনে শ্রীহরি এবং শ্রীগণপতির হস্তে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং গদাকে এই রহস্যরূপে আমাদিগকে দেখিতে হইবে ॥৯০॥

একায়নো দ্বিপক্ষশ্চ ত্রিশিরাস্ত্রিরুতঃ খগঃ।
ত্রিনেত্রশ্চ চতুষ্পাদ্ যশ্চতুর্নাগাশনো বলী॥
হিরণ্যপুচ্ছপঞ্চভ্যঃ পঞ্চগঙ্গাম্বুগোমুখঃ।
ষড়ূর্ম্মিশমনচ্ছন্দাঃ ষড়্যোগৈঃ কৃৎস্নকামধুক্॥
সপ্তধামসু সপ্তান্নো গায়তি মান্ত্রবর্ণিকঃ।
অভ্যারোহয়তীত্যস্মাৎ ক্ষরাদক্ষর উচ্যতে॥৯১॥

এইবার এক রহস্যময় খগের (পক্ষীর) কথা বলা হইতেছে। সেই খগেন্দ্র একায়ন, অর্থাৎ তাঁর গতি এক লক্ষ্যাভিমুখেই। তিনি আবার দ্বিপক্ষ—বাক্ ও প্রাণ, অথবা প্রাণ ও অপান, অথবা শুক্ল ও কৃষ্ণ—এইগুলি তাঁহার দুইটি পক্ষ। তাঁহার তিনটি শির এবং তিনটি 'রুত' বা রব। তিনটি শির হইতেছেঃ নাদ, বিন্দু, কলা (অথবা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ); তিনটি রুত বা রব হইতেঃ বাচিক, উপাংশু, মানস (অথবা, অ, উ; ম)। তিনি ত্রিনেত্র—বহিঃপ্রজ্ঞা (জাগ্রৎ), অন্তঃপ্রজ্ঞা+ঘনপ্রজ্ঞা (মননাদি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) এবং অনির্ব্বাণপ্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং তুরীয়)। তিনি চতুষ্পাৎ—মাত্রাত্রয় এবং অর্দ্ধমাত্র-অমাত্র, অথবা বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা। তিনি মহাবলী চারিটি 'নাগ'কে ভক্ষণ করেন। চারিটি নাগ—অবরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ ও নিরোধ—এই চারিটি (দেশাদিনিমিত্ত) বাধা। হিরণ্ময় পঞ্চ পুচ্ছ দ্বারা ইনি শোভিত। পূর্বোক্ত পঞ্চ শুদ্ধি ইঁহার পঞ্চপুচ্ছ (প্রতিষ্ঠা) মনে করিতে পারি। ইনি আপনার গোমুখ (গো=বাক্) দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গাবারি বিশ্বজীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের নিমিত্ত সমন্তাৎ প্রবাহিত করেন। ইঁহার গতিস্থিতি লয়াদির যেটি ছন্দঃ, তদ্দ্বারা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ এবং তা'দের বিপাক—এই ষড়ূর্ম্মি প্রশমন হইয়া থাকে। ক্রিয়া, স্মৃতি, অনুস্মৃতি, ধ্যান, অনুধ্যান এবং (ধ্রবলস্ত জনিত) সম্ভাব্য-ভাবন—এই ষড়্যোগের দ্বারা নিখিল ইষ্টকাম দোহন করিতে ইনি সমর্থ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত "লোক" (অথবা বাক্ ও জীব—এই দুইটির অন্তর্ভাবে অন্নাদি সপ্ত "কোষ") ইঁহার সপ্তধাম। এই সপ্তধামে ইনি সপ্ত "অন্ন" (স্থূল, তনুস্থূল, অণুস্থূল; সূক্ষ্ম, তনুসূক্ষ্ম, অণুসূক্ষ্ম; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা পরম—এই সতটি) গ্রহণ করেন। ইনি মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা "গায়তি" কিনা, উদ্গীথরূপে (স্বরাদি সহায়ে) গীত

হইয়া থাকেন। যেহেতু 'ক্ষর' (অসৎ, তমঃ এবং মৃত্যু) হইতে 'অক্ষরে' (সৎ, জ্যোতিঃ, অমৃতে) আরোহণটি ইঁহার দ্বারা হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এই রহস্যবিগ্রহ খগ 'অক্ষর' নামে অভিহিত ॥৯১॥

যোগস্বাপং পুমান্ যঃ প্রলয়জলনিধৌ মায়য়া সেবমানঃ
শেতে সোঽয়ং পদ্মনাভোঽবতি নিখিলসৃজাং বেদবাচাং নিবাসম্।
জাগর্ত্ত্বেষ প্রসন্নঃ প্রভবতু হৃদি বঃ শুদ্ধসত্ত্বোর্জ্জিতৌজা
ঘোরং মূঢ়ং সপত্নং সপদি নিরসয়ন্ বাগ্ভবৈরিধ্যমানঃ ॥৯২॥

যে আদি পুরুষ আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তিতে প্রলয়পয়োধিজলে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি পদ্মনাভিরূপে নিখিল পদার্থের সৃষ্টিবীজ যে দেববাণী, সেই দেববাণীর যিনি নিবাস তাঁহাকে (অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে) রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই শুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিতবপু উত্তমৌজা নারায়ণ তোমাদের হৃদয়েও (যোগনিদ্রা হইতে) জাগ্রত হউন, এবং 'ঐং'—এই বাগ্ভব বীজের দ্বারা সম্যক্ প্রদীপ্তচৈতন্য হইয়া তোমাদের ঘোর এবং মূঢ় (মধু ও কৈটভ) এই দুইটি যে চিরশত্রু রহিয়াছে, সে দুইটিকে অচিরে নিরসনপূর্ব্বক আপন প্রসন্ন প্রভাব বিস্তার করুন।

কালিন্দ্যারোধসীশো ললিতসুরগিরাং বেণুগীতৈর্হরির্যঃ
শৈলান্ বিদ্রাবয়ং স্তৈঃ প্রকটয়তি পরাং বাচমোঙ্কারযোনিম্।
সম্যক্সন্ধানশূরো গময়তি নিধনং রাঘবো যো দশাস্যং
প্রত্যক্চৈতন্যমূর্ত্তী বচসি বিহরতামত্র তৌ রামকৃষ্ণৌ ॥৯৩॥

ললিত স্বরলহরীর প্রভু যে হরি কালিন্দীপুলিনে আপন বেণুসঙ্গীতে শৈল-সমূহকেও বিগলিত করেন এবং ওঁকারের যোনি যে পরাবাক্ সেটিকেও সম্যক্ প্রকটিত (ও লীলায়িত) করেন; যিনি আবার রঘুপতি রাঘবরূপে সম্যক্ সন্ধান-নিপুণ শর দ্বারা দশাননকে নিধন করেন, সেই দুই সাক্ষাৎ চৈতন্যমূর্তি—রাম ও কৃষ্ণ আমাদের এই বাক্যে বিহার করিতে থাকুন ॥৯৩॥

স্ফারাস্যং ব্রহ্মসূক্তং প্রমিতিরুতিরদং সম্যগুদ্গীথশুণ্ডং
দ্বে বিদ্যে যত্র নেত্রে বিশদপরিচয়াপাস্ততামিস্রভালম্ ।
মন্ত্রং বক্ষশ্চ পার্শ্বৌ যতিততিকুশলৌ দোষ ঋষ্যাদয়শ্চ
মাত্রাদ্যৈস্তৈ সমাঢ্যাঃ সকলমখতনুং নৌমি সিদ্ধ্যৃদ্ধিপাদম্ ॥৯৪॥

শ্রীগণপতির মূর্ত্তিটি বড়ই রহস্যময়। তাই এখানে প্রথমতঃ তাঁর প্রতিটি অঙ্গের—মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অঙ্গের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

শ্রীগণেশ হইলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি প্রবর্ত্তক। তাই তাঁর মুখকমল যেন সাক্ষাৎ প্রকটিত বেদবাণী। 'স্ফার' বা নাদময়ী যে 'ব্রহ্ম' বা শ্রুতি, সেই শ্রুতি বা বেদের 'সূক্ত' বা মন্ত্রই হইতেছে গণপতির 'বক্ত্র', অর্থাৎ তাঁর বদনকমল যেন বেদমন্ত্রেরই প্রকট মূর্ত্তি।

তারপর, তাঁর 'রদ' বা দন্ত কাহাকে বুঝাইতেছে? 'প্রমিতি' বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানরূপ যে 'রুতি' বা শব্দ তাহাই তাঁর দন্ত।

আর 'সম্যক্' বা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন যে 'উদ্গীথ' বা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত যে উদ্গান, তাহাই তাঁর শুণ্ড। এই শুণ্ডের দ্বারাই যেন উর্দ্ধে উত্তোলনরূপ উদ্গীথক্রিয়াটি সূচিত হইতেছে। তাই তিনি শুণ্ডধারী।

তারপর, তাঁর নয়ন দুটিতে দৃষ্টি দিলে মনে হয় সে দুটি যেন দুটি বিদ্যা অর্থাৎ পরা এবং অপরারূপ উপনিষদুক্ত প্রসিদ্ধ দুটি বিদ্যাই যেন তাঁর দুটি নেত্র। কোনো জ্ঞান বা কোন বিদ্যাই—তা' সে জাগতিক জ্ঞানই হোক্ বা পারমার্থিক জ্ঞানই হোক্—যে তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত নয়, তাহাই জানাইবার জন্য যেন তিনি আপন নয়নজ্যোতিতে দুই বিদ্যাকেই প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন।

শ্রীগণেশের ললাটদেশ শুভ্র সমুজ্জ্বল, যদিও তাঁর সমগ্র বদনটি রক্তবর্ণ। ইহা বুঝাইয়া দিতেছে যে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বিদ্যাতেই তাঁর বিশদ বা সম্যক্ পরিচয় আছে। এই সম্যক্ পরিচয় বা বিজ্ঞানের অভাবেই নারদ শোকের এবং তমসের পারে যাইতে পারেন নাই, তাই গুরু সনৎকুমারের শরণাগত হইয়াছিলেন, যিনি 'তমসস্পারং দর্শয়তি'। কিন্তু গণেশের সমুজ্জ্বল ললাটই জানাইয়া দিতেছে যে তাঁর এই দ্বিবিধ বিদ্যাতে শুধু সামান্য জ্ঞানই নাই, বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানও রহিয়াছে এবং তা'র ফলেই অর্থাৎ এই বিশদ পরিচয় হেতুই

সমস্ত তমিস্রা বা অজ্ঞান অন্ধকার অপগত বা অপাস্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান ভাতিতে ললাটদেশ তাই সমুজ্জ্বল, প্রতিভার ছটায় তাহা ভাস্বর।

তাঁর বক্ষোদেশ বা হৃদয়ই হইতেছে মন্ত্র। শ্রীগণেশের মর্ম্মস্থলটিই হইতেছে মন্ত্র এবং 'যতি' ও 'ততি' অর্থাৎ যন্ত্র ও তন্ত্রে যে কুশলতা, তাই তাঁর দুই পার্শ্বদেশ। সুতরাং মধ্যস্থলে মন্ত্র এবং দুই পার্শ্বে যন্ত্র ও তন্ত্র এইভাবে তিনি মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্রের সম্মিলিত মূর্ত্তি।

আর তাঁর 'দোষঃ' কিনা বাহুগুলি, অর্থাৎ চারিটি বাহু হইতেছে—ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ। মন্ত্র যেমন তাঁর মর্ম্মস্থল, তেমনি সেই মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগবিধি জানাইবার জন্য যেন তাঁর চারিটি বাহু মন্ত্রের অপরিহার্য্য চারিটি অঙ্গকে জানাইতেছে।

সেই চারিটি বাহুতে আবার তিনি ধারণ করিয়া আছেন—মাত্রা, পাদ, কলা ও কাষ্ঠা। ছন্দোরূপ হস্তে তাঁর মাত্রা, বিনিয়োগরূপ হস্তে পাদ, ঋষিরূপ হস্তে কলা এবং দেবতারূপ হস্তে কাষ্ঠা। এইরূপে তাঁর চারিটি হস্ত মাত্রাদি দ্বারা 'সমাঢ্য' বা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আর তাঁর সমস্ত তনু বা দেহটিই হইল যজ্ঞময়—তিনি 'সকলমখতনু'। সকল যজ্ঞ অর্থাৎ গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞই তাঁর তনুটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁর দেহের সিন্দুরবর্ণ এই যজ্ঞাগ্নির বর্ণ, রক্তবর্ণকেই জানাইয়া দিতেছে।

শ্রীগণেশের চরণযুগল—ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—সবই তাঁর চরণ দুটিতে আশ্রিত। এমন শ্রীগণেশকে নমস্কার ॥৯৪॥

> ব্যূহং জিহ্মং ব্যদারীদ্দৃতচরিতদতা দন্তিযূথেশতুণ্ডো
> ব্যামোহঞ্চ ব্যতহীদ্ ব্যসনপরিকরং তূর্ণমোঙ্কারশুণ্ডঃ।
> নাদস্পান্দস্ফুরত্তাহরুণরুচিরতনুঃ স্বিন্নবিন্দ্বচ্ছমৌলি
> র্মাত্রাকৢপ্তৈঃ স দোর্ভির্জয়তু গণপতি স্তুর্য্যপশ্যদ্দ্বিনেত্রঃ ॥৯৫॥

গণপতির ঐ রহস্যমূর্ত্তিটি প্রকারান্তরে ভাবনা কর।

মাতঙ্গ-যূথপতি অরণ্যে বিচরণকালে বৃক্ষলতাদি নির্ম্মিত দুর্গম ব্যূহও অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হয়; আবার, রণস্থলে শত্রুরচিত জটিল দুর্ভেদ্য ব্যূহও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ জীবনের অন্তর্বহিঃ

নিখিল বাধাবিঘ্ন যৎকালে ব্যূহরচনা করিয়া তার দুশ্ছেদ্য কৌটিল্যপাশে (জিহ্ম) তাকে অবরুদ্ধ করিয়া তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, তখন দন্তি-যূথপতির মতই তাঁর (অসীমশৌর্য্যসমন্বিত) বক্র হইতে (এক পরমাদ্ভুত) দন্তবিস্তার করিয়া তিনি সেই ব্যূহ সমূলে বিনষ্ট করেন। (ইতঃপূর্ব্বে তিনি তাহাই করিয়াছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন—ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। ক্রিয়ায় অতীতকালের প্রয়োগ ইহাই সূচিত করিতেছে। "যদা যদা মহাবাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি"—ইত্যাদি)। আচ্ছা, তাঁর ঐ পরমরহস্যময় দন্ত দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে—ঋতচরিত—ঋজু, সত্য যে আচরণ (বাক্‌কায়মনের) তাহাই। অর্থাৎ, বাগাদি কুটিল (জিহ্ম), অনৃত অধ্ব পরিহারপূর্ব্বক ঋজু ঋত যে অধ্ব তাহা অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় যে শ্রেয়োবীর্য্যদ্বারা সেইটিই শ্রীগণপতির দন্ত। (দম্=দমন, control; 'ত'কার দ্বারা বুঝাইতেছে অমৃত=অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স। সুতরাং যদ্দারা আমাদের এই working apparatusটির disharmony curvature and function নিয়ন্ত্রিত হইয়া harmonic rectitude and harmonic functionএ রূপান্তরিত হয়, তাহাই হইল দন্ত—rectifying, harmonizing Factor). শ্রুতি তাই না সাধনের গোড়াতেই প্রার্থনা করিয়াছেন—"ঋত হইতে, সত্য হইতে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই"। সকল সাধনার মূলেই এই ঋতান্বয়, এই সত্যনিষ্ঠা। আচ্ছা, দন্ত কি এক না দুই অথবা বহু? দন্ত একই—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যেমন একই হয়, ঋতান্বয় বা ঋতচরিতও একই হইয়া থাকে। তাতে সংশয়ের 'দোলা' এবং বিকল্পের 'জটলা'—এ দুই-ই থাকে না। A straight, unswerving singleness of purpose and pursuit চাই-ই।

অশুভ বা অন্তরায় মুখ্যতঃ দুই ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়—ব্যূহ ও ব্যামোহ। প্রথমটি স্তব্ধ (static) ভাবে থাকিলেও দুর্ভেদ্য। দ্বিতীয়টি প্রসারী (aggressive) এবং আততায়ী পুরুভুজের (octopus) মত কেবলি তার "বাহু" বিস্তার করে। এটি দুর্নিবার। এর বাহু অন্তহীন এবং সেগুলি সচরাচর বিবিধ (কামজ, ক্রোধজ ইত্যাদি) ব্যসনের আকারে জীবকে শৃঙ্খলিত করে। এই ব্যসন পরিবৃত ব্যামোহ বিদূরিত হইবে কিরূপে? শ্রীবিনায়ক তাঁর ওঙ্কাররূপী শুণ্ডদ্বারা এই মহোপদ্রবকে অচিরে নিরসন করেন; অর্থাৎ

প্রণবাদির শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জপই মুখ্য সাধন, কেননা তদ্দারাই এই যন্ত্রের স্পন্দনগত বৈরূপ্য বা প্রতিকূলতা তিরোহিত হইয়া ঋত এবং সত্য ছন্দের সঙ্গে অনুরূপতাদি সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর, শ্রীগণেশের দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচিটি কি তা ভাবনা কর। নিঃস্পন্দপরমতত্ত্বে নাদরূপ যে মূলস্পন্দ, তারই যে সমন্তাৎ স্ফুরণ, তাই ঐ দিব্য কলেবরে রক্তিম অঙ্গরাগ। বাচ্য-বাচকময় এই যে চরাচর বিশ্ব, এর জীবনের প্রথম সাড়াটি এই অরুণরক্তিমায়। বিশ্বপ্রাণের 'রস', জীবনের 'রঙ'—পাদপে শীতাপগমে বিপুল প্রাণহিল্লোলে উদ্গত নব কিসলয় মঞ্জরীর মতই যে রাঙা! বিশ্বের চিত্রপট বর্ণালিতেও এই রাঙা (red) হইতেই তো বর্ণগ্রামের উত্তরোত্তর উন্মেষ! স্বর-সপ্তকের যেমন ষড়জ (সা)। "আমি এক, মিথুন হইব"—ব্রহ্মবস্তুতে এই আদিম কাম, ঐ রক্তরাগেই না নিজেকে ফুটাইতে চায়! বিশ্বদোলের যে "ফাগ" তাও তো মূলে এই! তন্ত্রে কামকলাবিলাসেও এই! বর্ণের গোড়ায় গিয়া এর খোঁজ লও।

আচ্ছা, গণপতির অঙ্গের সিন্দুরবর্ণ না হয় হইল। কিন্তু তাঁর শুভ্র স্বচ্ছ ললাটদেশে মুক্তার মত স্বেদবিন্দু শোভা পাইতেছে যে! বিশ্বের প্রাণধারায়, জীবন-চাঞ্চল্যে তিনি রহিয়াও (though immanent), এর ঊর্দ্ধে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ স্বরূপে তিনি বিরাজ করেন। আর, তাঁর সেই নিত্য ক্ষোভহীন (সুতরাং নিঃস্পন্দ) সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াই তিনি নিখিল স্পন্দাত্মক প্রপঞ্চে "অবগাহন" করিয়াছেন; বর্ণহীন হইয়াও বিশ্ববর্ণালি হইয়াছেন। এই "অঘটনঘটন" হইল তাঁর ললাটের "স্বেদ", এবং সেই অচিন্ত্যঘটনটি বিন্দুরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ তাহা হইতেই বিশ্বের নিখিল স্পন্দ তার "কেন্দ্রীণ" বা নাভি শক্তিটি পাইতেছে—সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে। বেদ বলেন—"অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি"; তন্ত্র বলেন—"নাদ হইতে বিন্দু, আবার বিন্দু হইতে নাদ";—এ সবই ভাবিয়া দেখ গণপতির শুভ্র ভাল-দেশে টলটল ঐ স্বেদ বিন্দুর পানে চাহিয়া।

আবার, গণপতির চারিটি হস্ত হইতেছে মাত্রা চতুষ্টয়—মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, পূর্ণমাত্রা ও অমাত্রা (অন্যত্র এগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। আর, তাঁর দুইটি নেত্র হইতেছে—"পশ্যৎ" আর "তুর্য্য" (পর ও পরম)। প্রথমটির দ্বারা নিখিল তত্ত্ব, বস্তু এবং সম্বন্ধ "দর্শন" করেন; দ্বিতীয়টির দ্বারা সর্ব্ব ত্রিপুটীর মূলে যে

পরমাব্যক্ত সত্তা তাতেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতিরূপে অচ্যুতপ্রতিষ্ঠ রহেন। এই তুরীয় দৃষ্টিও পরা ও পরমা ভাবে দ্বিবিধ (পরে দেখিব)।

এবম্বিধ রহস্যবপুধৃক্ শ্রীগণপতি আমাদের অশুভ বিনাশের নিমিত্ত জয়যুক্ত হউন ॥৯৫॥

সম্যক্ সাম্যং সমাসে যদবতি কুশলং কর্ম্মণাং শুণ্ডশৌর্য্যং
বীর্য্যং দন্তস্য যস্মাদ্ হরতি বিষমতাং ব্যাসমন্বেতি যা চ।
আব্রহ্মাকারবৃত্তি প্রভবতি চ যতো ধাম মৌলেঃ প্রসন্নং
বর্ত্তেতে দ্বৌ সমাধী চ নয়নযুগলেঽতঃ সমাবৃত্তিমূর্ত্তিঃ ॥৯৬॥

এখন এই শ্লোকে শ্রীগণেশের প্রতিটি অঙ্গের ক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, তাঁর শুণ্ডের শৌর্য্যের দ্বারা তিনি কি করেন? পূর্ব্বকথিত সমাস-সমতা সম্যক্ ভাবে রক্ষা করেন। এই অনুকূল ধারাটির রক্ষণ বা পোষণ শুণ্ডশৌর্য্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে।

তারপর, তাঁর দন্তের বীর্য্য দ্বারা ব্যাসেতে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবের মধ্যে (dissipation, scattering এ) অন্বিত বা যুক্ত হয় যে বিষমতা, (disharmony), তাকে হরণ বা নাশ করেন। শুণ্ডশৌর্য্যের দ্বারা যেমন সমতার রক্ষণ, তেমনি দন্তবীর্য্যের দ্বারা বিষমতা হরণ। অনুকূলতার পোষণ ও প্রতিকূলতার বিদূরণ—সাধনা সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য এই মুখ্য দুটি ক্রিয়া শ্রীগণেশের এই দুই অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শুধু, এই দুটি ক্রিয়াতেই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয় না—তিনি তাঁর মৌলির বা মস্তকের প্রসন্ন ধাম বা জ্যোতিঃপ্রসাদ দ্বারা সাধককে প্রভাবিত করেন, তার সাধনার সরণিকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া রাখেন যে পর্য্যন্ত তা'র মধ্যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদয় না হয়, অর্থাৎ সাধক সিদ্ধির চরম ক্ষেত্রে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাঁর করুণা-জ্যোতিঃ বিকিরণে কার্পণ্য নাই। ইহাই তাঁর মৌলির বা মস্তকের কাজ।

আর যোগশাস্ত্রে যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতরূপ দ্বিবিধ সমাধির কথা বর্ণিত আছে, সেই উভয়বিধ সমাধিই যেন তাঁর নয়নযুগলে স্থান পাইয়াছে, অর্থাৎ তাঁর দুটি নেত্রের মধ্যেই সমাধির দ্বিবিধ ভাব নিহিত আছে। তাই তাঁর নয়ন-প্রসাদে বা দৃষ্টি-প্রসাদেই সাধকেরও দ্বিবিধ সমাধিলাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীগণেশের সর্ব্ব অবয়বের কার্য্যগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইনি সমাবৃত্তিরই প্রকট মূর্ত্তি ॥ ৯৬ ॥

[এই সমাবৃত্তিরূপটি লাভ করার জন্য 'গণেশ' এই রহস্য নামটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। 'গ' কার জিহ্বামূলীয় কবর্গের তৃতীয় বর্ণ—মূলত্রয়ের নিরূপক, অর্থাৎ মূলকে তিন সংখ্যায় লইবার নির্দ্দেশ দিতেছে; যথা রসায়ন শাস্ত্রে H_2SO_4 নির্দ্দেশ দেয় কোন মৌলিককে কত সংখ্যায় লইতে হইবে। মূল তিনটি কি? বাক্, মনঃ এবং প্রাণ; অথবা বিদ্যা, শ্রদ্ধা উপনিষৎ; অথবা অ, উ, ম; ইত্যাদি। 'ণ' কার মূর্দ্ধন্য এবং পঞ্চমবর্ণ। এটি নির্দ্দেশ করে "ঊর্দ্ধলোক" হইতে পাঁচটি-শক্তিধারার (যথা, পঞ্চগঙ্গা) অবতরণ। এবম্প্রকার মূলত্রয়াশ্রয়ে প্রযত্ন উপযুক্ত বীর্য্যমাত্রা লাভ করিলে উক্ত মূর্দ্ধন্যধারায় তার মিলন ঘটে। 'গ' তৃতীয়বর্ণ, 'ণ' পঞ্চম বর্ণ। উভয়ই "ঘোষবৎ" (calling each other) বটে, কিন্তু সচরাচর "অল্পপ্রাণ" (তাদের আপেক্ষিক 'শক্তিমান' বেশী থাকে না)। এ নিমিত্ত 'গণ'—মাত্র এই রূপে উভয়ের সমর্থ ও সফল মিলনটি ঘটায় না। উভয়ের ব্যাবৃত্তি (hiatus) রহিয়া যায়, সমাবৃত্তি সাধিত হয় না। কিন্তু 'গণেশ' নামে 'ঈকার' দীর্ঘ তালব্যস্বর—গণেশের শুণ্ডশৌর্য্যের প্রতীক; আর, 'শ' কার "মহাপ্রাণ"। সুতরাং 'ঈশ' সংযোগে ব্যাবৃত্তিক্ষেত্রে সমাবৃত্তি সূচিত হইতেছে। প্রত্যেক রহস্য নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এক একটা ফরমূলা।]

বাচা মোঙ্কারগঙ্গা গহনগতিজটাগূঢ়-সপ্তোর্ম্মিভঙ্গা
প্রাণব্যাপারকণ্ঠাঽহিবলয়সহিতং সার্দ্ধমাত্রোত্তমাঙ্গম্।
বৈরূপাক্ষং বিরূপং পরশুমৃগবরাভীতিভিশ্ছন্দ ঈষ্টে
বৈয়র্থ্যঞ্চ ত্রয়ীদৃগ্ জয়তু পশুপতি র্যোঽষ্টমূর্ত্তিস্ত্বমূর্ত্তঃ ॥৯৭॥

অতঃপর শ্রীমহাদেব মূর্ত্তি ভাবনা কর।

মহাদেব তাঁর জটাজালে গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন। সকল বাক্যের 'মধু' অথবা 'রস' যে ওঁঙ্কার, তাঁহাকেই গঙ্গা জানিবে। বাক্যের গতি গহনা, কিনা দুর্জ্ঞেয়া। এই গহনা গতিই হরশিরে জটার কুণ্ডলী। এই জটাগর্ভে বাক্যসার যে প্রণব (ঈশ্বরবাচক নাম), তিনি নিগূঢ় হইয়া তাঁর সাতটি ঊর্ম্মি (জগত্যাদি সপ্ত ছন্দঃ ভূর্ভুবরাদি সপ্ত ব্যাহৃতি,অকারাদি শান্তাতীত অবধি সাতটি "ভূমি", ইত্যাদি) যেন লুকাইয়াছেন। শিবের উত্তমাঙ্গ, কিনা মস্তক অর্দ্ধমাত্রা (সম্পুটিত

নাদ-বিন্দু-কলা—পূর্ব্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) দ্বারা বিভূষিত; আবার, সেটি অহিবলয় দ্বারা বেষ্টিত। বাকের অভিব্যক্তিতে যে প্রাণনব্যাপার রহিয়াছে, তাহাই অহিরূপে কল্পিত হইয়াছে জানিবে। "অহ্+ই" এই আকৃতিটি (pattern) বুঝিয়া দেখ। অ=প্রথম স্বরবর্ণ; হ=শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ; সুতরাং অহ্=মাতৃকাবর্ণমালা। ই=গতি। অর্থাৎ, বর্ণমালার গতি, অব্যাকৃতি থেকে ব্যাকৃতি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি সূচিত হইতেছে। বিশেষয় অহি কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, কিন্তু আবার চলেও (তাই সর্প)। প্রাণন-ক্রিয়াটি বীচিরীতিতে (wave pattern-এ) চলে, তাই অহি=ভুজগ। শিব বিরূপাক্ষ, তিনি তাঁর 'বৈরূপাক্ষ' ছন্দের দ্বারা নিখিল বাকের, সুতরাং প্রাণীর, যেটি 'বিরূপ' ছন্দঃ সেটিকে শাসন করেন। পরশু, মৃগ, বর, অভয়—তাঁর চারিটি হস্তে এই চারিটি "উপায়" দ্বারা। পরশু দ্বারা যেটি বিরূপ তাকে অনুরূপ হবার 'আকৃতি' দেন; মৃগ (অন্বেষণ, লক্ষ্যানুবৃত্তি) দ্বারা সেটিকে লক্ষ্যের বা আদর্শের অনুরূপ প্রতিরূপ করিয়া লন; বর দ্বারা তাকে সমরূপ এবং অভয় দ্বারা তাকে একরূপ বা অভিন্নরূপ করেন। (অনুরূপাদি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যেটি বিরূপ (heterogeneous) তাতে অক্ষ বা Axis রূপে প্রবিষ্ট হইয়া সেটিকে মন্থন করেন, যার ফলে সেটি অনুরূপাদি (homogeneous) হইয়া থাকে। (বিরূপাক্ষ শব্দের অন্য মানেও আছে।) আর, বাক্‌কে 'সমর্থ' করার নিমিত্ত তার বৈয়র্থ্যকেও পূর্ব্বোক্ত রীতিতে শাসন করেন। বাক্‌কে সার্থক করেন তিনি ত্রয়ীদৃক্‌রূপে—ত্রিবেদী-দিব্য-চক্ষুঃরূপে। তিনি ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তি (যথা, শকুন্তলায় মঙ্গলাচরণে বর্ণিত) হইয়াও কিন্তু অমূর্ত্ত (শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞান মূর্ত্তি)। বাক্ বা প্রণবের দিক্ দিয়াও এই অষ্টমূর্ত্তি এবং তদনুগত ও তদতীত অমূর্ত্তরূপটি ভাবনা করিতে হইবে। এবম্বিধ অসামান্য রহস্যবপু যে পশুপতি তিনি জয়যুক্ত হৌন! ৯৭॥

সোঽঘোরোঽদগ্নিচিদ্ যো মিতি মৃশতি যতঃ সোমসূদ্ বামদেবঃ
সদ্যোজাতো হ্যবর্ণাৎ স্বরসমুদয়তোঽজায়তোর্জ্জশ্চ সদ্যঃ।
আদাবন্তে চ যৌ তৎ-পুরুষ ইতি হুতৌ হোতৃহব্যে দ্বিবর্ণা
বীশান শ্চেষ্টিকামান্ কতি সিতি সুষুবে সর্ব্বধুক্ চৈকহোংসঃ ॥৯৮॥

*কৃত্তিবাস, সিতিকণ্ঠ, শূলপাণি, পঞ্চবক্ত্র ইত্যাদি রহস্যে অবগাহন করিও।

কিন্তু এস্থলে বিশেষভাবে "হৌংসঃ" এই মহাবীজটি বিশ্লেষণ করিতে যত্ন কর। বীজটির আদি-অন্তে হ্ এবং ঃ। মধ্যে ওঁকার=অ, উ, ম্। তৎপরে স্। চিন্তা কর এই বিশ্বমহাযজ্ঞ। বাক্, প্রাণ, মন, সমষ্টি, ব্যষ্টি—সব কিছু লইয়াই এই যজ্ঞ। এই যজ্ঞে 'অগ্নিচিৎ'—অগ্নির' চয়নকারী (Storing and massing of Energy) হইয়াছিলেন 'অং', কিনা, স্বরের আদি যে অবর্ণ তাই। এইটি অঘোররূপ। কেননা, মূঢ় এবং ঘোর রূপটি না কাটাইলে উক্ত 'চয়ন' কর্ম্মটি সম্ভব হয় না। তারপর, অন্ত্যস্পর্শবর্ণ যে 'ম'কার, সেটি 'মৃশতি', কিনা, স্পর্শ (মর্ষণ, মর্শনাদি) করিয়া 'সোমসুৎ'—সোমের সবনকারী—হইয়াছিলেন। সোম=নিখিল পদার্থে ওতপ্রোত যে 'রস' তাই। সেটির ক্ষরণ ও সবন হওয়া আবশ্যক যজ্ঞে। এইটি সোমসুৎ বামদেবরূপ। অগ্নি এবং সোম মিলিত হইয়া (Energy + Value) অগ্নীষোম হইলেন বটে, কিন্তু চাই উর্জ্জঃ, অর্থাৎ, অভ্যুদয় শক্তি। স্বর সমুদয়ে যে উবর্ণ, তাহা হইতেই উর্জ্জঃ জাত হইয়াছিল, সদ্যঃ—অবিচ্ছেদে, অব্যবধানেই—জাত হইয়াছিল। এইটি সদ্যোজাতরূপ। এটির অভাবে কর্ম্মটি স্তব্ধ, ব্যাহতাদি হইবে। 'সদ্যঃ' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। সদ্যঃ=সদ্+যঃ=নিরন্তর অবিচ্ছেদে গতিশীল। অথচ, স্বয়ং এটি সৎ=অব্যয়। তারপর, আদি এবং অন্তে যে দুটি বর্ণ (হ্ এবং ঃ), সে দুটি যথাক্রমে এই হবনে (হুতৌ) হোতা এবং হব্য—দ্রব্যযজ্ঞ থেকে ব্রহ্মযজ্ঞ পর্য্যন্ত সব যজ্ঞেই এ দুটিকে অনুসন্ধান কর—বলিয়া ভাবনা কর। এবং দুয়ে মিলিয়া তৎপুরুষরূপ (তৎ=That, পুরুষ=I or You ; Object-Subject, ইত্যাদি)। এবম্প্রকার ক্রিয়াকারক সঙ্ঘাতটি মিলিল, কিন্তু ফল? 'কতি', কতই না ইষ্টিকাম, যজ্ঞের ফল, ইঁনি প্রসব করিয়াছিলেন, 'স্' এই বর্ণরূপে! যজ্ঞফলনিয়ন্তা ইনি ঈশান। সুতরাং এক 'হৌংসঃ' এই মহাবীজরূপা বাক্ই হইল সর্ব্বধুক্—সর্ব্বসম্মেলন ও সর্ব্বভাবন ও সর্ব্বসমাপন কর্ম্মে নিরতিশয়কুশলা। ॥৯৮॥

জিঘৃক্ষতি শিশুঃ সোমং যঃ শম্ভোর্মৌলিভূষণম্।
ঔষধমত্তি যঃ সোমং স কিং বেত্তি স ওমিতি॥৯৯॥

শিশু হাত বাড়াইয়া আকাশের সোম (চাঁদ)কে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।

সে কি জানে যে সোম শম্ভুর মৌলিভূষণ (সোমার্দ্ধধারিণে)? আবার, ওষধিরূপে (ব্রীহি, যব ইত্যাদি) যে সোম ভক্ষণ করে, সে কি জানে যে স্বরূপে সোম="স ও ম্" ইতি? ॥ ৯৯ ॥

আদিত্যো ব্রহ্ম মূর্ত্তং বিশতি যদখিলং ব্যাপ্য চার্কঃ স্বধাম্না
নাভৌ সংগৃহ্য চক্রং হ্যরধৃতবলয়ং চাধ্ব ছন্দো বিভর্ত্তি।
সূতে সূর্য্যশ্চ পূষাহ্ বতি চ বৃহদৃতং জক্ষিতীদঞ্চ রুদ্রঃ
প্রাণানোম্ প্রাণিনদ্ধ্রীং ঘৃণিরিতি হৃদয়ং স্বন্ম একর্ষয়েহর্ঘম্ ॥১০০॥

শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। অদিতিরূপে ব্রহ্ম অমূর্ত্ত, আদিত্যরূপে মূর্ত্ত। অর্থাৎ, স্থুল, সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধরূপে যৎকিঞ্চিৎ অস্তি ও ভাতি, সে সমস্তই আদিত্য। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, আবার সূক্ষ্মের মধ্যে পর এইভাবে এই যে অখিল বিশ্ব, ইহাতে আদিত্য প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। আবার অর্করূপে আপন (আধিভৌতিকাদি চতুর্বিধ) তেজঃ এবং মহিমা দ্বারা এ সকলই তিনি ব্যাপিয়া আছেন। পুনশ্চ, (অণু কি মহান্) ভুবনের যে চক্র চলিতেছে, তার নাভিনিষ্ঠ সত্তাশক্তিরূপে (Nuclear Power) তাকে "সংগ্রহ" করিয়া রাখিয়াছেন; স্বয়ং অর (Moments) বিস্তার পূর্ব্বক সেই চক্রের (যেমন একটি এটমের, কিংবা এই সৌরজগতের) যেটি বলয়, নেমি বা পরিধি তাকে (আপন আকৃতিতে বা pattern-এ) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আর, সেই ভুবনচক্রের গতিতে (Function-এ) যেটি অধ্ব (Course বা Curve) এবং যেটি ছন্দঃ (Law বা Equation) তাদের "ভরণ" করিতেছেন। মূর্ত্ত ব্রহ্ম আদিত্যের অন্তর্বহিঃ সর্ব্বতঃ এই প্রবৃত্তি ধ্যান কর। আদিত্য, বিবস্বান্ অর্ক, সবিতা, নারায়ণ, গভস্তিমান্, হরিদশ্ব (বা সপ্তাশ্ব)—এই কয়টি রহস্য নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর। সব কিছু প্রসব করেন, তাই তিনি সবিতা, সূর্য্য; পোষণ করেন তাই পূষা। হংসবতী ঋকে প্রসিদ্ধ "ঋতং বৃহৎ" অর্থাৎ ঋতব্রহ্ম (হংস) রূপে সব কিছু পালন ও রক্ষা করেন। ইনি Cosmic Life Principle. পুনশ্চ কালাগ্নিরুদ্র-রূপে সমস্ত কিছুই ইনি "ভক্ষণ" করেন। কাল+অগ্নি+রুদ্র এই "সম্পুট"টিও বিশেষভাবে ধ্যান করিবে—ধ্যান করিলে ভুবনচক্রের "নাভি" ভেদ করিয়া কালের অতীততত্ত্বে যাওয়া যায়। ইনি প্রণব (ওঙ্কার) রূপে প্রাণসমূহকেও

প্রাণন করিয়াছিলেন (প্রাণিনৎ)। "ওঁ হ্রীঁ ঘৃণিঃ"—ইহাই তাঁর (আদিত্যের) 'হৃদয়' (ওঁ রূপে 'হৃৎ', এবং হ্রীঁরূপে 'অয়', কিনা গতি)। এবম্বিব একর্ষি প্রত্যক্ষ ভগবান্ আদিত্যনারায়ণকে আমরা অর্ঘসবন (বাক্, মন ও প্রাণের দ্বারা কল্পিত) করিতেছি। আমাদের যেটি অঘ (পাপ্মা, এনঃ, মন্যু ইত্যাদি রূপ) সেটিও সূর্য্যজ্যোতিতে সবন (হবন) এর নিমিত্ত এবং সবনের ফলে রেফযুক্ত ((র=অগ্নি) হইয়া 'অর্ঘ' হউক্ ॥১০০॥

যা তারা ত্রিপুরাদিদুর্গগহনগ্রন্থীন্ দিদীর্ষত্যসৌ
মন্ত্রাণাঞ্চ জিহীর্ষতে বিষমতাং চৈতন্যমাধিৎসতে।
অর্ভৌকস্ত্বমপাচিকীর্ষতি ততো ভূয়স্ত্বমারিপ্সতে
প্রত্যালীঢ়পদা নিনীষতি পদং বংহিষ্ঠবাচঃ পরম্ ॥১০১॥

এখন এখানে তারাতত্ত্ব বলা হইতেছে। ঐ যে মা তারা, তিনি স্বরূপতঃ 'তার' বীজ বা ওঁঙ্কাররূপা। তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া এখানে বর্ণিত হইতেছে। তিনি প্রথমতঃ ত্রিপুরাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি, অ-উ-ম মাত্রাত্রয়, বহিঃপ্রজ্ঞ-অন্তঃপ্রজ্ঞ-ঘনপ্রজ্ঞ ইত্যাদি যেসমস্ত ত্রিপুর-দুর্গ, কিনা, দুর্গম ব্যূহ, তা'দের যে সকল গহন গ্রন্থি, সে সমস্তকে বিদীর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রসমূহের যে বিষমতা অর্থাৎ রূপ ও ছন্দ ইত্যাদির যে অরিত্ব বা প্রতিকূলতা, বা এক কথায়, ছন্দোনিমিত্ত যে বাধা বা "বিরোধ", তা'কে তিনি হরণ করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে অর্দ্ধমাত্র বা অমাত্ররূপে তিনি মন্ত্রসমূহকে সমর্থভাবে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেবল মন্ত্রোদ্ধারেই তাঁর কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় না; তিনি আবার মন্ত্রে "চৈতন্য" আধান করিতে ইচ্ছা করেন এবং ইহার ফলে বস্তুনিমিত্ত যে বাধা বা "নিরোধ" তা'র নিরসন হয়। এ ছাড়া, তিনি 'অর্ভৌকস্ত্ব', কিনা, অল্পে, ক্ষুদ্রে অবস্থিতি অর্থাৎ স্বল্প সঙ্কীর্ণ "দেশে" গতি-স্থিতিরূপে যে দেশ নিমিত্ত বাধা বা "অবরোধ" (Staticity, Stagnation), তা'কেও অপাকৃত বা দূর করিতে ইচ্ছা করেন। আর, ভগবান্ সনৎকুমার যেমন নারদকে "ততো ভূয়ঃ" ইত্যাদি ক্রমে শেষে ভূমাতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ অল্প হইতে "ততো ভূয়ঃ" ক্রমে তিনি সাধককে ব্রহ্মে লইয়া যাইবার সূচনাটি আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন। এক কথায় কালনিমিত্ত বাধা যে "প্রতিরোধ", তা'কে অপসারিত করিয়া বিকাশ-প্রকাশ-

উল্লাসের পূর্ণতা ঘটাইয়া দেন। পরিশেষে, মা তারাকে দেখি এক বিশেষ ভঙ্গীতে শিববক্ষে পাদবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার রহস্য কি? তিনি 'প্রত্যালীঢ়পদা', কিনা, অরিচ্ছন্দাদি বিনাশ নিমিত্ত সম্যগ্-বিন্যস্ত মন্ত্রাক্ষরপদা হইয়া বৈখরী বাকের পর—মধ্যমা, পশ্যন্তী ইত্যাদিতে পদকে অর্থাৎ বাক্, মন ও প্রাণ—এ সমস্তের গতিকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, তাঁর পাদের বিশেষ ভঙ্গীটি মন্ত্রের পদগুলিরই একটি বিশিষ্ট রূপকে বা অবস্থানকে সূচিত করিতেছে। মন্ত্রাক্ষরপদগুলি সেইভাবে বিন্যস্ত হইলে তাহা বাকের স্থূল যে বৈখরী রূপ, তাকে পরিত্যাগ করিয়া তার পরমরূপ যে পরা বাক্ তার দিকে ধাবিত হয়—কোথাও মধ্যমা, পশ্যন্তী ইত্যাদি ক্রমে, অথবা কোথাও সাক্ষাৎ অক্রমিকভাবেই।

সুতরাং মা তারা আমাদের গ্রন্থি-বিদারণ, মন্ত্রের বিষমতা-হরণ, চৈতন্য-আধান, ক্ষুদ্রত্ব বা অল্পত্ব অপাকরণ, ভূমাভিমুখী গতির সূচন এবং পরিশেষে, বাকের পরম অবস্থায় নয়ন—এই সব কাজগুলিই করিয়া থাকেন ॥১০১॥

ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণাৎ পদতলদলিতা বিপ্রতীপা রিরংসা
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পূর্ণাদিতি পদগমনাচ্ছান্তিকৃন্মন্ত্রবর্ণৈঃ।
আত্মায়ং ব্রহ্ম চেতি শ্রুতিষু নিগমনাৎ তত্ত্বমস্যাদিতত্ত্বং
নাদৈর্মৃগ্যস্তদর্থঃ স্ফুটিতপরিচয়া ছিন্নমস্তাঽস্ত গুহ্যা ॥১০২॥

মায়ের আর একটি রহস্যমূর্ত্তি—ছিন্নমস্তা। এই মূর্ত্তির মধ্যে বেদান্তের প্রসিদ্ধ চারিটি মহাবাক্যের রহস্যই লুকাইয়া আছে।

চারিটি মহাবাক্যের মধ্যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ যেটি প্রথম পদ, তদ্দ্বারা তিনি বিপ্রতীপ রিরংসা সর্ব্বতোভাবে দলিত করিয়াছেন—কেননা, উক্ত নিশ্চয় হইলে কেবল পরমাত্মাতেই পূর্ণ রতি হইয়া থাকে। 'বিপ্রতীপ রিরংসা' মানে, স্বরূপের যাহা বিপ্রতীপ, কিনা, বিপরীত তা'তে রিরংসা, কিনা, রমণেচ্ছা। আত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, অনাত্মবস্তুতে যে প্রিয়তাধর্ম্ম, সেটি স্বাভাবিক নহে; অথচ অল্প, খণ্ডিত, অনাত্মপদার্থেই জীবের রমণেচ্ছা ঘটিতেছে—এইটি তা'র বিপরীত রিরংসা; ছিন্নমস্তার পদতলে বিপরীত রতাতুর রতিকাম—এইটির প্রতিমূর্ত্তি। এই বিপরীত রতি দূর হয় শুধু এই নিশ্চয় বুদ্ধিতে যে "আমি স্বরূপতঃ আনন্দ ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্মেতরও কিছু নাই,

সুতরাং আত্মা ছাড়া আর রতি কোথায় হইবে ?” ইহাই “অহং ব্রহ্মাস্মি” রূপ মহাবাক্যের ফলস্বরূপ। আবার “ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং” ইত্যাদি যে শান্তিপাঠের মন্ত্রবর্ণসমূহ, তা'দের দ্বারা পদের গতিতে অর্থাৎ পদের যাহা লক্ষ্য বৃত্তি, তদ্দ্বারা “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”-এই অপর মহাবাক্যটি আপনার মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন। কিভাবে ? আপন মস্তক আপনি ছেদন করিয়া এবং আপন রুধির আপনি পান করিয়া দেখাইতেছেন যে ‘ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে লইলে পূর্ণই থাকে, পূর্ণ ব্যতীত অপূর্ণ কোথায় ?’ তারপর “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—এটিও তিনি প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছেন এইভাবে যে, আপন দিব্য কলেবরের অভ্যন্তরে যে আত্মা ‘রুধির’ রূপে রহিয়াছে, সেটি অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, বস্তুতঃ সেটির স্থান অথবা উপাদান নাই। শেষে শ্রুতিসকল যেভাবে নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত করিয়াছেন সেইভাবে “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যরূপ ‘অসি’ দ্বারা আপন তত্ত্ব, কিনা ব্রহ্মত্ব, তিনি আপনাতে প্রতিপাদন করিতেছেন ; করের অসি এই ‘অসি’রই প্রতীক। আপন দেহ ‘ত্বং’ পদার্থ, আপন উত্তমাঙ্গ ‘তৎ’ পদার্থ ; ‘অসি’ পদটি এতদুভয়ের ভাগত্যাগলক্ষণা প্রদর্শন করিতেছে। অর্থাৎ, দেহের ধর্ম্মাদি (রূপ, নাম) এবং মুণ্ডের ধর্ম্মাদি উভয় ত্যাগ করতঃ ‘রুধির’ এই অভিন্ন বস্তু বা সত্তারূপে উভয়ের গ্রহণ হইতেছে। দেহ হইতে যেটি ‘নির্গলিত’ মুণ্ডে সেটি ‘সমর্পিত’ এবং ‘সমাপ্ত’ হইতেছে ; রুধিরমিত্যেব সত্যম্—এইটির নিগমন হইতেছে।

সেই গুহ্যাতিগুহ্যা ছিন্নমস্তা আপন স্বরূপ-পরিচয়ে আমাদের বুদ্ধিতে উদ্‌ঘাটিত, উদ্ভাসিত হউন্। স্বরূপ পরিচয় সাধনটি কিরূপ ? ছিন্নমস্তারূপে ও তাঁ'তে উদাহৃতরূপে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থ (উপনিষৎ) মাদানুসন্ধান (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, শান্ত, শান্তাতীত) দ্বারাই সাধককে অন্বেষণ করিতে হইবে। [অথবা, ‘নাদৈর্ম্মৃগ্যং তদর্থং’—‘তদর্থং’ কিনা, তদুদ্দেশ্যে, সেইজন্য, নাদাদি দ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে।] ॥১০২॥

[‘ম’ হইতেছে স্পর্শবর্ণের অন্তিম বর্ণ। উচ্চারণে ‘অ’কারযুক্ত। ‘অ’ ‘ম’-এর পরে। ‘অটিকে ‘ম” এর আগে আন। তাতে হইল—‘অম্’। এই উল্টাইয়া লওয়া হইল—বিপরীত করণ। উভয়ের মধ্যে ‘উ’কে বসাও। ‘উ’কার—উদানবৃত্তি (Lever Action)। এই বৃত্তি দ্বারা ‘অ’ ও ‘ম’ দুয়ের “মন্থন” সাধিত হয়—যথা যজ্ঞে উত্তরাধর অরণির। এই মূল ব্যাপারটিকে’

বিপরীত রিরংসা বলা হইল। প্রাণের ক্ষেত্রে, অ=প্রাণাপানব্যাপার; ম=সমানব্যান। উ=উদানবৃত্তি। এগুলি কেবল শরীরের বৃত্তি নয়, বিশ্ববৃত্তি (Cosmic Function)। মনের ক্ষেত্রেও এদের নিজস্ব রূপ আছে। সে যাই হোক, ব্যাপারটি কেবলমাত্র (অ, উ, ম্) এই প্যাটার্ণে (আকৃতিতে) থাকিলে "স্পর্শযোগের" মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হয়। তার মানে, প্রাকৃত সঞ্চারক্ষেত্রে (Spinozar 'Natura Naturata' তুলনা কর)। এটাকে অতিক্রম করিতে হইবে। ছিন্নমুস্তার কলেবর এবং তাহা হইতে ছিন্ন মুণ্ড=নাদবিন্দু। কিন্তু নাদবিন্দু এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান, 'অন্তরীক্ষ' (hiatus) বজায় থাকা পর্য্যন্ত "শান্ত" ভাবটি সম্ভাবিত হয় না। নাদে যে 'তত্ত্ব' নির্গলিত, বিন্দুতে সেটি পর্য্যবসিত—এই সমীকরণটি সর্ব্বথা সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত 'শান্ত' ভাব নাই। তাই ছিন্নমস্তা আপন বুকের রুধির আপনি "পান" করিয়া শান্ত হইতেছেন। আর, শান্তাতীত? সে তো পরমাব্যক্তভাব, তার প্রতীক কিসে মিলিবে? পরে দেখা যাইবে যে ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ ইত্যাদি যে কোনও বীজের উদ্ধার, চৈতন্য ইত্যাদি ব্যাপারে এই এবং অপরাপর রহস্যমূর্ত্তির সাক্ষাৎ উপযোগ আছে। যেমন আবার, বৈখরীজপ=বিপরীতরতাতুর রতিকাম দেবী কলেবর=মধ্যমা; মুণ্ড=পশ্যন্তী, রুধিরপান=পরা।]

আব্রহ্মাস্তম্বমেতজ্ জিজরিষতি কুতশ্চ্যোতিতুং স্থেষ্ঠমিচ্ছেন্
মাত্রাপাদাংশকাষ্ঠাঽঽকলিতরথপদাং লৌল্যমিচ্ছেচ্চ নেমিঃ।
সম্পাতে বিশ্ববীজং হ্রসিতমপি সিতাদ্ ভিদ্যমানত্বমিচ্ছে-
চ্ছূর্পেণাঢ্যাং রথস্থাং বিবিদিষুরধবাং বেদ ধূমাবতী' কঃ॥১০৩॥

মায়ের আর একটি রহস্যমূর্ত্তি—ধূমাবতীর তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সবই যে জরাকবলিত হইতে চাহিতেছে—কেন এই বিশ্বজরা? যেটি ধ্রুবতম, সেটিও যে ক্ষয়িষ্ণু—কেনই বা এই ধ্রুবের অপায় বা বিনাশ? মাত্রা, পাদ, কলা, কাষ্ঠা—ভুবন-রথের এই চারিটি চরণ বা চক্র; কিন্তু চক্রের নেমি ঘুরিতে ঘুরিতে যে লোল হইতে চাহিতেছে—নিয়তির এই লৌল্যই বা কেন? নিখিল সৃষ্টির বীজ যেখানে একত্র জড়ো

হয়, সেখানেও যে যেটি শুক্ল, সেটি অশুক্ল থেকে আলাদাই থাকিতে চায়—কেনই বা এই মৌলিক ভেদ, এই নিগূঢ় নির্ব্বাচন? এ সব রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া কে-ই বা জানিল—রথস্থিতা, শূর্পহস্তা, জরালোলা, বিধবা ঐ ধূমাবতীটি কে? অর্থাৎ মায়ের এই মূর্ত্তির মধ্যেই এ সব রহস্যের সঙ্কেত লুকাইয়া আছে। তিনি রথারূঢ়া হইয়া বিশ্বভুবনের এই নিয়ত গতিকেই জানাইয়া দিতেছেন। আবার স্বয়ং জরালোলা হইয়া ইহার নিয়ত জীর্ণতা ও লৌল্যকে বুঝাইতেছেন। আর মায়ের হাতে যে শূর্প বা 'কুলো', তার দ্বারা তিনিই যে বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিবীজকে ঝাড়াই করিয়া নির্ব্বাচন করতঃ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্ররূপে, পৃথকরূপে বজায় রাখিয়াছেন—তাহাই জানাইতেছেন। সুতরাং বিশ্বের বিপরিণাম, তার জরা, লৌল্য, এবং প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য—সৃষ্টির এ সমস্ত রহস্যই ধূমাবতীর মূর্ত্তিতে লুকাইয়া আছে। যতদিন সৃষ্টির এই আবর্ত্তনে আমরা পড়িয়া আছি, ততদিন ইহার মালিকের সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই মা আমার অধবা, পতিহীনা। আমরা তাঁকে তাই সধবা বেশে দেখিতে পাইনা। তাঁর পতি হইবার স্পর্দ্ধাই বা কা'র আছে! তাঁর সীমন্তে সিন্দুর পরাইবার দুঃসাহসই বা কা'র হইবে? সেজন্য আমাদের কাছে তিনি চিরদিনই অধবার বেশে আবির্ভূতা! ॥১০৩॥

নাসৃগ্‌বীজপ্রতীকোঽপ্যজরমনসিজো জীর্য্যতে জীর্য্যমাণে
বিশ্বে গ্রন্থির্হৃদাং বাঽশনিশতসুদৃঢ়ো দীর্য্যতে ধ্রৌব্যহানে।
মা ভূৎ কিং লৌল্যলেশো জনিমৃতিসরণৌ সংসৃতেশ্চক্রনেমৌ
মিথ্যোত্থে যুস্বরূপং কিমু চিরমধবে নোঽচিতং স্যাচ্চিতং বা ॥১০৪॥

রক্তবীজ যার প্রতীক সেই মনসিজ (কাম), সমগ্র বিশ্ব জীর্যমাণ হইতে থাকিলেও যে জীর্ণ হয়না, পরন্তু অজরই রহিয়া যায় দেখিতেছি। এর উপায় কি মা? নিখিল ধ্রুব পদার্থের ক্ষয় অপচয় ঘটিলেও হৃদয়ের গ্রন্থিপাশ যে দীর্ণ হয়না, পরন্তু শত বজ্রের মত সুদৃঢ়ই রহিয়া যাইতেছে। এরিরই বা উপায় কি মা? অনাদি ক্লেশসঙ্কুল জন্ম-মরণের পথে সংসার-রথের চক্রনেমি কেবলি তো ঘুরিতেছে, তাতে কি শৈথিল্যের লেশটুকুও লক্ষিত হইবে না? অর্থাৎ এই জন্ম-মরণচক্রের বিরামের কি কোনো চিহ্নই দেখা যাইবে না? মিথ্যার

এই অফুরাণ ভেল্কি-পরম্পরার মাঝে যেটি সত্য, যেটি স্বরূপ, সেটি কি, অগ্নি অধবে! সংগৃহীত হইবে, না চিরকালই এমনি হারাইয়া থাকিবে অথবা পরিত্যক্ত রহিবে? ॥১০৪॥

কা শক্তিঃ শক্তিমান্ কঃ কমিতি তদুভয়োর্মেলনাৎ সামরস্যং
কা বাক্ কশ্চার্থ এবং স্বরতদিতরয়ো র্মাতৃকাদ্যর্ণযোগাৎ।
প্রাণাপানৈকতানে বিরুমতি চ জবে কাঽজপা চাজপঃ কো
ধ্মাতে কংকেতি হৌংসো ধমতি ন শৃনুয়াদ্ বায়সে কো ধ্বজস্থে॥
॥১০৫॥

ধূমাবতীর রথধ্বজে ঐ কাকটি যে কি তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? এক দিকে বিশ্বজরামৃত্যুর আহ্বান, অন্যদিকে জরামৃত্যু হইতে অজর অমর যে অনপায় স্থান তাতে উতরণের আহ্বান—এ দুই-ই যে বায়সের যথাক্রমে "কঃ ক্ব" এবং "হৌংস ঃ" রুতিতে সূচিত হইতেছে, তাহা কি শুনিবে না? বিশ্ব-প্রাণী শুনিতেছে—"কঃ ক্ব"—কে কোথা আছ এস—এস—রথচক্রতলে পাতিত ও নিষ্পেষিত হও—শূর্পে পড়িয়া বিভক্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যাও! নিয়তি অনতি-ক্রম্য! কিন্তু বায়সের মুখে শুধু ঐ রবই শুনিবে? "হৌংসঃ"—এই অমৃত অভয়ের আহ্বানটি শুনিবে না?

এ অভয়ের আহ্বান কি ভাবে শুনিব?

শক্তি হইল কা, শক্তিমান্ কঃ। এ দুয়ের যদি ভেদদৃষ্টি কর, তবে শক্তি তো চিচ্ছক্তি হইল না; সুতরাং জড়যন্ত্রেই তুমি পাতিত, নিষ্পেষিত হইলে। কিন্তু শক্তি শক্তিমান্‌কে যদি মিলাইয়া "সমরস" কর, তবেই না "কং," কিনা, সুখম্!

এই প্রপঞ্চ বাক্ ও অর্থের সমষ্টি। মূলতঃ এদুটি সংপৃক্তমিথুন। কিন্তু তাদের "ছাড়াছাড়ি" বিশ্বব্যবহারে হইয়াছে দেখিতেছি। তাই না নিরর্থক (আনর্থক্য, বৈয়র্থ্য ইত্যাদি বশতঃ) বাক্ অমৃত, অভয়ের সন্ধান দেয় না! কা হইল বাক্, কঃ হইল অর্থ। "কাক:" এই শব্দে স্বরব্যঞ্জন মাতৃকাবর্ণের আদি (অকার এবং ককার) বর্ণ দুটি যুক্ত হইয়া আছে। যদি স্বর এবং ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত করিয়া রাখ তো মৃত্যু, আর যদি যুক্তই রাখ তো অমৃত।

যোগে আবার সেই কং—সুখম্। স্বরই বা কি, ব্যঞ্জনই বা কি, মাতৃকাবর্গই বা কি ভাবিয়া দেখ। বায়সের রবে সেই নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

পুনশ্চ' প্রাণীর প্রাণাপান ব্যাপারের একতানতা (সমতা) রক্ষা করিবে, না করিবে না? উক্ত ব্যাপারের যেটি প্রাকৃত ঝোঁক, তার বিরামস্থলেও কি শান্ত, স্বস্থ রহিবে? যদি সমতা রাখিতে পার তো জরা দূরে রহিবে, বিরাম-স্থলেও যদি "উদাসীন" ("মধ্যে বামন মাসীনং") থাকিতে পার তো, মৃত্যু আসিল না। কা=অজপা; কঃ=অজপঃ। জরা মৃত্যুর এবং তার পারে এই মূলরহস্যটি কাক ডাকিয়া শুনাইতেছে। "হোংসঃ" এই মহাবীজেই জরামৃত্যু-বারিণী ঐ ত্রিবিধ "ভাবনা" ই নিহিত। সঃ=শক্তি, হ=শক্তিমান, ওঁ= উভয়ের সামরস্য। ওঁকারের আদ্য মাত্রা অকার, হকার ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণ, এতদুভয়ের সমর্থ-সংযোগ সূচক সঃ। আবার, হংস=স্বাভাবিক প্রাণনক্রিয়া; ওঙ্কারদ্বারা এটি জরামৃত্যুজয়ী ॥১০৫॥

বর্ণানাং বিশ্বচিত্রে নিলয়বিলয়য়োঃ স্থানমেবেতি কৃষ্ণা
বর্ণৈর্বাঽবর্ণনীয়া কতিযতিততিভির্বাপ্যনির্দ্দেশ্যবর্ণা।
বর্ণানাং বা পটেঽস্মিন্ কলনফলনয়োঃ স্থানমেবেতি শুক্লা
যোঽভাস্যত্বেঽপি বর্ণৈঃ পটপটুফলনে ভাসকঃ স্বপ্রকাশঃ ॥

॥১০৬॥

পরিশেষে, ষোলটি শ্লোকে শ্রীশ্রীকালিকার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যাইতেছে। শ্রীশ্রীকালীর মূর্ত্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। তাঁর এই কালোরূপের কি রহস্য, প্রথম তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

এই নিখিল বিশ্বের যে চিত্রপট, তাহাতে যে অসংখ্য বর্ণ, সেই সমস্ত বর্ণের নিলয় ও বিলয় তাঁহাতেই। তিনি স্বয়ং বর্ণহীনা অথচ সব বর্ণের প্রসূতি, আবার বর্ণ-সমাপিকা, বর্ণের গ্রাসিকা—তাই কি তিনি কালো? বর্ণ, পদ, পাদ-মাত্রা, ক্রম বা অন্বয় কিছুর দ্বারাই তিনি বর্ণনীয়া ন'ন—এই অবর্ণনীয়া বলিয়াই কি তিনি কালো? বিশ্বের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ, এই উর্ম্মিরাশি এক অগাধ দুরবগাহ মহা-অজনায় ওঠে আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। তাহাদের এত, যত, কত বলিয়া ইয়ত্তা কে করিবে? এইরূপ অনির্দ্দেশ্যা বলিয়াই কি তিনি,

শ্যামা ? আবার, মায়ের পদতলে দেখিতেছি উজ্জ্বল শুভ্ররূপ, একদিকে কালো আবার অপরদিকে ধলো ! তিনি বিশ্বচিত্রপটের কলনে ফলনে সব বর্ণের আধার, সর্ব্ববর্ণময়—তাই কি তিনি ধলো ? এখন বর্ণশব্দটি ত্রিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়—পট বা রং (colour), পদ (letter), এবং জাতি (caste)। কিন্তু বর্ণশব্দের যে অর্থই গ্রহণ করিনা কেন—কোনো অর্থের দ্বারাই তো তিনি প্রকাশিত হ'ননা। তিনি যে আপনায় আপনি প্রকাশ, স্বপ্রকাশ স্বরূপা, আবার সকল কিছুরই প্রকাশক তিনিই, এই বিশ্বচিত্রের ফলনে তাঁর পটুত্বের যে আর জুড়ি নাই ! ॥১০৬॥

যে গ্রাহ্যাশ্চিত্রবর্ণা গ্রহণপরিচয়া মানসে বিম্বিতাস্তে
ছায়াচিত্রাণি সাক্ষাদ্ দধতি জহতি কাঃ শক্তয়ঃ কে চ কায়াঃ।
গম্ভীরাগোচরান্ত-স্তিমিরনিবিড়তা যাদিমা সা ক্ষপা চেৎ
স্পন্দৈস্তস্যাঃ প্রবৃত্তৈঃ কিরণবিকিরণৈর্ভাতি ভাসা স্বয়াহহঃ ॥
॥১০৭॥

তারপর, এই যে যত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কামনা, বেদনা প্রভৃতি ছায়াচিত্রের মত আসে ও চলিয়া যায় ইহারা কি এই চলচ্চিত্রে তাদের সত্য পরিচয়টি কখনো দেয় ? যদি এ সব বস্তুহীন ইন্দ্রজালই হয়, তবে কোন্ যাদুকরী শক্তি—ছবি ও পট, দৃশ্য ও দ্রষ্টা ইত্যাদিরূপে এই ভ্রান্তিকে বিজৃম্ভিত করিয়া অন্তরে বাহিরে এই নিছক ছায়ারূপ খেলা দেখাইতেছে ? আর যদি এ ছায়া বস্তুহীন অর্থাৎ অবাস্তব না হয়, যদি ইহার পিছনে সত্যই কোনো কায়া থাকে, তবে সে কায়াই বা কেমন ? সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মহাকালী কেমন করিয়াই বা এই সব ছবি তোলেন, পটের উপর সাজাইয়া ধরেন, আবার সরাইয়াও ল'ন ? এই রহস্য-ক্রীড়া তিনি লুকাইয়াই খেলেন—তাই কি তিনি কালো ? শ্রুতির নাসদীয় সূক্ত ও রাত্রিসূক্ত প্রভৃতিতে যে আদিম অগোচর গম্ভীর অম্ভোরাশির বর্ণনা আছে, যাহার বক্ষোপরি এই বিশ্ববোধ বুদ্বুদের মত উর্ম্মিভঙ্গে ফুটিয়া উঠে, সেই গাঢ় তমিস্রাই কি মায়ের আমার নিত্য কালো রাত্রিরূপ ? যদি তাই হয়, তবে নিজের সেই অন্ধকারে তিনি নিজের স্পন্দনে বা আলোড়নেই কি আবার আলোর লহরী ফুটাইয়া তুলেন না ? তাই স্বরূপতঃ

তিনি আলোকে বা আঁধারে সর্ব্বত্রই সমান প্রকাশময়ী, অনির্ব্বাণ তাঁর আত্মজ্যোতি, তাই তিনি পূর্ণ দিবা বা শ্রুতির সেই 'সকৃৎ দিবা' রূপিণী ॥১০৭॥

সত্যাস্যং যা পিধায় প্রলয়ঘনরুচিশ্চিদ্ঘনেন্দু-প্রকাশং
মায়াঘোরেন্দ্রজালঞ্চ চিকুরপটলৈস্তন্বতী যা করালী।
নানাহস্যগ্‌বীজকূটং প্রকটিতরসনা জক্ষতী সৃজ্যমানং
তৎসত্যং বাধমুক্তং হৃদয়নভসি নঃ কুর্ব্বতী সা সুহাসা ॥১০৮॥

মা কালী তাঁর এলায়িত কুন্তলরাশি দশ দিকে সঞ্চালিত করিয়া যেন মায়ার ঘোর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন ও করালী সাজিয়াছেন। কিন্তু তাঁর এই এলায়িত কেশপাশের যথার্থ রহস্য কি? ইহা দ্বারা যেন তিনি তাঁর যথার্থ সত্য মুখচ্ছবিটি, সেই পরম সুন্দর আননটি ঢাকিয়াছেন অর্থাৎ গোপন করিয়াছেন। তাই তাঁর যথার্থ রূপটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইতেছে। আবার এই করালীর দেখি লোলজিহ্বা। ঘন কৃষ্ণ কেশপাশের সঙ্গেই এই রক্ত-রসনা যেন মেঘের পাশে বিজলীর মতই শোভা পাইতেছে! যিনি ইন্দ্রজালে শত কোটি রক্তবীজ নিজেই সৃষ্টি করেন, যে রক্তবীজের স্বরূপ হইতেছে দুষ্পূর তৃষ্ণা—যতই মনে হয় এবার বুঝি তৃষ্ণা মিটিল, আবার দেখি সে মাথা গজাইয়া উঠিতেছে!—সেই তিনিই আবার কোপের ছল করিয়া পরম করুণায় নিজ লোলজিহ্বা দ্বারা এই রক্তবীজের 'কূট' বা সমূহ বা 'ঝাড়' কে গ্রাস করেন। নহিলে কি এ নিত্য তরুণায়মান তৃষ্ণার তর্পণ হইত কোনো কালে? তাহা হইলে আমরা পাইলাম যে, তাঁর এলায়িত কেশ পাশ এই ঘোর ইন্দ্রজালের বিস্তার সূচনা করিতেছে এবং লোল রসনা সেই ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট অসংখ্য কামনার নিধন বা সংহারকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে তাঁর সৃষ্টি ও সংহারের দুটি সঙ্কেত আমরা ধরিতে পারিলেও তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি, সেই পরম রমণীয় মুখচ্ছবিটি কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইতেছে। সে মুখখানি কেমন—কালো না ধলো? আমরা নিত্যই এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দোলায় দুলিতেছি। এই ধাঁধা, এই দ্বন্দ্ব, এই সংশয় তিনি স্বয়ংই আমাদের মোহমুক্ত হৃদাকাশে পূর্ণরূপে উদিত হইয়া দূর করিয়া দিবেন। তাই বুঝি তাঁর মুখে ঐ মৃদু মৃদু হাস্য! ॥১০৮॥

নৈঃস্পন্দ্যে স্পন্দ আদ্যশ্চিদমল-গগন-ধ্বান্ত-ঘোরাম্বুদঃ কিং
শশ্বন্ মৌনং বিলোড্য ধ্বনিশত-সতত-ধ্মাতনাদস্ততঃ কিম্।
ধ্বান্তধ্বংসায় সান্দ্রা স্ফুরতি চ পরমা চিন্নভশ্চন্দ্রিকা কিং
মান্দ্যং জীমূতমন্দ্রে ভজতি ভবমৃতেস্তুর্য্যনাদস্ততঃ কিম্ ॥১০৯॥

এই যে নির্ম্মল চিদাকাশে কালো ঘনঘটার আবির্ভাব, ইহা কি সেই শান্ত স্পন্দহীন স্বরূপের মধ্যে আদিম স্পন্দনের ঘনীভাবকেই সূচিত করিতেছে? যিনি পূর্ণ তাঁহাতে কেমন করিয়া কামনার উদয় হয়? যিনি নিঃস্পন্দ তাঁহাতে স্পন্দের আবির্ভাব হয় কিরূপে?—এ হেঁয়ালী চিরদিনই দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই কি তিনি কালো? সৃষ্টির গোড়াকার যত তত্ত্ব, যত বীজ—সব কিছুরই বর্ষণ তাঁহা হইতে, তাই সেই স্পন্দ কি মহাবৃষ বা বর্ষণকারী মেঘের রূপ ধরিয়াছে? তাই কি মা আমার সেই ঘোর কৃষ্ণ অম্বুদে নিজের প্রতিমাটি গড়িয়াছেন? আবার কোন্ শাশ্বত মৌনকে আলোড়ন করিয়াই বা তিনি মহানাদরূপে প্রকট হইলেন—যে-নাদ শত কোটি ঊর্মি বিস্তার করিয়া এই বাঙ্ময় বিশ্বসৃষ্টি করিল, আবার শেষে সম্বরণ নাদে সব সম্বরণ বা লয় করিল? এই কালো মহামেঘের ঘটা শেষে বিলীন করিয়া তিনি কি পরম চিরপূর্ণা চিদ্গগনচন্দ্রিকা-রূপে প্রকাশ পা'ন না? তেমনি এই কখনো গাঢ়, কখনো ঘোর যে মেঘমন্দ্র তাহাকে মন্দীভূত করিয়া তিনি কি অবশেষে তাঁর বিশ্বোত্তর অভয়েব ধামে সেই তুর্য্যনাদ বা তুরীয় নাদ শোনান না—যে-তুরীয় নাদে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—সব কিছুরই অবসান এবং যাহাতে মহাভীতিকর এই পুনঃ পুনঃ 'ভবের' বা সংসরণেরও মরণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ গতাগতিচক্র থামিয়া যায়। সুতরাং তাঁর এই কালোরূপের পশ্চাতে রহিয়াছে পরম আলো এবং তাঁর এই মহানাদের বিভিন্ন গর্জ্জন-আলোড়নের পিছনেও রহিয়াছে সেই পরম নাদ বা তুরীয় শান্ত প্রপঞ্চোপশম নাদ ॥১০৯॥

ক্ষিপ্যেবিশ্বং বিমৃশ্য ত্বদিতরদিব যৎ স্থাপয়ের্যৎ স্বভিত্তৌ
তচ্চ স্বাত্মেতি বিদ্যাঃ প্রমিতিপদমিতং বস্তু সংখ্যাপয়ের্যৎ।
স্বাত্মৈক্যঞ্চ প্রমেয়াদিকমিব গময়েদ্দর্পণাস্যং স্ববিম্বং
স্নাতুং স্পন্দং নদেস্ত্বং তবকলনকৃতৌ পঞ্চধা নিত্যকালি ॥১১০॥

হে মাতঃ! নিত্যকালি! তুমি পরম তত্ত্বের সাথে সমরসা, অভিন্না শক্তিস্বরূপিণী। তোমা ছাড়া অন্য কি বা ছিল বা আছে যাহাকে এই বিশ্বকন্দুকরূপে ছুড়িয়া লুফিয়া এই খেলা খেলিতেছ? 'যেন ওটা অন্য কিছু তুমি নও'—এ খেয়ালই বা তোমার কেন? এইরূপে যাকে ছুড়িয়া ফেল, তা'কে কি সত্যই একেবারে বাস্তহারা, সর্ব্বহারা করিয়া নিজের অঙ্ক হইতে একান্তই দূরে ফেল? তাকে কি নিজের ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া রাখ না? এ যেন আস্মানে ঘুড়িটি উড়াও কিন্তু সূতাটি রাখো নিজের নাটায়ে। সেই লক্ষ লক্ষ ঘুড়িগুলির মধ্যে যদি একটি কাটে, তবে সেও তো তোমারি ক্রোড়েই ফিরিয়া থাকে। যে ওড়ে সে হয় তো আত্মবিস্মৃত, জানে না কোন্ সূত্রধর তা'কে উড়াইতেছে, কিন্তু তুমি তো তা'কে ভোলোনা! বোধরূপ দর্পণে যাহা কিছু ফোটে, তাদের তুমিই রূপ, মান ইত্যাদি দিয়া থাক। আবার দর্পণ ভাঙিয়া যখন প্রতিবিম্বকে বিম্বে মিলাইয়া লও, তখন আবার তুমি যে এক সেই এক। সব কিছুকে অদ্বয়স্বরূপে টানিয়া লইবে বলিয়া তুমি বহিঃস্পন্দকে সম্বরণ নাদে অবসান করিয়া থাক। তাই নিত্যকালি! ক্ষেপণ, জ্ঞান, সংখ্যান, গমন, ও নাদ—এই পঞ্চরূপে তোমার কলন প্রপঞ্চিত করিয়াছ ॥১১০॥

ব্যস্তং খড়্গেন বস্তু ক্ষিপসি যদসকৃৎ স্বাত্মনো দেশকাল-
সম্বন্ধাপেক্ষতত্ত্বং জনিমৃতিভয়দং হংসি তচ্চাপি হেয়ম্।
ব্যস্তং মুণ্ডং করাব্জে কলয়সি চ গলে মুণ্ডমালাং সমস্তাং
দৃগ্‌ভাসা বেৎসি দৃশ্যং গিরসি রসনয়া যদ্ বহিঃস্ফারনাদে ॥১১১॥

আবার মা! তোমার খড়্গেরই বা কি অপূর্ব্ব রহস্য! তুমি ভূমারূপিণী অখণ্ড সামগ্রী—অথচ আপনার খড়্গে তাহাকে ব্যস্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে বারবার খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। নিজে দুই হ'ব, বহু হ'ব, অগণিত হ'ব—এই সাধেই কি অসিটি ধরিয়াছ? দেশ-কাল, কার্য্য-কারণ ইত্যাদি নানা সম্বন্ধের জাল উর্ণনাভের মত বুনিয়া তুমি কি এই ব্যস্ত খণ্ড বস্তুগুলিকে নিজের মধ্যেই গাঁথিয়া রাখিয়াছ? কী অপূর্ব্ব উপাদেয় তোমার এই বিরচন! সবই তো তোমাময়, তুমিই তো সব! অথচ ভ্রান্তিরূপে সকলকে ভুলাইয়া তুমি নিজেকে

জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, পাশ ইত্যাদিরূপ মহাবল দৈত্যরূপেই দেখাইতেছ। মাতৃজ্ঞানে তুমি উপাদেয় থাকিলেও ভ্রান্তিজ্ঞানে যেন হেয় হইলে! আবার দয়ারূপে এই হেয়রূপ অসুরকে অসি দ্বারা ছিন্ন করিলে! তোমার এ লীলার পার পাওয়া ভার। আবার তোমার করে দেখি একটি ছিন্নমুণ্ড, এদিকে গলায় দেখি বহু ছিন্নমুণ্ডের একত্র সমাবেশে গ্রথিত এক অপরূপ মুণ্ডমালা। তোমার করকমলে একটি ব্যস্ত মুণ্ড, আবার গলায় সমস্তের মালা—এইরূপে ব্যস্ত ও সমস্ত উভয়কেই তুমি ধারণ করিয়া আছ। একহাতে আবার তোমার বর, অপর হাতে অভয়। ঐ ব্যস্ত-সমস্তের যেটি সন্ধি বা সাম্যস্থল সেইটিই কি বর? আর ব্যস্ত-সমস্তের অতীত ভূমিই কি অভয়? তাই কি শ্রুতিতে শুনি ঐ সন্ধি বা মিথুনেই সব কিছু সমৃদ্ধি ও তৃপ্তি, অভ্যুদয় বা বরলাভ এবং তারও পারে সেই রসতমে পরম অভয়, চরম শান্তি? তুমি মাগো! তাই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, ভোগ ও মোক্ষ—উভয়ই তোমার দুই করে বিতরণ কর। এ সব রহস্যই তোমার নেত্রজ্যোতিতে তুমি দেখিয়া থাক। অন্য আর কে-ই বা জানে? আর তোমার জিহ্বা বাহুবৎ এই অনাত্মাকে আত্মসাৎ করে, ও শেষে স্ফারনাদে প্রপঞ্চের লয় ঘটিয়া থাকে ॥১১১॥

স্বাধিষ্ঠানপ্রকাশো বিমৃশতি চ কথং স্বামনন্যাং স্ফুরত্তা
মীশং মায়াং সদাখ্যং পরমশিবপদে কঞ্চুকাংশ্চাপি কস্মাৎ।
নাহং নেদং ন চোভে ন চ ভবতি গিরঃ প্রত্যয়শ্চাপি যত্র
তত্র প্রত্যেতি কালী বিলসতি চ মুদা নিত্যকৈবল্যতত্ত্বা ॥১১২॥

আবার প্রশ্ন জাগে: মা! তোমার স্বাধিষ্ঠান প্রকাশস্বরূপে কেমন করিয়া "তুমি—আমি," "দৃশ্য—দ্রষ্টা," "এটা, ওটা, সেটা"—এই সব বিচিত্র স্ফূর্তির রূপ ফুটাইলে? কিন্তু যেখানে যত কিছু স্ফূর্তি বা প্রকাশ সবই তো তোমারই স্বতঃস্ফূর্তি, তুমিই তো একমাত্র প্রকাশ। তুমি তো স্বয়ং পরমশিবপদ—তবে কেমন করিয়া তাহা হইতে সদাশিব, ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া প্রভৃতি তত্ত্বের ও কঞ্চুকের তুমি প্রসূতি হইলে? তুমি শুনি নিয়ত কৈবল্যরূপা—নিজের মধ্যে ভেদের কোনো বীজই রাখ নাই। অথবা সংগোপনে "আমি—তুমি" রূপ ভেদের বীজ কি নিজের মধ্যে রাখিয়া দাও নাকি? তোমার অগাধ রহস্যে কোনো বাচ্য-বাচকেরই গতি বা অবকাশ নাই। তবু হে কালি! তুমি

নিজের কলনে অনন্ত প্রত্যয় বা বোধরূপে,—তত্ত্ব, বস্তু, সম্বন্ধের বেশে—নিজেকে দেখাইলে, প্রকাশ করিয়া ধরিলে! চিতি হইয়াও তুমি বিশ্বভুবনের পরিচিতি হইলে। আবার নিজ কৈবল্যস্বরূপে সাক্ষাৎ আনন্দরূপিণী তুমি, শিবাদি তত্ত্বকে লইয়া নিয়ত আনন্দ উল্লাস করিয়া থাক ॥১১৫॥

চৈতন্যে নিষ্ক্রিয়েঽসৌ শিবশিবহৃদি যা প্রৈধতে শক্তিরূপা
সা শক্তিশ্চেতয়িত্রী চিতিরিতি গদিতা তাম্বতে চিন্মৃতেব।
যাস্তে তিস্রো লহর্য্যঃ কৃতিরতিমতয়ঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধৌ
তাভিঃ সৎ যৎ প্রমেয়ং প্রমিতিরিতি চিদানন্দ উল্লাসরাশিঃ ॥১১৩॥

আবার নিত্যকৈবল্যেও দেখি তোমার অপরূপ বিচিত্র বিলাস! পদতলে তোমার শবশিব। ও কি শুধু নিষ্ক্রিয় চৈতন্য, নিরঞ্জন অধিষ্ঠান মাত্র? কোনো কোনো মূর্ত্তিতে দেখা যায়, শিব বাহুর উপর ভর দিয়া মাথাটি ঈষৎ তুলিয়া আছেন। এইরূপে বক্রঠামে মাথাটি তুলিয়া তিনি কি তোমার লীলার "সাক্ষী" বা দ্রষ্টাও হ'ন? স্বরূপেতে রমণেচ্ছার দ্বারা তুমি দেখাইয়া দাও যে তুমি বিনা চিৎ শুধু চিৎই থাকে, চিতি হয়না, তোমা বিনা সে মূক, স্তব্ধ আনন্দ মাত্র, সেখানে উল্লাস-বিলাস নাই। চৈতন্যের অধিষ্ঠানে শক্তিরূপা তুমি মহোৎসাহে নাচিয়া চল। কে বলে যে সে-শক্তি জড়া, শুধু দৃশ্যা বা ভোগ্যা? সে যে চেতনেরও চেতয়িত্রী বা চৈতন্য সম্পাদন কারিণী। সে যে চিতিরূপা জগদ্ব্যাপিনী ("চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ")। চিতি বিনা চিৎ যে শবশিব, যেন মরার মতন। তুমিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রেতে তিনটি লহরী তুলিয়া থাক—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। ইহার ফলে সৎ জ্ঞেয়ের আকারে সত্যরূপ ধরিল, চিতের জ্ঞান-জ্ঞাতৃরূপে চেতনা হইল, আর আনন্দ অনন্ত উল্লাসরাশিরূপে আনন্দী হইল। এইরূপে সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশ সার্থক হইল ॥১১৩॥

আনন্দব্যোমসান্দ্রা ত্বমসি শশিকলা নিষ্কলা যা তুরীয়া
সাদ্যা নৈষ্কল্যনিত্যা কলয়সি চ কলাং শক্তিতত্ত্বাদিরূপাম্।
উন্মেষে পূর্ণিমোমা ধ্রুবনিজনিলয়েঽব্যাকৃতাঽমাস্যমেয়া
ব্যক্তৌ কামাদিমুখ্যাঃ কতিবিধকলনাস্তে কলা অম্ব কালি ॥১১৪॥

সর্ব্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে আনন্দরূপ আকাশ—যাহা সর্ব্ব-দ্বন্দ্বের উপরমস্থান, যাহার

যোগ বিয়োগ নাই, যাহা পূর্ণ ও পরম—সেই আদি আনন্দব্যোমে তুমি কেমন করিয়া অপ্রাকৃত সান্দ্র মনোরম শশিকলারূপে উদয় হইলে? কিরূপে তুমি স্বরূপতঃ নাদবিন্দুকলাতীতা নিষ্কলা তুরীয়া পরা স্বরূপিণী হইয়াও শক্তিকলা আকার ধরিলে, ঐ ললাটে শশিকলা ধারণ করিলে? যাহা পূর্ণ ও পরম তাহাতে সামরস্যে অচ্যুত থাকিয়াও তুমি শিবশক্তি-তত্ত্বাদিকলায় কেমন করিয়া দেখা দিলে? এই ইন্দুকলার প্রকাশে কি তোমার পরম অচিন্ত্য ইচ্ছাটিরই আবির্ভাব সূচিত হইতেছে? নিজের দ্বারা কল্পিত এই যে কলা ইহার পূর্ণোদয় হইলে অর্থাৎ কলার সম্পূর্ণতা লাভ হইলে তুমি হও পৌর্ণমাসীরূপিণী উমা, শ্রীবিদ্যা বা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী। আবার তোমার গোপন ধ্রুব আলয়ে তুমি নিত্য অমারূপিণী—যেখানে সমুদিত সমস্ত কলানিচয় বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেখানেও তুমি কি ললাটে শশিকলা ধারণ কর? একদিকে উমা, অপরদিকে অমা—এই দুই হইল পরমের সীমা। এই দুই সীমার মাঝেই "অউম" এই মাত্রাত্রয় লইয়া প্রমুদিত কামাদি কলায় তোমার কত না অসংখ্য কলন, কত না বিচিত্র পরিণাম—কে তাহার সংখ্যান বা গণনা করিবে? ॥ ১১৪ ॥

জ্যোতির্ব্যোম্নি স্বকীয়ে কিরসি নিজকণান্ ভাস্করা যে মহান্তো
নাদজ্যোতির্বিলোভ্য কলয়সি লহরীঃ কেন্দ্রসান্দ্রাংশ্চ বিন্দূন্।
ধারাধারঃ স কালঃ ক্রমলববিরহী বৈন্দবো যঃ ক্রমেত
ধ্বংসে চোভৌ স্বরূপেঽপ্যনবরগহনে কাল এবাসি কালী ॥১১৫॥

পূর্বশ্লোকে আমরা আনন্দব্যোম বা আনন্দরূপ আকাশের কথা বলিয়াছি। কিন্তু সে কি শুধু আনন্দব্যোম? সে যে আবার সকল জ্যোতির জ্যোতি। পরম আশ্চর্যময় সেই জ্যোতির্ব্যোমে তোমার জ্যোতি যেন সহস্র কণায় বিচ্ছুরিত হইয়া আন্তর ও বহির্বিশ্বে কত সব মহান্ ভাস্কররূপে প্রকাশ পাইতেছে! নিজের আনন্দজ্যোতিরূপ এই ব্যোমকে স্পন্দিত করিয়া তুমি আবার হও "নাদ" এবং নাদের লহরী। নাদ হইল অসীম ও বিস্তৃত। সেই অসীম বিতত নাদে আবার তুমি পরম ঘনীভাব সৃষ্টি করিয়া, অর্থাৎ সেই বিস্তৃত নাদকে তার চরম সূক্ষ্ম অবস্থায় লইয়া গিয়া, সঙ্কোচ করিয়া তুমি ধরো "বিন্দুরূপ"। এই নাদ এবং বিন্দু—এই উভয়ে তখন তুমি পূর্ণ হও। আর এই দুই পূর্ণের মাঝে

তুমি "কলা"য় কলায় লীলায়িত হও, নিজেকে বিবর্ত্তিত কর। এই নাদ-বিন্দু উভয়ের লহর উভয়ের পানে ধাবমান, অর্থাৎ একবার বিস্তার, আবার সঙ্কোচ, এবং একবার সঙ্কোচ, আবার বিস্তার—এইরূপে একবার বিস্তার নিজেকে সঙ্কুচিত করিতে চাহিতেছে, আবার সঙ্কোচ নিজেকে বিস্তৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই যে পরস্পরের মধ্যে গতি বা ধাবন—ইহাই জগৎ। ধাবনেও আবার তোমার দুই ধারা—নাদরূপে নিত্য মহাকাল, ধারার আধাররূপে বর্ত্তমান—তাহা অক্রম বা ক্রমশূন্য (অর্থাৎ succession বা পারম্পর্য্য তখনো আসে নাই), এবং ভগ্নাংশবিহীন অর্থাৎ অখণ্ড। আর বৈন্দবরূপে তুমি বিন্দু, বিন্দু হও, ক্রম এবং অংশরূপ ধারণ কর ; প্রথমটির প্রতীকরূপে দেখি তোমার পদতলে স্বয়ং মহাকাল, আর দ্বিতীয়তঃ মুণ্ডমালা মেখলায় দেখি তোমার বৈন্দবী মূর্ত্তি। তাই তুমি কালব্রহ্ম কালী ॥ ১১৫ ॥

উদ্গার্ণং কিঞ্চ জিহ্বা ত্বরয়তি কবলং কেবলং ব্যাকৃতং কিং
সাধ্বী বাহ্স্কৃস্ফুরন্তী দশনবররুচিশ্চর্ব্বণে ব্যাহৃতানাম্
(চর্ব্বিতানাম্)।
অগ্নীষোমার্ককপ্তাঃ কিমপি তব দৃশো ব্যাবৃতব্যঞ্জনায়
নির্ব্ব্যাপারৈকতত্ত্বা কৃতিবৃতিহৃতিভির্ব্যাপৃতা ব্যাপিতাভিঃ ॥১১৬॥

অব্যাকৃত তোমা হইতে যাহা কিছু ব্যাকৃত হইয়াছে অর্থাৎ তুমি যত কিছু উদ্গীর্ণ করিয়াছ বা বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছ, সেই সমস্ত কিছুকে আবার নিজের কবলে আনিবার জন্যই কি তোমার রসনা ব্যাপৃত রহিয়াছে? তাকে কি আর অন্য কোনো কাজ দাও নাই? আবার তোমার রক্তরাগরঞ্জিত দশন-বররুচি, দন্তপংক্তি কি শুধু ব্যাহৃত বা সৃষ্ট বস্তুরই ব্যাহরণে বা চর্ব্বিতেরই চর্ব্বণে নিরত? তোমার আদি ব্যাহৃতিটিই বা কি—যাহাকে তিন বা সাত বা অনন্ত ব্যাহৃতিরূপে প্রকাশ করিলে? ব্যাহৃতির গ্রন্থি-সন্ধি সব কিছু বুঝি তোমার চর্ব্বণে সমীকৃত হয়! তবে কি তোমার দশনের রক্তচ্ছটা—যে ব্যাহৃতি হোমে সব বৈগুণ্যের সমাধান হয়—সেই ব্যাহৃতি হোমের শিখা? আবার দেখি তুমি ত্রিনয়নী—অর্ক, অগ্নি, সোম—এই তিনটি নয়ন কি তোমার রসনাস্রুবায় যে নিত্য আত্মহোম চলিতেছে তারই তিনজন হোতা? তা'রা কি শুধু এই

কর্ম্মেই ব্রতী ? সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ; নাভি, অর, নেমি—এ সবই কি তোমার এই মহাকর্ম্মের সঙ্কেত ?

তুমি তো নির্ব্ব্যাপারৈকতত্ত্বা, পূর্ণব্রহ্মরূপা, তবে অনন্ত ব্যাপারে আবার তুমি ব্যাপৃতই বা রহিয়াছে কেন ? কোন্ প্রয়োজনেই বা এত ব্যাকৃতি-ব্যাহৃতি-ব্যাবৃতির ঘটা ? এ কি সবই শুধু স্বভাববশেই হইয়া চলিয়াছে ? স্বভাব-বাদীরা তো সেইরূপই বলিয়া থাকেন যে সবই আপনা-আপনি প্রকৃতির বশে হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা তো জানি তুমি নিমিত্ত না হইলে স্বভাব ও যে স্ব-অভাব হইয়া পড়ে অর্থাৎ তারও যে অস্তিত্ব থাকে না। তাই তুমিই তো সব কিছুর মূল ! ॥ ১১৬ ॥

জিহ্বায়াং বৈখরীবাক্ দতি কিমপি বসেন্ মধ্যমা স্ফোটমধ্যা
পশ্যন্তীঞ্চ ত্রয়ী কিং ব্যবসিতমনুদৃগ্-জ্যোতিষা স্বেন পশ্যেঃ।
সৌষুম্নং মধ্যগা ত্বং প্রবিশসি কুহরং ন্যস্যসি ন্যস্তবর্ণান্
মাত্রা বাহপ্যর্দ্ধমাত্রাহপ্যমিতপররবা নীরবা ত্বং পরাবাক্ ॥১১৭॥

বাকের দিক্ দিয়া যখন আবার দেখি তখন ভাবি তোমার ব্যক্ত রসনায় কি 'বৈখরী' বাক্‌কে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছ ? ['বৈখরী' বাক্ হইল স্থূল স্ফুটবাণী বা ব্যক্ত শব্দ এবং মনে রাখিতে হইবে যে বাচিক, উপাংশু ও মানস এই ত্রিবিধ ব্যবহারই বৈখরীর অন্তর্গত।] আর তোমার ঈষৎ বিস্ফুট দশনপংক্তিতে কি সেই 'মধ্যমা' বাক্‌কে প্রকাশ করিয়াছ, যে 'মধ্যমা' হইতেছে বাহিরের এই স্ফুটবাণী হইতে নিত্য স্ফোটে উত্তরণের সেতুস্বরূপ ? অপৌরুষেয় ত্রয়ী বা বেদরূপা যে 'পশ্যন্তী' বাক্—তা'কে কি সাক্ষাদনুভবগোচর মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থরূপে তুমি নিজের অকৃপণ অকুণ্ঠিত নয়নজ্যোতিতে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছ ? বৈখরীরূপ ত্যাগ করিয়া মাতৃকারূপিণী তুমি প্রথম নিগূঢ়া মধ্যমাতনু ধারণ করিয়া সুষুম্নাকুহরে প্রবিষ্ট হইলে এবং তার ফলে চক্রে চক্রে, কমলে কমলে, প্রত্যেকটির বর্ণময় যন্ত্র বিন্যাস করিয়া গেলে ! শেষে মহাকুণ্ডলিনী-স্বরূপা তুমি, পরতত্ত্ব-সামরস্যের পথে অগ্রসর হইয়া কি নিজের মুদিত যন্ত্র-তন্ত্রকে প্রস্ফুটিত বা 'পশ্যৎ' বা প্রকটরূপে প্রকাশ করিয়া তোল ? তুমি কোন্

অভিসারে চলিয়াছ? পরতত্ত্বে বা পরাবাকের দিকেই চলিয়াছ নাকি? কিন্তু তুমি কি স্বরূপতঃ পরাৎপরা বা পরারও পারে নও? তবু কেন মাত্রা, অর্দ্ধ-মাত্রা, পূর্ণমাত্রা এবং অমাত্রা এই চতুষ্পাদে, হে পরাবাক্! তুমি নিয়তই চলিয়াছ? এমনি করিয়া কি তুমি নাদ-বিন্দু, জ্যোতি ও আনন্দের বিচ্ছিন্ন ধারাকে বা মুক্তবেণীকে সেই পরম সঙ্গমে গিয়া যুক্ত কর? তাই কি তোমার এ অফুরন্ত অভিসার? ॥ ১১৭ ॥

বাগ্দোহং ধোক্ষি তারং কলয়সি চ মনূন্ হুংফড়াদীন্ সমার্থান্
বৌষট্ স্বাহা স্বধৈবং কতিবিধমনবস্তে চ বিদ্যাঃ কিয়ত্যঃ।
লক্ষ্মীর্বাণী চ কালী নিজনিজমনুগাঃ স্ব-স্ব-বর্ণৈঃ প্রকাশ্যাঃ
স্বৈঃ স্বৈস্তন্ত্রৈঃ প্রকার্য্যা ত্বমসি নিজকৃতৌ কালিকাদ্যা স্বতন্ত্রা
॥১১৮॥

তুমি আবার নিখিল বাকের সার বাগ্দোহরূপ ওঁঙ্কারকে কিসের দ্বারা সেই শান্তাতীত পরাবাক্ হইতে দোহন করিলে? তুমি তো শুধু শান্তা নও, শান্তাতীতা—তাই নিজেকে "তুষ্ণী—নাদ" এই যুগ্মরূপে ব্যক্ত করিয়া বিন্দুকে মন্থন করিলে এবং সেই মন্থন হইতেই অকারাদি সমস্ত কলাবর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। তুষ্ণী হইলেন শিব, এবং শিবা হইলেন নাদ—এই উভয়ের মেলনেই বিন্দুর মন্থন ঘটিয়া থাকে, যেমন উত্তর ও অধর অরণির ঘর্ষণে অগ্নির মন্থন হয়। তারপর, তুমি 'হুং' 'ফট্' ইত্যাদি কত না উৎসমুখে শক্তির ফোয়ারা খুলিয়া দাও! মন্ত্রময়ী মহাবিদ্যাই বা কত অসংখ্য তোমার! মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী—সকলকেই তুমি নিজ নিজ মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র দিয়াছ এবং তাহার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত ও আকারিত হইয়াছে দৈবীসম্পৎ। তুমি স্বয়ং কোন্ মন্ত্রে, কোন্ যন্ত্রে-তন্ত্রে ধরা দিবে বলিয়া আর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী, স্বচ্ছন্দা, স্বতন্ত্রা রহিলে না? অর্থাৎ তুমি স্বতন্ত্রা হইয়াও আমাদের কছে ধরা দিবে বলিয়াই নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া যেন মন্ত্রের পরতন্ত্র হইয়া, মন্ত্রাধীনা হইয়া প্রকাশ পাইলে! তাই অকিঞ্চন প্রপন্নেরও তুমি মা! করুণাবরুণালয়া! ॥ ১১৮ ॥

নো মন্ত্রৈর্মন্ত্রিতং তদ্ যতিততিপটুনী যন্ত্রতন্ত্রে ন তত্র
নো ধ্যানং তচ্চ ধত্তে চিদপি ন তু চিতির্নিবিকল্পে সমাধৌ।
শান্তাতীতঞ্চ শান্তে হর হরদয়িতে চণ্ডমুণ্ডৌ পশূ যৌ
রুন্ধানৌ স্তঃ প্রপিৎসুং স্বয়মিহ বৃণুয়া যদ্ বরেণ্যং শরণ্যে॥

॥১১৯॥

কিন্তু তুমি মন্ত্রাধীনা হইলেও, তুমি তো সর্ব্বমন্ত্রেশ্বরী, তবে বল দেখি কোন্ মন্ত্রশূলে নিজেকে "মন্ত্রিত" করিলে? আবার তুমি তো সকলের মূল যন্ত্রী, নিজ মহিমায় ধ্রুবা স্থিতা, তবে তোমার চালক আবার কোন্ সংযমনকুশল যন্ত্রচক্র? নিত্যস্বতন্ত্রা তোমাকে কোন তায়নে নিপুণ তন্ত্র পাশাঙ্কুশ ততি-গতি-পদ্ধতি শিখাইবে? তুমি যে নিত্য মুক্তকেশী, তাই বল দেখি কোন্ ধেয়ানেই বা সত্য তোমার "ধারণা" লাভ হয়? কঠশ্রুতিতে যে চরম আহুতিটির কথা বলা আছে—"তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি"—সেই নির্ব্বিকল্প "শান্ত আত্মনি" হবনটি হইলে আবার তুমি বলো "আমি শান্তাতীতা"! সুতরাং তোমার পার বা অবধি কোথায়? তাহা হইলে উপায়ই বা কি? তুমি প্রপন্নার্ত্তিহরা, কিন্তু তবু যে তোমার ঐ রাঙা চরণে শরণ নিবে বলিয়া মনের গহনে রাঙা জবা খুঁজিয়া মরে, তার পথে আবার তুমি কণ্টকের শূলরূপ, চণ্ডমুণ্ড মহা-পশু রাখিয়া দিয়াছ! তাই সে পশুবৎ মমতাবর্ত্তে, মোহগর্ত্তে ফিরিয়া মরে! সুতরাং হে শরণাগতপালিকে! তুমি নিজে না বরণ করিলে কে তোমার হইতে পারে? এ অকূলে, হে কুলেশ্বরি! তুমি ছাড়া কে কূল দেখাইবে? ॥১১৯॥

হৃদ্যাদ্যা যা শয়ানা দহরসুবিপুলা মান-মেয়াদ্দবিষ্ঠা
হৃল্লেখা যা তনিষ্ঠা জগদুদয়লয়াবৃত্তি-হেতুর্বরিষ্ঠা।
হৃদ্দেশে যা দ্রাঢ়িষ্ঠৈরয়তি চ ভুবনং ত্বাশ্রিতায় প্রদিষ্ঠা
যোগক্ষেমায় সাহম্বা শময়তু হৃদয়ং গ্রন্থিভেদে পটিষ্ঠা ॥১২০॥

আদ্যাস্বরূপিণী তুমি নিখিল সৃষ্টির হৃদয়ে (হৃদি) বা কেন্দ্রস্থলে শয়ানা রহিয়াছ। কারণের যে কেন্দ্র (nucleus) কে আশ্রয় করিয়া অণু বা বিরাট্ সকল কিছু স্পন্দিত হইতেছে, সেটি হইল তা'র "হৃদি"। এই হৃদি

আবার স্থূল বা পীন নয়, শ্রুতি বলেন সেটি 'দহর' অর্থাৎ সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু সেই দহরের মধ্যেও অবস্থিতা তুমি, সুতরাং তদপেক্ষাও সূক্ষ্মা, অণোরণীয়সী। এরূপ সূক্ষ্মতমা হইয়াও আবার তুমি মহানের অপেক্ষাও মহীয়সী এবং সেইজন্যই যাহা কিছু মান বা মেয়, সব কিছু হইতেই তুমি থাকো দূরতমা! অর্থাৎ কোনো মান-মেয়ই তোমার নাগাল পায় না, এমনই তোমার বিপুলতা, অসীমতা। যা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তা'র "হৃল্লেখা"—অর্থাৎ মূল শক্তিচিত্র লেখা (Basic Pattern or Power-Picture) রূপে তুমি হইয়াছ তনুতমা। আবার এই বিশাল জগতের উদয়, লয়, ও আবৃত্তির হেতু-ভূতারূপে তুমি উরুতমা, বিশালতমা! এতটুকু বীজকণিকার মধ্যেও, এমন কি ধূলিকণার মধ্যেও তোমার অত্যাশ্চর্য্য রূপ প্রকট করিয়া ধরিয়াছ। সেখানেও দেখি একটি স্থির কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য শক্তিপুঞ্জের অবিরাম নর্ত্তন। এই মূল চিত্রটি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে—নগণ্য জড় ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবকণা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উদাহৃত হইতেছে। আবার সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশেতে তুমি যেন বজ্রহস্তারূপে সকলের চালয়িত্রী হইয়া বসিয়া আছ, শুধু নীরবে বসিয়া নাই। তাই সকলেই তোমার ভয়ে নিজ নিজ কক্ষে, স্ব স্ব ধারায় আবর্ত্তন করিতেছে, কোথাও চ্যুতি ঘটিতেছেনা ("ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদি)। এই 'সেতু' বা নিয়মের বিধারয়িত্রীরূপে তুমি বজ্রের মতই দৃঢ়তমা। কিন্তু তোমাতে যে প্রপন্ন, তোমার যে একান্ত আশ্রিত, তা'র প্রতি আবার তুমি মৃদুতমা, কুসুমকোমলা! তাই আজ প্রার্থনা: তোমাতেই একান্ত প্রপত্তি-যোগের জন্য, তোমাতেই একমাত্র মতিক্ষেমের জন্য এ হৃদয়কে শান্ত করিয়া নাও—কারণ তুমিই যে সমস্ত গ্রন্থিভেদে পটুতমা! ॥ ১২০ ॥

সা কালী নিরুপাধিশুদ্ধনিলয়ে শান্তে নরীনৃত্যতে
কৈবল্যং বিদধাতি নির্গুণতয়া দ্বৈতং মরীমৃজ্যতে।
ব্রহ্মাস্মীত্যববোধ-খড়্গমহসা মিথ্যাজনীন্ প্রত্যয়া-
নাস্তে ব্রহ্মণি সর্ব্বমেব দধতি চেচ্ছিদ্যমানা স্বয়ম্ ॥১২১॥

সেই মা কালী নিরুপাধি শুদ্ধ শান্ত চৈতন্য-নিলয়ে, শবশিবহৃদি নিয়তই নাচিতেছেন, যেন কোন্ ভাবমদিরায় বিভোরা! তবে কি তিনি শুধু গুণময়ী,

গুণক্ষোভাত্মিকা? না, তা তো নয়। তিনিই যে আবার নিখিল দ্বৈতের লেশ পর্য্যন্ত বারংবার 'মার্জ্জন' করিয়া সাক্ষাৎ কৈবল্য দান করিয়া থাকেন। তাই কালী কৈবল্যদায়িনী। সুতরাং তিনি একাধারে গুণাত্মিকা, গুণাশ্রয়া আবার গুণাতীতা। তিনি আবার "ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মস্বরূপই" এই অববোধ বা জ্ঞানরূপ খড়্গের ছটায় মিথ্যা অহমিকা হইতে বিজৃম্ভিত সমস্ত ভবপ্রত্যয়কে নিরসন করেন। "তত্ত্বমসি"—"তুমিই তাই"—তাই আবার অসিচ্ছিন্ন মুণ্ডাস্থিনিচয়কে তো তিনি দূরে ফেলেন না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ"—এইভাবে ব্রহ্মময়ী তিনি সকলই আপনাতে ধারণ করেন মুণ্ডমালারূপে। তাই যাহা 'ছিন্ন' তাহাও 'সমাহৃত' হয় তাঁরই অখণ্ড সত্তায়। এইভাবে তিনি একাধারে নির্ব্বিশেষ একতত্ত্বা, আবার অশেষ তত্ত্বের সাক্ষাৎ জননী বা প্রসূতি; তিনি সর্ব্বতত্ত্বময়ী, ভুক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-প্রেম সব কিছুর পূর্ণ খনি! ॥ ১২১ ॥

অথ

জপসূত্রোপক্রমণী

পিহিতাদ্যন্তধারাস্থ বগাহ্যাধীরমূঢ়য়োঃ।
ভ্রান্তশ্রান্তে তু দৃষ্টী স্তঃ ক্রান্তশান্তে কবৌ মুনৌ ॥১॥

জপের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞানের আবরণ ক্রমশঃ উন্মোচন করতঃ দৃষ্টির ক্রমিক প্রসারণ। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি একান্তই বিভ্রান্ত। আমরা জানিনা কোথা হইতে আমরা আসিলাম, কোথায় বা চলিয়াছি। তাই সাধারণ জীব যে ধারায় পতিত, তাহার আদি এবং অন্ত উভয়ই অপিহিত বা আবৃত। এই ধারায় পতিত অধীর ও মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টি হয় দ্বিবিধ—ভ্রান্ত ও শ্রান্ত। অধীর যে, তা'র মধ্যে রজোগুণের আধিক্য হেতু দৃষ্টি হয় ভ্রান্ত এবং মূঢ় যে, তা'র ভিতর তমোগুণের প্রাবল্য হেতু দৃষ্টি হয় শ্রান্ত। কোনো তত্ত্ববিচার বা ধ্যানে বুদ্ধিকে বা দৃষ্টিকে নিযুক্ত করিতে গেলেই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে হয় বুদ্ধি তত্ত্বালোক লাভ না করিয়া বৃথা ঘুরিয়া মরে ও ভ্রান্ত জ্ঞানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা তত্ত্বানুসরণে একান্ত অক্ষম হইয়া কিছুদূর যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় ও শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। বুদ্ধির মধ্যে এই দ্বিবিধ মল, রজঃ ও তমঃ বা বিক্ষেপ ও আবরণ, থাকার দরুণই সাধারণ দৃষ্টির এই দ্বিবিধ রূপ দেখা দেয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ও শ্রান্ত। এই মল যেমন যেমন দূর হইয়া বুদ্ধি ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া উঠে, তেমন তেমন দৃষ্টিরও প্রসারণ ঘটিতে থাকে। মলিন দৃষ্টির যেমন দ্বিবিধ রূপ, তেমনি এই নির্ম্মল, বিশদ, স্বচ্ছ দৃষ্টিরও আবার দুই রূপ—ক্রান্ত ও শান্ত। ক্রান্ত দৃষ্টি হইল কবির এবং শান্ত দৃষ্টি হইল মুনির। নির্ম্মল দৃষ্টির এই দ্বৈবিধ্যের হেতু হইতেছে সত্ত্বের পরিণামের তারতম্য। সত্ত্বগুণের উদ্রেকেই এই নির্ম্মলতা দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের মধ্যে আবার দু'টি জিনিষ আছে—একটি আনন্দ, অপর প্রকাশ এবং ইহাদের মধ্যে কখনো একটির প্রাধান্য এবং অপরটির গৌণতা দেখা যায়। যখন আনন্দের প্রাধান্য,

তখন উল্লাস, বিলাস ও ব্যাপকতার অন্ত থাকে না। বুদ্ধি তখন অনন্ত বিস্তার লাভ করে, বিশ্বহ্লাদিনী হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন আনন্দ অপেক্ষা সত্ত্বের প্রকাশ অংশের আধিক্য হয়, তখন এই ব্যাপকতার গৌণতায় দেখা দেয় এক অসীম প্রশান্ত অতলস্পর্শী গভীরতা। তাই একটি দৃষ্টি আনন্দ আকাশকল্প, ও অপর দৃষ্টিটি জ্যোতির্ঘন মহোদধিকল্প; একটি হইতেছে ব্যাপিনী, অপরটি অবগাহিনী। কবির দৃষ্টির কাছে প্রকৃতি বা বিশ্ব, তা'র সমস্ত রহস্য উন্মুক্ত করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু আত্মার রহস্য তখনও অজ্ঞাত থাকে। আত্ম-রহস্য ভেদ করার জন্য তাই চাই মুনির মর্ম্মী শান্ত দৃষ্টি। তখনই জ্ঞানের বা দৃষ্টির যথার্থ পূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতা—এই উভয় সীমাতেই যখন বুদ্ধির অকুণ্ঠ গতি হয়, তখনই সে চরিতার্থতা লাভ করে।

সুতরাং এই ভ্রান্ত, শ্রান্ত এবং ক্রান্ত ও শান্ত—এই চতুর্ব্বিধ দৃষ্টির মধ্যে আমরা এক হিসাবে মানব-জ্ঞানের সব কয়টি স্তরেরই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইলাম ॥১॥

স্থূলং ব্যাপ্নোতি যৎ সূক্ষ্মমন্বয়ব্যতিরেকতঃ।
অনাবরকসংযোগবিয়োগাদ্যপেক্ষকম্ ॥২॥

পূর্ব্বে আমরা যে দৃষ্টির ক্রমিক স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহা বস্তুতঃ দৃষ্টির ক্রমিক সূক্ষ্মাবগাহিতারই পরিচয়। সাধারণ দৃষ্টি স্থূলে বা surfaceএই আবিদ্ধ থাকে, স্থূলের পিছনে আর সে যাইতে পারে না। কিন্তু যোগজ দৃষ্টি বা কবি ও মুনির দৃষ্টি স্থূলের পিছনে তাহার যে সূক্ষ্ম রূপ, তাহাকে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্মরূপটি সর্ব্বদাই স্থূলরূপকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন জাগিতে পারে: এই সূক্ষ্ম যে আছে তা'র প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ হইল অন্বয় ও ব্যতিরেক, অর্থাৎ যেখানেই স্থূল সেখানেই সূক্ষ্ম এবং যেখানে সূক্ষ্ম নাই, সেখানে স্থূলও নাই। তবুও শঙ্কা উঠিতে পারে যে তবে আমরা সর্ব্বদা সূক্ষ্মকে দেখি না কেন? ইহার উত্তর হইতেছে যে অনাবরকের সংযোগ-বিয়োগাদিকে অপেক্ষা করিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ কিছু আবরক থাকার দরুণই সূক্ষ্মের অনুপলব্ধি হয়, আবার অনাবরক অর্থাৎ আবরণের অপাবরকের সংযোগে

তা'র উপলব্ধি হয়। Positiveটি হয় Negationএর negationএ। সংযোগ-বিয়োগাদিতে যে আদিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতিকে ধরিতে হইবে। ধর, জপ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তা'র শক্তি সূক্ষ্মরূপে থাকিলেও স্থূলে সক্রিয় হইতেছে না, অর্থাৎ জপের কার্য্যকারিতা কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। সে ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছিলে তা'র আবরণ ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছিবার পর জপের ফল প্রত্যক্ষ হয়। এই বিশিষ্ট সংখ্যার পরিপূরণে জপের ফলবত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গায়ত্রী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণাদির বিধান শাস্ত্রে করা হইয়াছে ॥২॥

আরম্ভকাদিসূত্রেণ সহিতং ছন্দসা চ যৎ।
জ্ঞানং সূক্ষ্মস্য তজ্‌জ্ঞানং স্থূলস্য জ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩॥

অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, সূক্ষ্মের পরিজ্ঞান না হইলে স্থূলকেও যথাযথ জানা হয় না। স্থূলের কোন্ জ্ঞানটিকে উত্তম জ্ঞান বলিব? না, আরম্ভকাদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনাবরক সংযোগ বিয়োগাদিরূপ যে সূত্র অর্থাৎ Principles এবং ছন্দঃ অর্থাৎ যে বিধান অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি কার্য্য করে, the law according to which the principle operates—এই উভয়ের সহিত অর্থাৎ সূত্র ও ছন্দঃ সমেত যে সূক্ষ্মের জ্ঞান—তাহাই স্থূলের সম্যক্ জ্ঞান। তখনই স্থূলকে ঠিক ঠিক জানা হয় ॥৩॥

[দ্রষ্টব্য—জপাদি কর্ম্মে দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ যেমন আবরক বা প্রতিবন্ধক (negative moment) রূপে থাকিতে পারে, সেইরূপ এ সকল আবার অনাবরক (positive moment or factor) রূপেও থাকিতে পারে। পরে দেখান হইয়াছে যে এই অনাবরণ কর্ম্মটি সমারম্ভ থেকে সুরু হইয়া সমাপন পর্য্যন্ত সাতটি ধাপে শেষ হইয়া থাকে। প্রতি ধাপেই মান্দ্য (slowing down) ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং মান্দ্য পরিহার পূর্ব্বক লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌছিতে গেলে কতকগুলি সূত্র এবং তাদের প্রয়োগের ছন্দঃ অনুবর্ত্তন করিতে হয়। করিতে পারিলে, জপের মন্ত্র এবং তার ভাবনা তাদের স্থূল সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া উদার, বিপুল, সূক্ষ্ম শক্তিরূপে প্রকটিত হইবে। তখন মন্ত্রাদির যথার্থ শাপমুক্তি এবং পাশমুক্তি।]

যতোঽনাবরকং সূত্রং ছন্দশ্চ সূক্ষ্মসংবৃতম্ ।
সূক্ষ্মজ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানং সূক্ষ্মং জ্ঞেয়ং পরং হ্যতঃ ॥৪॥

পূর্ব্বোক্ত অনাবরক সূত্র ও ছন্দঃ—এ দুটিই কিন্তু সূক্ষ্মের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাই এ দুটিও সূক্ষ্মেরই অন্তর্গত। আর সূক্ষ্ম জ্ঞানকেই "বিজ্ঞান" বা বিশেষ জ্ঞান বলা হয়। স্থূল জ্ঞান সামান্য জ্ঞান মাত্র। অতএব, সূক্ষ্মকেই বিশেষভাবে জানিতে হইবে, তাহাই পরম জ্ঞেয়, কারণ সূক্ষ্মকে জানিলেই স্থূলকেও জানা হইয়া যায়, যেহেতু স্থূলটি সূক্ষ্মেরই অন্তর্ভুক্ত ॥ ৪ ॥

[আশঙ্কা হইতে পারে—বীজের আবরণ ভঙ্গের পক্ষে মৃত্তিকার রস, তাপ, আলোক, বায়ু তো স্থূলই ; সত্য, কিন্তু স্থূলরূপেই সে সকল আবরণ ভঙ্গের হেতু হয় না ; বীজনিষ্ঠ যে সূক্ষ্ম স্পন্দনাদি তার সমজাতীয় ও সমরূপ হইয়াই তারা আবরণভঙ্গের হেতু হইয়া থাকে। স্থূল কোনো ক্রিয়াদ্বারা "মন্ত্রচৈতন্য" ঘটাইতে গেলেও সে ক্রিয়াজন্য স্পন্দনাদি (১) সূক্ষ্মতার এক নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় যাইবে, এবং (২) ছন্দোগত অনুরূপতা পাইবে। নচেৎ, শতচেষ্টাতেও মন্ত্রচৈতন্যের "উপযোগ"টি ঘটিবে না। গুরুশক্তি এবং জাপকের শ্রদ্ধার আধারেই এই উপযোগটি সহজসাধ্য হয়।]

ক্রমানুরোধিনী ধারা পর্য্যবস্যতি যত্র চ।
সর্ব্বেষ্বন্বয়াদ্ ব্রহ্ম তচ্চ ব্যোমেতি পশ্যত ॥৫॥

এই যে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ইত্যাদিরূপ ক্রমানুরোধী ধারা—এর একটা পর্য্যবসানের ভূমি আছে, যেখানে সূক্ষ্মতা তা'র চরম কাষ্ঠায় গিয়া পৌছায়। এই সূক্ষ্মতার ধারা কেবলই চলিয়াছে, ইহার কোথাও পরিসমাপ্তি বা অবসান নাই—এরূপ বলিলে অনবস্থারূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তা' ছাড়া, শ্রুতি ও অনুভব দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয় যে কোথাও একটা পরিসমাপ্তি বা কাষ্ঠা আছে। এই কাষ্ঠা যিনি, সর্ব্বের মধ্যে অন্বিত তিনি ব্রহ্মই, তবে তখন তাঁর বিশেষ সংজ্ঞা—ব্যোম বা আকাশ। (ব্যোম=বি+ওম্। নিখিল বিশেষের উদয়, স্থিতি এবং অবসানের "ভূমি" যেটি, সেটি নাদ, ওঁ। আবার, ব্যাপ্তি এবং অবধি এই উভয়রূপে "কাশ", প্রকাশ যে আধারে সেটি

আকাশ।) অতএব, এই পরোবরীয়ান্ প্রবাহের চরম সীমা হিসাবে, তাঁ'কে ব্যোমরূপে দেখ ॥ ৫ ॥

[জপের যেটি বাক্, কিনা মন্ত্র, সেটিকেও ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যোম পর্য্যন্ত এই পঞ্চতত্ত্বরূপে ভাবনা করিবে। যেমন, জপের স্থূল বা প্রকট-ভাবে উদয়ের স্থান=ক্ষিতি; লয়ের স্থান=অপ্; তৈজস শক্তিরূপে আবির্ভাবের স্থান=তেজঃ; সর্ব্বব্যাপী বিপুল স্পন্দরূপে বিততির স্থান=বায়ু; এবং এই সকলের চরম আধার বা আশ্রয় স্থান=ব্যোম।]

আশ্চর্য্যং যচ্ শুক্লকৃষ্ণ-পক্ষাভ্যাং চ প্রকাশয়ন্।
আবরয়ন্নিদং সর্ব্বং ব্যোমাত্মা তার্ক্ষ্য ঋধ্যতি ॥৬॥

এখন তার্ক্ষ্য বা গরুড়কে এই ব্যোমাত্মারূপে কল্পনা কর। এঁর আশ্চর্য্যময় রূপ—দুটি পক্ষ ইনি বিস্তার করিয়াছেন—একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণ। একের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন, অপরটি দ্বারা আবরণ করিতেছেন। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে একটি দিবা, অপরটি রাত্রি। এই দুই পক্ষপুটেই তিনি সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন—("শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে") ॥ ৬ ॥

[ক্ষিতিরূপে জপ বাক্ ও কায়ের প্রতিকূলবৃত্তি আবরণ ও অনুকূলবৃত্তি প্রকাশ করে। সেখানে গরুড়ের কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ দুটি ইহাই। অপ্‌রূপে জপ প্রাণ এবং অব্যক্তমন (Subconscious) এর ভূমিতে অনুরূপ কর্ম্মটি করে। তেজোরূপে বাক্, কায়, প্রাণ এবং মন এ চারিটিরই অনুকূল উত্তেজক হয়। বায়ুরূপে এ সবের মূলে যে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) সেটিকেও সহায় করে। আর, ব্যোমরূপে মূলপ্রকৃতিকেও। প্রতিটি স্তরেই দুটি (+,−) পক্ষ রহিয়াছে। এ হেন গরুড়ই শ্রীভগবানের বাহন। বেদে এবং গরুড় পুরাণাদিতে ইনি প্রখ্যাত।]

বীজাদিষু হি সর্ব্বেষু প্রকাশ্যতাঽপ্রকাশ্যতে।
দ্বে শক্তী যুগপৎ স্তশ্চ প্রকাশিকানিরোধিকে।
যদনুপাতবৈষম্যাদ্ ব্যক্তাব্যক্তনিরূপ্যতা ॥৭॥

কিভাবে ইহা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত, তাহা দেখ। বীজাদি সকল পদার্থের ভিতর দু'টা জিনিষ—প্রকাশ্যতা ও অপ্রকাশ্যতা—এই উভয়ই

রহিয়াছে। বীজটি প্রকাশোন্মুখ হইয়াও কিছু অপ্রকাশ রহিয়া যাইতেছে। আবার অপ্রকাশ থাকিয়াও যেন নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করিতেছে। এক হিসাবে, জগতের কোনো বস্তুই সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত বা প্রকাশিতও নয়। এক বিচিত্র আলো-আঁধারের সমাবেশে যেন তাহারা আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মূলে দু'টি শক্তি কাজ করিতেছে—একটি নিরোধিকা বা Veiling, অপর মোচিকা বা Revealing factor. এই আবরণ ও উন্মোচনরূপ শক্তিদ্বয়ই বিশ্বের সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল। এদের যে অনুপাত বৈষম্য বা ratioর তারতম্য, তদনুসারেই সব বস্তুর ব্যক্তাব্যক্ততা নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এই ratioর উপরই নির্ভর করে, বস্তুটি কতটা ব্যক্ত বা কতটা অব্যক্ত। যেখানে মোচিকা শক্তির অনুপাত অধিক সেখানে বস্তুটিকে বলি ব্যক্ত, আবার নিরোধিকা শক্তির অনুপাতাধিক্য ঘটিলে বলি অব্যক্ত ॥ ৭ ॥

[পরে জপশক্তির বা ছন্দের যে সাতটি মান্দ্যের স্থান কথিত হইয়াছে, সে সব স্থানে আসলে হয় কি? মোচিকা এবং রোধিকার যে অনুপাত, সেটি ভগ্নাংশ হয়, অর্থাৎ লব (মোচিকা) চাইতে হর (রোধিকা) বড় হয়। ফলে, জপের শক্তি হ্রাস। যেমন দেহে metabolismএ অনুপাত বৈরূপ্যে দেহের ক্ষয়। দেহে যেমন জপেও তেমনি ঐ অনুপাতটি অনুকূলে পাইতে হয়। তার এক প্রকৃষ্ট সাধন এই—উক্ত মান্দ্যস্থানটিকে (retarding factor) সমিধ্‌রূপে ভাবনা করতঃ অন্তর্জ্যোতিতে সেটিকে ইন্ধন কর। ফলে সেটি অগ্নীন্ধন হইবে। "ওঁ যদিদং ময়িদং সমারম্ভক-দৌর্ব্বল্যরূপং মান্দ্যং তদহং হব্যং কল্পয়ামি, তচ্চ (শ্রীশ্রী ইষ্টদেবতা) পরমজ্যোতিষি জুহোমি ওঁ ভূঃ স্বাহা॥" এইভাবে এক একটি মান্দ্যস্থান এক এক ব্যাহৃতি যোগে পরমজ্যোতিতে হবন কর।]

ভূয়স্ত্বং যন্মোচিকায়াস্তদাবিরিতি দৃশ্যতে।
ভূয়স্ত্বে রোধিকায়া বা তদেব গৃহ্যতে ক্ষপা ॥৮॥

মোচিকা শক্তির যখন ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য তখন বলি আবিঃ (যেমন, আবিষ্করোতি, আবির্ভবতি প্রভৃতি শব্দে আবিঃর এই অর্থটা ধরা পড়ে), তেমনি যখন দেখি রোধিকা বা আবরিকা শক্তির ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য, তখন

বলি ক্ষপা বা রাত্রি। দিনে যেমন প্রকাশের আধিক্যে সব দেখা যায়, আবার রাত্রে যেন সব ঢাকিয়া যায়—এ'ও সেইরূপ ॥ ৮ ॥

(মোচিকা=মো=ম ; রোধিকা=রো=র। ম=সোম, র=অগ্নি। সৃষ্টির সর্ব্বত্র, সুতরাং জপাদিতেও ম : র এই অনুপাতটি চলিতেছে। সোম মাত্রার প্রাধান্যে পোষণ এবং স্নিগ্ধতা; অগ্নিমাত্রার প্রাধান্যে দহন, শোষণ ও রুক্ষতা। এ সমস্ত পরে আলোচিত হইয়াছে। জপকর্ম্মে 'র' এর আধিক্যে শরীরে ও মনে সন্তাপের (জ্বালা, অনিদ্রা, মনের রুক্ষতা ইত্যাদি) লক্ষিত হইতে পারে। তখন সোমের উদ্রেক যাতে হয় তাই করণীয়।)

আবিষ্ট্বং কিঞ্চ রাত্রিত্বং দৃগ্‌ভঙ্গীনয়কল্পিতে।
যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যাদৌ স্মর্য্যতে যথা ॥৯॥

এই যে আবিঃ ও রাত্রিরূপা—এ দুটি নির্ভর করিতেছে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর; অর্থাৎ, কোন্ standpoint হইতে দেখা হইতেছে, তারই উপর ক্ষপাত্ব বা আবিষ্ট্ব অর্থাৎ রাত্রিত্ব বা দিবাত্ব নির্ভর করিতেছে। এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে যাহাকে ক্ষপা বা রাত্রি মনে হয়, অপর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে তাহাই আবার আবিঃরূপেও প্রতীত হইতে পারে। তাই গীতাও "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন যে সর্ব্বভূতের অর্থাৎ সাধারণ প্রাকৃত জনের নিকট যাহা রাত্রি, সংযমী বা যোগী সেখানেও জাগ্রত অর্থাৎ সেটি তাঁর কাছে দিবাতুল্য, আবার সর্ব্বভূতের নিকট যাহা জাগরণের ভূমি বা দিবাস্বরূপ, তাহাই যোগী বা মুনির উন্মীলিত দৃষ্টির কাছে নিশা বা ক্ষপাসদৃশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য অনুসারেই একই বস্তু ক্ষপা বা আবিঃ—এই দুই রূপ ধারণ করিতেছে ॥ ৯ ॥ [জপের বেলা এই দিবা এবং ক্ষপা তত্ত্ব বিশেষভাবে চিন্তনীয়। যেমন, বৈখরী (স্থূল) জপের বিচ্ছেদে যখন মধ্যমা (সূক্ষ্ম) জপ চলে, তখন পূর্ব্বালোচিত "প্রথম পুরুষের" কাছে সেটি "রাত্রি", কিন্তু "মধ্যম পুরুষের" দৃষ্টিতে সেটি "দিবা"। এইরূপ জপাক্ষর ধ্যান এবং জপার্থ ধ্যান সম্বন্ধে একের দিবা অন্যের রাত্রি হইতে পারে। Kinetic ও Potential ভেদ তুলনা কর।]

আবীরাত্রীতি যুগ্মত্বং সর্ব্বমন্বেতি বৃত্তিমৎ।
একেন বাধিতা চান্যেকেনান্যা সাধিতা ভবেৎ ॥১০॥

সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে এই আবিঃ ও রাত্রিরূপ যুগ্মত্ব। যদিও দেখা যাইতেছে, ইহারা পরস্পর বিরোধী এবং একের দ্বারা অপরটি বাধিতই হয়, কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে একের দ্বারা অপরটি সাধিতও হয়। যেমন বিরুদ্ধ শক্তির নিরোধের দ্বারা একটি বস্তুর স্বরূপ-আবির্ভাবের সহায়তা হয়। এখানে নিরোধ আবির্ভাবকে সাধনই করিতেছে, বাধন করে নাই। সুতরাং আবিঃ ও রাত্রি কেবল পরস্পর বাধকই নয়, সাধকও বটে ॥১০॥

(যেমন, জপাক্ষর অথবা জপার্থ ধ্যান করিব, এবং তজ্জনিত জ্যোতীরসে অভিষিঞ্চিত হইব। একতানা বা একাগ্রবৃত্তি না হইলে এই "আবিঃ" রূপটি সম্ভবপর হয় না, কিন্তু তন্নিমিত্ত কি চাই? এর বিরোধী যে তিনটি বৃত্তি (ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়) তাদের "রাত্রি" কিনা, নিরোধ চাই। শুধু তাই নয়, "নিরোধ" নামে যে পঞ্চমীবৃত্তি, সেটিরও নিরোধ চাই। নচেৎ, জপে ধ্যান অথবা সম্প্রজ্ঞাত ভূমি হইবে না।)

অরিস্পন্দনিবৃত্ত্যা যন্মিত্রস্পন্দপ্রবর্ত্তনম্।
যুগ্মং তত্রানুসন্ধেয়ং জপাদিসর্ব্বকর্ম্মসু।
ক্ষয়ায়াচ্ছাদ্য রোদ্ধব্যং ছন্দশ্ছাদয়তি শ্রিয়ম্ ॥১১॥

এখন দেখ, জপাদি সকল কর্ম্মের মধ্যে কিভাবে ঐ যুগ্মকে অনুসন্ধান করিবে। জপকর্ম্ম অরিস্পন্দকে বা প্রতিকূল স্পন্দকে (vibrationsকে) নিরোধ করেন রাত্রিরূপে, এবং আবিঃরূপে মিত্রস্পন্দকে প্রকাশ করেন। জপজনিত যে ছন্দঃ তা'র কাজ হইল আচ্ছাদন ('ছাদনাৎ ছন্দঃ')। এই আচ্ছাদনও দুই ভাবে—এক, ক্ষয়ের জন্য আচ্ছাদন করেন, রোদ্ধব্য যেগুলি অর্থাৎ প্রতিকূল বৃত্তিগুলিকে অভিভূত করেন সমূলে বিনাশের জন্য, এবং শ্রীকে অর্থাৎ অভ্যুদয়ের হেতুভূত যে দৈবীসম্পৎ তা'কে রক্ষা করেন বর্ম্মের মত। তাই ছন্দের আচ্ছাদন-ক্রিয়াতেও এই যুগ্মভাব ॥১১॥

(ছন্দোমাত্রের 'গোপ্তব্য' এবং 'রোদ্ধব্য'—দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অনুনাসিক তালব্য 'ছম্' দ্বারা প্রথমটি এবং হসন্ত দন্ত্য 'দস্' দ্বারা দ্বিতীয়টি সূচিত হয়। প্লুত উচ্চারণ করিয়া প্রাণপ্রযত্ন ব্যাপারটি লক্ষ্য কর। এই দ্বিবিধ মূলবৃত্তি আশ্রয়েই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জপে কায়িকাদি বিঘ্ন রোধ করতঃ জপক্রিয়াফলটিকে রক্ষা করিতে হয়—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং।"

যাবদ্ধি বর্দ্ধতে জ্যোতিরুত্তরভূমিকান্বয়াৎ।
তাবদ্ বর্দ্ধেত তামিস্রমধস্তান্ নক্তমাশ্রিতম্ ॥১২॥

এই দুটি যুগ্ম-তত্ত্বের আর একটি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে: একের বৃদ্ধিতে আবার অপরের বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। উত্তরোত্তর ভূমিতে যেমন জ্যোতিঃ বা আবিঃ বর্দ্ধিত হয়, অপর প্রান্তে, অপর poleএ তেমনি তামিস্র বা অন্ধকার সেই পরিমাণে গাঢ় হইতে থাকে। জপাদি সাধনের ফলে চেতনার বা প্রকাশের দীপ্তি যেমন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে থাকে, তেমনি অবচেতনে যে সব আসুর প্রতিকূল সংস্কারগুলি সুপ্ত আছে, সেগুলিও যেন প্রবল শক্তিতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে ও তাদের অন্ধকারের রাজ্যকে আরো কায়েম করিতে চায় দ্বিগুণ পরাক্রমে। তাই জ্যোতিঃ ও রাত্রির এমন অবিনা-সম্বন্ধ যে একের বৃদ্ধি হইলে অপরটিও আর একদিকে বৃদ্ধি পাইয়া চলে! ॥১২॥

(আলোক এবং তামিস্র দুয়ে মিশিয়া এক "ধূম্রলোক" সৃষ্টি করিয়াছে। জীবের চলতি ব্যবহার তাতেই। 'আলো' ও 'আঁধারকে' গোড়ায় তফাৎ করিয়া লইতে হইবে। দুটোকেই আলাদা আলাদা 'খাঁটি' ভাবেই পাওয়া আবশ্যক। Eliminationএর আগে isolation.)

নক্তন্দিবমিতি দ্বন্দ্বে যঃ সন্ধিঃ সন্দধীত তম্।
ঋতে ন সন্ধি-সন্ধানাদহোরাত্রসমন্বয়ঃ ॥১৩॥

এই নক্তন্দিবার বা রাত্রিদিনের যেটি সন্ধি—যেটি অভিব্যক্তও বলা যায় না, অনভিব্যক্তও বলা যায় না—সেই Zero Point বা Neutral Pointকে অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে। কারণ, এই সন্ধি-সন্ধান ব্যতিরেকে অহোরাত্রের সমন্বয় হইবেনা, এই দিবা রাত্রির দ্বন্দ্ব মিটিবেনা।

এই জন্যই মহাত্মা-মহাজনদের চিরন্তন উপদেশ—"সন্ধিকো পাকড়ো"। আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যা-বন্দনাদির জন্যও যে সব সন্ধি-কালগুলি প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নির্দ্দিষ্ট আছে, তা'ও সন্ধিকে ধরাইবার জন্যই। ঐ ঐ সময়ে প্রকৃতিও স্বভাবতঃ সন্ধিগামিনী হইয়া থাকেন, সেইজন্য সাধক সেই সময়ে সজ্ঞানে প্রকৃতির এই আনুকূল্যকে কাজে লাগাইতে পারিলে সহজেই সন্ধি-লাভে ও দ্বন্দ্ব অতিক্রমে সমর্থ হয়। যেমন রাত্রির নিবিড় সুপ্তি-জড়িমা কাটিয়াছে কিন্তু এখনো দিনের কোলাহল-মুখরতা সুরু হয় নাই—এই সন্ধিতে প্রাতঃসন্ধ্যার বিধান। সেইরূপ সারা দিনের কর্ম্মকোলাহল শান্ত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনো সুপ্তির ঘোর তমিস্রায় ডুবিয়া যায় নাই—এই অবস্থায় সায়ং সন্ধ্যার বিধান। এই প্রসঙ্গে মায়ের সন্ধি-পূজার রহস্যও চিন্তনীয় ॥১৩॥

সমেরুসন্ধিসেতুং যস্ত্রিসূত্রীং ভজতি ক্রিয়াম্।
বৈপ্রতীপ্যেন তস্য স্যান্ নক্তং দিবা হ্যহঃ ক্ষপা ॥১৪॥

মেরু, সন্ধি ও সেতু—এই ত্রিসূত্রীকে অনুসরণ করিয়া যিনি ভজন করেন বা ক্রিয়াতৎপর হ'ন, তাঁর কাছে বিপরীতক্রমে দিন রাত্রি হয় এবং রাত্রি দিবা হয়, অর্থাৎ তিনি গীতোক্ত সংযমী মুনির অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই তিনটির জ্ঞান বিশেষভাবে অপেক্ষিত। এই তিনটিকে যথার্থভাবে জানিলে তবেই জপাদিকর্ম্মে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যায়, নতুবা সবই বৃথা হইয়া পড়ে। হয়তো জপ করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু জানিনা মেরু অর্থাৎ "Crisis Phase", বা Climax কোনটি, যেখানে আসিয়া থামিতে হইবে, কারণ এই ঠিক মত না থামিয়া যদি আরো অগ্রসর হইয়া চলি ও মেরুকে উল্লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে পূর্ব্বের সবখানি চেষ্টাই বৃথা হইয়া পড়িবে, এমন কি অবাঞ্ছিত পরিণামও ঘটিতে পারে। তেমনি সন্ধি বা neutral point কখন আসিয়াছিল, তা'কে জানিলাম না, সুতরাং তা'কে চাপিয়া ধরা, avail করাও হইল না এবং বৃথা দ্বন্দ্বের আবর্ত্তনেই ঘুরিয়া মরিলাম। ফাঁক পাইয়াও গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইতে পারিলাম না। আবার কখনো ক্রিয়ার প্রান্তভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটিতেছেনা। কোথায় যেন

একটা ফাঁক, একটা Chasm রহিয়া যাইতেছে। এপার এবং ওপারের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়া যাইতেছে। গুরু হয়তো কৃপা করিয়া এই ব্যবধানটি দূর করিয়া দেন মধ্যে একটি সেতু স্থাপন করিয়া। ঠিক যে সময়টিতে তিনি সেতুটি পাতিয়া দেন, সেই সময়ই সেতুর সুযোগ লইয়া পার হইয়া যাইতে হইবে। তাই সেতুকে না জানিলে এই উত্তরণ সম্ভবই হইবে না। কখন সেতুটি পড়িল, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতএব, মেরু, সন্ধি ও সেতু—এই তিনটি জপাদিসাধনের সব চেয়ে বড় সঙ্কেত ও এগুলির তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা এখন মেরু, সন্ধি ও সেতু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব ॥১৪॥

(ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি যে মাটি, জল ইত্যাদি নয় তা দেখিয়াছি। পাঁচটি মূল উপাদান তত্ত্ব। সৃষ্টির সব কিছুতেই পাঁচটির মিশ্রণ—'পঞ্চীকরণ'—হইয়াছে। সুতরাং জপকর্ম্মেও বটে। এখন ধর, ক্ষিতিতত্ত্বে প্রধানভাবে জপ হইতেছে। ফলে কর্ম্মে স্থূলতা, জড়তা, গুরুতার আধিক্য। আয়াসবহুল, অল্পেই ক্লান্তি আনে—mechanical, laborious, fatiguing. এ প্রকার জপকে অপ্, তেজঃ প্রভৃতি উপরকার স্তরে উঠিতে গেলে ঐ মেরু, সন্ধি, সেতু—এই তিনটি ধরিতেই হয়।)

সুমেরুশ্চ কুমেরুশ্চ মধ্যমেরুরিতি ত্রিধা।
যো জানীতে স জানীতে কলাকাষ্ঠান্বয়ং ধ্রুবম্ ॥১৫॥

কলার বৃদ্ধির যে ধারা ও কাষ্ঠা তার অন্বয়টি বা যোগটি তিনিই জানেন, যিনি সুমেরু, কুমেরু ও মধ্যমেরু এই ত্রিবিধ ভাবকে জানেন। সব ক্রিয়ার একটা Critical phase আছে, তাহাকেই মেরু বলা যায়। যেমন সূর্য্য উদয় হইল এবং উঠিতে উঠিতে apexএ, শিখরদেশে মধ্যগগনে পৌছিল—এইখানে সে বৃদ্ধির একটা কাষ্ঠায়, Climaxএ গিয়া পৌছিল কারণ, ইহার পরেই সে অস্তের দিকে ঢলিয়া পড়িবে। চন্দ্রের বেলাতেও অনুরূপ। শুক্লপক্ষে কলায় কলায় বৃদ্ধি হইতে হইতে পূর্ণিমায় গিয়া Climaxএ পৌছে, আবার তারপর হইতেই ক্ষয়ের দিকে গতি সুরু হয়। এইরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্র—যেমন মানুষের যৌবনে পূর্ণতা ও তারপরেই ক্ষয়োন্মুখতা ইত্যাদি। এই মেরু বা "Crisis

Phase"কে তিনভাবে দেখা যাইতে পারে—Positive, Negative ও Neutral. প্রথমটিকে সুমেরু, দ্বিতীয়টিকে কুমেরু ও তৃতীয়টিকে মধ্যমেরু বলা যাইতে পারে ॥১৫॥

(কেবল কি এই পৃথিবী—সৃষ্টিতে স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ—অণু কি মহান্—সমস্তই "মেরুত্রয় আকৃতিটি" পাইয়াছে। একটা দোলক দুলিতেছে, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে, অণুর ভিতরে ইলেক্‌ট্রন পাক খাইতেছে, জাগরণের পর নিদ্রা, নিদ্রার পর জাগরণ আসিতেছে—ইত্যাদি সকল দৃষ্টান্তেই ঐ মেরুত্রয়রূপটি অনুসন্ধান কর। ধর কোন একদিকে ক্রিয়াটি হইতেছে। সে দিকে একটা 'সীমা' পর্য্যন্ত ক্রিয়াটি আপনরূপটি বজায় রাখিয়া চলিবে। সীমার পারে হয় থামিয়া যাইবে নয়তো রূপটিই বদলাইবে। তারপর, ক্রিয়াটি অনুলোমে না করিয়া বিলোমে কর। Actionটি reverse করিয়া দাও। সেদিকেও একটা 'মেরু'। আবার, দুইদিকে দুই সীমানার মাঝামাঝি একটা ভূমি আছে—যেমন ম্যাগনেটের বেলা—যেখানে আসিলে ক্রিয়াটিকে অনুলোম —positive বলাও যায় না, বিলোম negative বলাও যায় না।)

প্রাতরাদিবিভেদৈশ্চ বিসর্গব্যঞ্জনস্বরৈঃ।
সন্ধিসূত্রং ত্রিধা বিদ্যুরহোরাত্রবিদো বুধাঃ ॥১৬॥

তেমনি সন্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। একটি উদয়ের বা উত্থানের সন্ধি, দ্বিতীয় উন্মেষের সন্ধি, তৃতীয় অস্তের বা অবসানের সন্ধি। শক্তিলেখ বা Dynamic Curve মাত্রেরই এটি মৌলিক রূপ। বেদে 'উষস্' এই রহস্যনামটিতে এই মৌলিকরূপ নির্দ্দিষ্ট। যথা—উ=শক্তির উত্থান; ষ=মূর্দ্ধা বা Apex; স্=দন্ত্যবৃত্তিদ্বারা অবসান। তন্মধ্যে প্রাতে উত্থানের প্রাধান্যবশতঃ 'ঊ' কারের দীর্ঘত্ব। এই উদয়, উন্মেষ ও অস্তকে আবার যথাক্রমে স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গরূপেও দেখা যাইতে পারে। যাঁরা অহোরাত্রবিদ্ জ্ঞানী তাঁরা সন্ধির এই ত্রিবিধ ভাবকেই জানিয়া থাকেন ॥১৬॥

মন্ত্রো যন্ত্রঞ্চ তন্ত্রঞ্চ শ্রদ্ধাচ্ছন্দঃ স্বরাশ্চ বৈ।
এতৎ ত্রিতয়বিজ্ঞানাৎ সেতুজ্ঞানং সমাসতঃ ॥১৭॥

সেতুর জ্ঞানকেও সংক্ষেপতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—মন্ত্রজ্ঞান,

যন্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রজ্ঞান। একটা plane বা স্তর থেকে আর একটা planeএ যাওয়ার সংযোজক হইতেছে এই সেতু। তাই ইহা Nexus Principle বা Link অথবা Lines of Approach. মন্ত্রসেতু হিসাবে প্রণবে 'উ'কারকে দেখা যাইতে পারে; ইহা 'অ'কার ও 'ম'কারের মাঝখানে থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করিয়া থাকে। তেমনি প্রণবের মাত্রার দিক দিয়া অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে এই সেতু। আবার বাকের দিক হইতে দেখিলে সেতু হইতেছে মধ্যমা। সেইরূপ যন্ত্রসেতু হিসাবে, ভূতশুদ্ধি, আপোমার্জ্জন বা আচমনাদিকে দেখা যাইতে পারে। তন্ত্রসেতুর উদাহরণ হিসাবে ন্যাসকে লওয়া যাইতে পারে। মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনকে যেমন, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, ছন্দঃ এবং স্বরকে সেতুরূপে আশ্রয় করিবে। শ্রদ্ধারূপ সেতুদ্বারা তুটি জিনিষের মধ্যে এক-ভাবতা ঘটে, ছন্দঃ সেতু ঘটায় একতানতা, আর স্বরসেতু দ্বারা হয় একবৃত্তিতা। নেমিগত যে বিরূপতা সেটি দূর কর স্বরদ্বারা; অরগত বৈষম্য দূর কর ছন্দোদ্বারা, আর, নাভি বা কেন্দ্রগত পার্থক্য দূর কর শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা। 'হ্রি' এই তিনটি বর্ণ যথাক্রমে নাভি, অর এবং নেমিকে মূলে অন্বিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। মোটকথা মন্ত্রই বলি, যন্ত্রই বলি বা তন্ত্রই বলি, সবের মধ্যেই এই সেতুটিকে বিশেষভাবে চেনা ও চিনিয়া তা'কে যথাযথ কাজে লাগান প্রয়োজন। তবেই মন্ত্রাদি ঠিক ঠিক সফল হইবে ॥১৭॥

ব্যষ্টিসমষ্টিসর্গেঽপি স্থূলে সূক্ষ্মে চ কারণে।
গৃহ্যেতে ক্রমসম্বন্ধৌ নিয়ন্তব্য-নিয়ামকৌ ॥১৮॥

পূর্ব্বে যেমন সূক্ষ্মতার একটা ক্রমানুরোধিনী ধারার কথা বলা হইয়াছে, তেমনি বিশ্বের মধ্যে আর একটি ধারার পরিচয় পাই, সেটি হইতেছে নিয়ন্তব্য ও নিয়ামকের ধারা। বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাই একটা নিয়ন্ত্রণের Principle রহিয়াছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণটি যৎকর্ত্তৃক হইতেছে তা'কে বলি নিয়ামক এবং যেটি নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হইতেছে তা'কে বলি নিয়ন্তব্য। ইহারও একটা ক্রম-পরম্পরা বা ধারা রহিয়াছে এবং সেই হিসাবে, এক সম্পর্ক বা relationএ যেটি নিয়ামক, তাহা আবার অন্য relationএ নিয়ন্তব্য হইয়া পড়ে। ধর, এই দেহযন্ত্রটি। এটির নিয়ামক দেখিতেছি প্রাণ। প্রাণই এ

যন্ত্রটিকে চালু রাখিয়াছে ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তারপর, অনুসন্ধান করিলে দেখি এই প্রাণের আবার চালক বা নিয়ামক রহিয়াছে সূক্ষ্মতর সামগ্রী, মন ইত্যাদি। এইরূপে আরো অনুসন্ধান চালাইলে আমরা নিয়ামক ও নিয়ন্তব্যের একটা সোপানপরম্পরা যেন দেখিতে পাই। শুধু স্থূলে নয়, সূক্ষ্মে এবং কারণে পর্য্যন্ত এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি—উভয় সৃষ্টির মধ্যেই আমরা এই ধারার পরিচয় পাই ॥১৮॥

(জপদিকর্ম্মে মন্ত্র-যন্ত্রাদির এই নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। একটা মন্ত্র জপিতেছি—জানা আবশ্যক কিসের কিসের অথবা কার কার দ্বারা ক্রিয়াটি 'প্রভাবিত' হইতেছে। বাইরের গবেষণায় যেমনধারা 'field picture')।

প্রত্যেকঞ্চ ত্রিধা জ্ঞেয়ং ক্রিয়াকৃতী চ দৈবতম্।
আদ্যে সূ্যন্ত্রাণি রূপাণি তন্ত্রযন্ত্রে মনুঃ পরে ॥১৯॥

বিশ্বে নিয়ম্য-নিয়ামকের যে ক্রমোন্নত শ্রেণী (ক, খ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, খ, গ এর দ্বারা, ইত্যাদি), তাতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাবে যে নিয়ম্য এবং নিয়ামকের প্রত্যেকটি তিনটি রূপ বা আকারে বর্ত্তমান। প্রথমটির, কিনা নিয়ম্যের, তিনটি রূপকে সাধারণভাবে বলা যায়—ক্রিয়া (Action), আকৃতি (Pattern) এবং দৈবত (শক্তি বা Power)। যেমন, চোখে দেখিতেছি। দেখা একটি ক্রিয়া। যে বিশেষ ইন্দ্রিয় (organ) দ্বারা যে এক "নিরূপিত" ভাবে দেখিতেছি, সেটা হইল 'আকৃতি'। আর, যে প্রাণ এবং চৈতন্য- শক্তি দ্বারা (চক্ষুরভিমানী 'আদিত্য') দেখিতেছি তাকে বলে 'দৈবত'। আবার ধর, রেডিয়াম-জাতীয় একটা বস্তুর অণু স্বভাবতঃ ফাটিয়া যাইতেছে। এখানে, বিদীর্ণ হওয়াটি ক্রিয়া ; অণুর আভ্যন্তরীণ অথবা পারিপার্শ্বিক যে বিন্যাসভঙ্গীর ফলে এটি ঘটিতেছে, সেটি হইল আকৃতি, এবং যে নিরূপিত আকারে (আল্‌ফা, বিটা, গামা রশ্মি ত্রিধারায় বিকিরণপূর্ব্বক) এটি ঘটিতেছে, তাহাও আকৃতি ; আর, যে 'রহস্য' শক্তি দ্বারা (বাহ্য তাপ চাপাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই) এটি ঘটিতেছে, তার নাম 'দৈবত'। এইরূপ সর্ব্বত্র। নিয়ম্যের যেমন তিনটি রূপ, নিয়ামকেরও তেমনি তিনটি—তন্ত্র, যন্ত্র এবং মনু (মন্ত্র)।

অর্থাৎ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে যাহা তাকে বলে তন্ত্র; আকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত যেটি করে তাকে বলে যন্ত্র। আর, দৈবত অথবা অন্তর্নিহিত শক্তিকে যেটি নিয়ন্ত্রিত করে তাকে বলে মনু বা মন্ত্র। যে কোন ক্ষেত্রে সমর্থ-ভাবে কোন কিছু করিতে গেলে, ঐ তিনটি চাই :—কর্ম্মের Correct technique ও formula; ফর্মূলাটির সফল প্রয়োগের নিমিত্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে (field), করণ (instrument অথবা means) এবং পদ্ধতির (way or method) একটা নির্দ্দিষ্ট, উপযুক্ত আকৃতি (plan and pattern); এবং শেষকালে চাই উপযুক্তভাবে ও পরিমাণে শক্তি-সমূহীকরণ (organisation of forces)। রেডিও-আইসোটোপ কোন কোন বস্তু (যথা 'হাল্‌কা' ইউরেনিয়াম) সম্পর্কে এ তিনটির যোগাযোগ (মারণ ব্যাপারে) করিতে পারিয়া আমরা বানাইয়াছি আণবিক বোমা। জপাদি-সাধনে সমর্থভূমি লাভের নিমিত্ত এই নিয়ম্য-নিয়ামক সূত্রটি বিশেষভাবে ধ্যানযোগ্য। জপ চলিতেছে, কোনও এক 'আকারে' চলিতেছে, কোনও এক 'শক্তিতে' চলিতেছে। কিন্তু সামর্থ্য ও সাফল্যের নিমিত্ত এ তিনকেই 'আপন খোস খেয়ালে' ছাড়িয়া দিলে তো চলে না। এ তিনেরি নিয়ামকগুলিকে অবশ্যই অনুকূলে পাইতে হয় ॥১৯॥

অন্তর্য্যামী তু সর্ব্বেষাং নিয়ামকোত্তমঃ শ্রুতঃ।
যোঽণ্যতে প্রাণ্যতে তস্য প্রাণস্য প্রাণ ঈশিতা ॥২০॥

নিয়ম্য-নিয়ামকের শাখা-প্রশাখার তো গহন ও অসীম বিস্তার! সেইজন্য মূলে যেখান হইতে সর্ব্ব নিয়ন্ত্রণটি হইতেছে, সেখানে আশ্রয় লওয়াই সর্ব্বোত্তম কল্প। "এষোঽন্তর্য্যামী পুরুষঃ" এই বলিয়া শ্রুতি সেই মূলনিয়ন্তার, নিয়ামকোত্তমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জপাদি সাধনের লক্ষ্য মুখ্যভাবে হইবে তাঁতেই কিসে প্রপন্ন হওয়া যায়। বিশ্বে অণু কি বিরাট্ যাহা কিছু শুধুই স্পন্দিত হইতেছে (অণ্যতে), অথবা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান-ইচ্ছা-কৃতি সহকারে স্পন্দিত হইতেছে (প্রাণ্যতে), সে সবেরই প্রভু, প্রাণেরও প্রাণ হইতেছেন তিনি ॥২০॥

নিয়ন্তব্যং পৃথক্‌জ্ঞেয়ং নান্তর্ভাবান্নিয়ামকে।
ন হি যন্ত্র্যাদিবিজ্ঞানাদ্‌ যন্ত্রাদিজ্ঞানমুহ্যতে।
সূক্ষ্মব্যোমস্থভেদাদ্ধি প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্‌ ॥২১॥

তথাপি যেটি নিয়ন্তব্য (যথা, জপাদির করণ, যন্ত্র) সেটিকে পৃথগ্‌ভাবে ভাল করিয়া জানিতে হয়, এবং জানিয়াই মূল নিয়ামকের অনুসন্ধানে যত্ন করিতে হয়। যেমন যন্ত্রীকে সাধারণভাবে জানিলেই তার যন্ত্রটিকেও জানা হয় না, তাকে আলাদা করিয়া জানিতে হয়, সেইরূপ। অবশ্য পূর্ণ সমাপত্তি জন্য যে বিজ্ঞান তাতে এই ভেদটি আর রহিবে না; তখন মূলের জ্ঞানেই কাণ্ড-শাখা-প্রশাখাদি সব কিছুরই জ্ঞান। তখন যন্ত্র-যন্ত্রীর জ্ঞান দুইটি বৃত্তের মত পরস্পরের বাহিরে থাকে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, একের মধ্যে অপরের অন্তর্ভাব কৈ দেখিতেছি না—এভাবেই অনুসন্ধানটি করিতে হয়। বিশ্ব-চক্রের নেমি এবং অরসমূহ সমস্তই এক প্রাণেই (প্রাণব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং সে প্রাণ সব কিছুর নাভিনিষ্ঠ হইয়াও আবার ব্যোমসূক্ষ্মরূপে সর্ব্বব্যাপী। অর্থাৎ, একাধারে সেটি বিন্দু এবং নাদ। এই প্রাণে না পৌছান পর্য্যন্ত যন্ত্রাদিকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণাদিপূর্ব্বক জানার প্রয়োজন আছে ॥২১॥

তত্র প্রভাবসম্ভাবৌ বিপ্রতিপূর্ব্বকৌ চ যৌ।
ভাবাবন্বাদিভাবশ্চ পঞ্চৈত আসতে ক্রমাঃ ॥২২॥

নিয়ামকের নিয়মন কর্ম্মটি পঞ্চক্রমে হইয়া থাকে। (এগুলি সবিশেষ পরে আলোচিত হইবে);—প্রভাব, সম্ভাব, বিভাব, প্রতিভাব, অনুভাব ॥২২॥

ভাস্করে চাপ্যয়স্কান্তে সুবর্ণে মকরধ্বজে।
দধ্যাদিষু চ বীজাণৌ বীণাযন্ত্র উদাহৃতাঃ ॥২৩॥

প্রভাবরূপ ক্রমটি ভাস্করের উদাহরণে বুঝিতে চেষ্টা কর। অনুভাব যে কি বস্তু তা বুঝিতে চেষ্টা কর লৌহসন্নিধানে অয়স্কান্তের (চুম্বকের) দৃষ্টান্তে। বিভাবকে বুঝ মকরধ্বজ প্রস্তুতিতে সুবর্ণের ক্রিয়ায় (catalytic action)।

সম্ভাব, বীজাণু দ্বারা দুগ্ধাদি হইতে দধ্যাদির উৎপত্তি দ্বারা; এবং প্রতিভাব বীণাযন্ত্রে অনুরণনাদি সৃষ্টি দ্বারা। Direct Action, Influence Action, Catalytic Action, Subtle Transformation Action, Resonance Action—এই পাঁচটি ॥২৩॥

[ব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপান্তরে অভিব্যক্ত, প্রতিস্পন্দে উপচিত ব্যক্ত।]

অধিভূতং তথাধ্যাত্ম মধিযজ্ঞঞ্চ দৈবতম্।
অধ্যক্ষরং নিয়ন্তৄণাং পঞ্চাধিকৃত্য কর্ত্তৃতাঃ ॥২৩ক॥

ক্রিয়ার দিক্ থেকে যেমন পাঁচটি, "অধিকৃত্য কর্ত্তৃতা", কিনা, সেই সেই অধিকারে (Frame of Reference, Situation) কর্ত্তৃতা হিসাবেও নিয়ন্তাকে পঞ্চভাবে দেখিবে। (এগুলি বিশেষভাবে পরে আলোচিত):— অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদেব, অধ্যক্ষর। অর্থাৎ, ক্রিয়ার আধার এবং সেই সেই আধারে কর্ত্তৃত্ব (Agency)—এই পাঁচ প্রকারের ॥২৩ ক॥

প্রণবে পঞ্চমাত্রা যা স্তাভিঃ সর্ব্বং নিয়ম্যতে।
পরত্বাচ্চ নিয়ন্তৄণা মোঙ্কারঃ প্রাণ এব চ ॥২৪॥

জপাদিকর্ম্মের মূলে যে প্রণব, তার পাঁচটি মাত্রাতেই সর্ব্ব দ্রব্য, সর্ব্বগুণ এবং সর্ব্ব কর্ম্ম-নিয়মিত হইতেছে জান। ব্রহ্মবাচক ওঁঙ্কার সকল নিয়ন্তার শ্রেষ্ঠ বিধায় ওঁঙ্কারই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ। সুতরাং ওঁঙ্কার (অথবা ঈশ্বরের নাম) আশ্রয় পূর্ব্বক জপ করিলে সর্ব্বনিয়ামক যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁকেই আশ্রয় করা হইল ॥২৪॥

জপাদাবনুসন্ধেয়া পঞ্চৈতে চ নিয়ামকাঃ।
মন্ত্রো গুরুশ্চ দেবশ্চ ক্ষেত্রী ছন্দঃ সমূহতঃ।
গুরোর্যানুগ্রহাখ্যা চা-গ্রহাখ্যা ক্ষেত্রিণো ধৃতিঃ ॥২৫॥

বিশেষভাবে অর্থাৎ, ঈশ্বরনামের সহযোগিভাবে বিশিষ্ট মন্ত্র, গুরু, দেবতা, জীব (ভগবানের পরাপ্রকৃতি) এবং ছন্দঃ (মধুচ্ছন্দঃ ইত্যাদি)—এই পাঁচটিকে

কর্ম্মের নিয়ামকরূপে জানিবে। এ পাঁচটির মধ্যে গুরুশক্তির আশ্রয়ে ভগবানের অনুগ্রহাখ্যা ধারা, এবং জীবপ্রকৃতির ভিতর হইতে আগ্রহাখ্যাধারা (Inspiration and Aspiration) নিঃসৃত হইয়া পরস্পরে মিলিত হয়। এই মিলনের দ্বারাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধটি "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগ" হইয়া থাকে ॥২৫॥

সঙ্কুচৎ প্রসরদ্রূপা তার্তীয়া বিশ্ববৃত্তিতা।
নাদবিন্দূ যতঃ কাষ্ঠেঽদিধিষতি কলা চ যা ॥২৬॥

পূর্ব্বে আমরা বিশ্বের মধ্যে দুটি বৃত্তির বা principleএর পরিচয় পাইয়াছি, একটি হইল সূক্ষ্মতার তারতম্যের ধারা এবং তার চরম সীমায় ব্যোমরূপ ব্রহ্ম, এবং দ্বিতীয়, নিয়ন্তব্য-নিয়ামকের ধারা এবং তার চরম সীমায় অন্তর্য্যামিরূপ ব্রহ্ম। এখন, বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় আর একটি বৃত্তির কথা বলা হইতেছে—এটি হইল সঙ্কোচ-প্রসারের ধারা। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটি একদিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়াছে, আবার অপর দিকে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এ দুইয়ের সীমা কোথায়? ধর, একটা মৃৎপিণ্ড; তাকে চূর্ণ করিলাম, তাহা কতগুলি ধূলিরেণুতে পরিণত হইল। সেই রেণুগুলিকেও ভাঙিতে ভাঙিতে যদি চলি, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এক সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক শক্তিতে, electronএ গিয়া পৌছিব। কিন্তু সেখানেই কি সঙ্কোচের শেষ? তেমনি বিস্তারের বেলাতেও অনুরূপ প্রশ্ন আসে। এ দুই ধারার কাষ্ঠা কোথায়? সঙ্কোচ হইতে হইতে বা প্রসার হইতে হইতে কি কোনো ভূমিতে বিশ্রাম আছে? যদি না থাকে, তাহা হইলে তো অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। তাছাড়া, শ্রুতি এবং অনুভূতি এ দুই-ই একটা বিশ্রান্তি স্থানের নির্দ্দেশ দেয়। সুতরাং নিশ্চয়ই এ দুই ধারার বিশ্রান্তিস্থল কোথাও আছে। সে দুইটি হইতেছে—নাদ ও বিন্দু। বিস্তার বা Expansionএর পরম ভূমি হইল নাদ এবং সঙ্কোচ বা Condensationএর চরম ভূমি হইল বিন্দু। আর এই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছে কলা—যাহা কেবলি ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছে অর্থাৎ infinite, সকল সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে চাহিতেছে। নাদ-বিন্দুর মধ্যে একটি রহস্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটীর দরুণই কলার

অভিব্যক্তি। রহস্যটি হইতেছে এই যে যেই কোনো বস্তু তা'র সঙ্কোচের চরম সীমায় বা বিন্দুতে গিয়া পৌছিতে চাহিতেছে, অমনি তাহার মধ্যে আবার বিপরীতক্রমে বিস্তার লাভ করিবার একটা প্রচেষ্টাও জাগিতেছে; পক্ষান্তরে, প্রসারের বা বিস্তারের চরম কাষ্ঠায় গিয়া পৌছানর প্রয়াসের মধ্যে আবার সংকুচিত হইবার প্রেরণাও জাগিতেছে। নাদাভিমুখী প্রয়াসকে যদি 'ধনী' (=ধ) বলা যায়, এবং বিন্দু-অভিমুখীকে যদি বলা যায় 'ঋণী' (=ঋ), তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সৃষ্টির সঙ্কোচ-বিকাশ সকল ব্যাপারেই এ দুয়ের (ধ, ঋ) সহ-অনুপাতটি রহিয়াছে। অর্থাৎ, এদের অনুপাতমানের উপরেই নির্ভর করে কে কতটা সঙ্কুচিত অথবা বিস্তারিত। যেটি সঙ্কোচপ্রাপ্ত সেটি বিস্তারের পানে অগ্রসর হইলে ক্রিয়াটির যে রূপ হয় তাকে বলে 'ঋধ্' (ঋধ্যতি)। আর, ঐ ক্রিয়াটির বৈপরীত্য (reversing) হইলে হয়—'ধৃ' (ধৃত হইতেছে) gathered and massed হইতেছে, ইহা বুঝায়। ঋধ্ থেকে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি; আর, ধৃ থেকে ধর্ম্ম (conservation)। একটা যোগ, অপরটি ক্ষেম। যেমন জপে প্রথমটির প্রাধান্য হইলে জপস্পন্দ আপনাকে বিস্তারিত করিয়া এক মহান্ বিশ্বজপরূপে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে; আর দ্বিতীয়টির প্রাধান্যে আপনাকে সূক্ষ্মতর মহাশক্তি-কেন্দ্র (Nucleus) রূপে আবিষ্কার করে। একটা Expansive Aspect, অপরটা Intensive, Concentrated Aspect. জড়ের ক্ষেত্রে যেমন Cosmic Rays এবং Nuclear Energy।

একবার সঙ্কোচের চরম সীমায় পৌছিয়া অথবা তার দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করা, আবার প্রসারের চরম সীমায় পৌছিয়া অথবা তার পানে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হওয়া—এই "দোলাটি" বিশ্বে অবিরাম চলিয়াছে। চন্দ্রকলা যেমন প্রসারের চরম সীমায় পূর্ণিমায় পৌছিলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সঙ্কোচের দিকে গতি আরম্ভ হইয়া যায়, এবং সেই গতি বাড়িতে বাড়িতে সঙ্কোচের চরম সীমায় অমাবস্যায় পৌছিলে আবার বিপরীত বিস্তারমুখী গতি সুরু হয়। সুতরাং নাদ ও বিন্দুর এই যে মিথুনীভাবেচ্ছা এবং পরস্পরাভিমুখী গতি—তাহার দ্বারাই কলার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। নাদবিন্দুর পরস্পর মিথুনীভাবেচ্ছার অভিব্যক্তি কামকলা। পরমরাহস্যিক "যোনিলিঙ্গ" ইহার প্রতীক। এতৎপ্রসঙ্গে 'ক্লীঁ' এই বীজটি পরে পরীক্ষিত হইবে। কলা হইতেছে একটা aspect বা partial element, সুতরাং

পূর্ণ নয়। তাই সে কেবলি ঋধ্যমান, বৃদ্ধি পাইতে চায়, পূর্ণ হইতে চায়। কলার এই বৃদ্ধি কিন্তু আবার দুইদিকে—সঙ্কোচের দিকে ও প্রসারের দিকে, negative ও positive ভাবে, minus ও plus রূপে। কৃষ্ণপক্ষে সঙ্কোচমুখে কলার বৃদ্ধি, শুক্লপক্ষে বিকাশমুখে কলার বৃদ্ধি ॥২৬॥

কলানামৃধ্যমানানাং মাত্রা যা জ্যায়সী স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রেতি জানীয়াদ্ সানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥২৭॥

কলার যে ঋধ্যমান বা ক্রমবর্দ্ধমান ধারা, তা'র যেখানে পরাকাষ্ঠা সেইটিকে (বিশেষভাবে) অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া জানিবে; তাহা বিশেষরূপে অনুচ্চার্য্যা। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচ ও প্রসার এই উভয় দিকেই বা উভয়মুখেই কলার বৃদ্ধির যেখানে পরিসমাপ্তি—সেই অবধি অর্দ্ধমাত্রার ব্যাপ্তি। সুতরাং উভয় ধারার সমষ্টিতে—অর্দ্ধমাত্রা। একদিকে Culminating point, শেষ সীমা—নাদ, অপরদিকে বিন্দু—এই দুইটি সীমাকে দুটি পক্ষের মত বিস্তারিত করিয়া অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা ॥২৭॥

(পূর্ব্বে পৃঃ ১৩২তে অর্দ্ধমাত্রা বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হইবে। ধর, মাত্রা = উর্ম্মিমান (Wave length)। এর ঋধ্যমানতা (progression) দুইদিকে হয়—এক বিস্তারের দিকে (যেমন, long waves), আর এক সঙ্কোচের দিকে (যথা, short waves)। দুই দিকে দুই কাষ্ঠা (Limit) আছে। মধ্যে কতিপয় গ্রামে এই ধারাটি হয় ব্যক্তকলা, "উচ্চার্য্যা" বিশেষতঃ। দুইদিকে দুই কাষ্ঠাসহ ধারার এই সমগ্র আকৃতি ও আবেগকে বলে অর্দ্ধমাত্রা।)

অগ্নীষোমীয়তাং চাস্যাঃ সাক্ষাত্ত্বেন প্রকল্পয়।
অগ্নীষোমাবুভৌ মুখ্যে প্রাণে স্ত আজ্যকল্পিতৌ ॥২৮॥

অর্দ্ধমাত্রার এই দুইটি পক্ষকে আবার অগ্নি ও সোমরূপে কল্পনা কর—নাদকে অগ্নিরূপে এবং বিন্দুকে সোমরূপে। যে কোনো বস্তুর সঙ্কোচ এবং ঘনীভাব করিতে করিতে চরমে গিয়া Essence রূপে, Nuclear Substance রূপে পাই সোমকে—যে-অমৃতবিন্দুর মধ্যে সমগ্র অভিব্যক্তি বা বিকাশের সম্ভাবনাটি

বিধৃত রহিয়াছে। আবার বিস্তারের শেষে গিয়া বিশ্বব্যাপী Field Energy বা শক্তিরূপে (অবশ্য কেবল জড় শক্তি নয়) পাই অগ্নিকে—যিনি নাদরূপে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত। আবার এই উভয়ই মুখ্যপ্রাণে আজ্যরূপে, আহুতিরূপে কল্পিত। অর্থাৎ এই নাদ এবং বিন্দু, বিস্তার এবং সঙ্কোচ—এই উভয়েরই উত্থান এবং অবসান হয় গিয়া মুখ্যপ্রাণে, প্রাণব্রহ্মে। এই সঙ্কোচ-বিকাশ মুখ্যপ্রাণেরই দু'টি মুখ্যকলা, phase মাত্র। সুতরাং ইহাদের তাহাতেই আহুতি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই কৃতার্থতা ॥২৮॥

(জপে মুখ্যপ্রাণ অথবা প্রাণব্রহ্মে আহুতি কর্ম্মটি অত্যাবশ্যকীয়। আগ্নেয়মাত্রার আধিক্যবশতঃ চঞ্চলতা ইত্যাদি রজের লক্ষণগুলি দেখা দিলেও বটে, আবার সৌমীয় মাত্রার আধিক্যে "শীতাড়ষ্টতা", "মত্ততা" ইত্যাদি তামস লক্ষণগুলি দেখা দিলেও বটে।)

হ্লাদ্যহ্লাদকধারায়া আরসতমবাহিতা।
ধার্য্যধারকধারায়াঃ শেষোঽদিতৌ চ দৃশ্যতাম্ ॥২৯॥

যেমন সঙ্কোচ-প্রসারের ধারার শেষ হইল মুখ্যপ্রাণে—তেমনি আবার হ্লাদ্য-হ্লাদক ধারার শেষ সীমা বা কাষ্ঠা হইতেছে—রসতম। সেখানে না পৌছান পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা নাই, তৃপ্তি নাই। তাই আনন্দের অনুসন্ধানও ততদিন নিরন্তর চলিবে। আর, ধার্য্য-ধারক ধারা, container & containedএর যে ধারা—তার limit বা সীমা হইতেছেন—অদিতি। তাই অদিতিকেই দ্যৌ, অদিতিকেই অন্তরিক্ষ, অদিতিকেই মাতা, পিতা ও পুত্র বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন ॥২৯॥

পঞ্চ বা সপ্ত বা তিস্রো ধারা একত উৎসৃতাঃ।
তদেকং বিদ্ধি বৈ ব্রহ্ম ব্যোমপ্রাণদ্যুপাধিকম্ ॥৩০॥

আমরা এখানে বিশ্বের কয়েকটি ধারার আলোচনা করিলাম। ধারা তিনই হোক্ বা পাঁচই হোক্ বা সাতই হোক্—মূলে তাহারা এক কেন্দ্র হইতেই নির্গত বা নিঃসৃত হইয়াছে। সেই এক কেন্দ্র বা মূল হইতেছেন ব্রহ্ম—

যিনি ব্যোম, প্রাণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে প্রকাশ পাইতেছেন। গীতাও ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী' ॥৩০॥

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং গতা বিশিষ্যমাণতা।
হানোপাদানরাহিত্যে তচ্চ ব্রহ্ম পরং স্থিতম্ ॥৩১॥

ব্রহ্মকে লাভ করিবার বা ব্রহ্মতত্ত্বকে অধিগত করিবার বেদান্ত-প্রসিদ্ধ রীতি বা method টি হইতেছে—অধ্যারোপ ও অপবাদ। সমস্ত বস্তুকে প্রথমে ব্রহ্মে আরোপিত করিয়া ব্রহ্মকে সেই সেই উপাধি দ্বারা যুক্ত করিয়া দেখার ধারা হইল অধ্যারোপ। পরে আবার এই সমস্ত উপাধিকে একে একে অপবাদ করিয়া, negate করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্ব উপাধিনির্ম্মুক্ত করিয়া দেখার ধারা হইল অপবাদ। প্রথমটি অন্বয়মুখে, ইতিরূপে, দ্বিতীয়টি ব্যতিরেকমুখে, নেতিরূপে। এই উভয় ধারা বা method এর সহ-প্রয়োগেই combined application এর দ্বারাই সমস্ত বিশিষ্যমাণতা বা বিশিষ্ট উপাধিকৃত ভাব দূর হইয়া ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পান। এই দুই উপায়-প্রয়োগে কিন্তু ব্রহ্মের কোনো হান বা উপাদান ঘটেনা, অর্থাৎ অধ্যারোপের দ্বারা তাঁতে নূতন কিছু যুক্তও হয় না, added হয় না এবং অপবাদের দ্বারা তাঁহা হইতে কিছু বিযুক্ত ও হয় না, subtracted হয় না। তাঁর ক্ষতি বৃদ্ধি ইহাতে কিছুই নাই, কারণ তাঁহাতে add বা subtract করার, যোগ বা বিয়োগ করার কিছুই নাই। তিনি হান-উপাদানশূন্য পরম ব্রহ্ম ॥৩১॥

সর্ব্বসাহিত্যরাহিত্য-সমেতা জ্ঞানপূর্ণতা ॥৩২॥

ব্রহ্মে যেমন হান-উপাদান কিছুই নাই, তিনি স্বয়ং পূর্ণ; স্বতঃ নিত্যপূর্ণ, জ্ঞানের বেলায় কিন্তু সেরূপ নয়। জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে তখনই, যখন সে সাহিত্য ও রাহিত্য এই উভয়ের দ্বারা সমেত বা যুক্ত হয়। অর্থাৎ, জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রথম সর্ব্ব-উপাধি-সহিত বা উপাধি-সহযোগে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, আবার সর্ব্ব-উপাধি-রহিত বা উপাধি-নির্ম্মুক্ত ভাবেও জানিতে হইবে। নতুবা জ্ঞানের ত্রুটি থাকিয়া যাইবে, একদেশী দর্শন হইয়া যাইবে, integral vision পূর্ণাঙ্গ দর্শন হইবেনা, 'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'কে জানা

হইবে না। তাই জ্ঞানের পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য এই অন্বয় ও ব্যতিরেক, সাহিত্য ও রাহিত্য—উভয় মুখেই ব্রহ্মানুসন্ধান চালাইতে হইবে ॥৩২॥

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ বুদ্ধিঃ সর্ব্বাবভাসিকা।
মহৎ সূক্ষ্মং পরং যাত্যতঃ স্থিতিস্থাপিকোত্তমা।
তচ্ছুদ্ধিশেষমাপন্নঃ স্বতো বেত্তি হ্যশেষতঃ ॥৩৩॥

এখন প্রশ্ন আসে :—এই যে পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলা হইল, সেই পূর্ণ জ্ঞানে যাই কি প্রকারে? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে—বুদ্ধিতে শরণ নাও। কেননা, বুদ্ধিই সর্ব্বাবভাসিকা, সব কিছুর প্রকাশ করিয়া দেয়। সে একদিকে যেমন পরম সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে পারে, তেমনি আবার পরম মহতেও অনায়াসে নিজেকে বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং perfectly elastic যদি কিছু থাকে তো সে বুদ্ধি, তাই সে স্থিতিস্থাপিকোত্তমা। তা'কে যেরূপ ইচ্ছা mould করা যায়, পরম সূক্ষ্ম বা পরম ব্যাপক যেরূপ ইচ্ছা রূপ লওয়ান যায়। ইহাই অর্থাৎ এই বুদ্ধিই মানুষের বিশেষ সম্পদ্। এই একটি কারণই তা'কে অন্য প্রাণিবর্গ হইতে পৃথক্ করিয়াছে এবং ইহার সম্যক্ অনুশীলনে সে বিশ্বের সমস্ত রহস্য অবগত হইতে পারে এবং পরিশেষে, বিশ্বনাথকেও ধরিতে পারে। আমরা আজ বিজ্ঞানের যা' কিছু চমৎকার দেখিতেছি, সে সবই এই বুদ্ধিরই আবিষ্কার, বুদ্ধিরই বিকাশের ফল। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে কোনো তত্ত্বই যে প্রতিভাত হয়না—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়—আমাদের বুদ্ধির অশুদ্ধি। দর্পণ যেমন আবর্জ্জনায় মলিন হইলে তাহাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়না, তেমনি অশুদ্ধিতে ভরা যে বুদ্ধি, তাহাতে কোনো তত্ত্বেরই উন্মীলন হয়না। দর্পণ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, বুদ্ধিও তেমনি স্বরূপতঃ প্রকাশরূপই, কেবল আগন্তুক মালিন্য বশতঃ তা'র প্রকাশময়তা যেন তিরোহিত হইয়াছে মাত্র। তাই পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে—'প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বম্'। এই মালিন্য বা অশুদ্ধি ক্রমশঃ দূর হইয়া যখন শুদ্ধির শেষ সীমায় গিয়া বুদ্ধি পরম নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়া পায়, তখন সমস্ত তত্ত্ব স্বতঃই তা'তে অশেষরূপে স্ফুরিত হয় বা প্রকাশ পায়। তখন যেন জানিবার জন্য আর প্রয়াসও করিতে হয় না। সেইজন্য সর্ব্বপ্রয়াসে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা ও তা'র শরণ লওয়া প্রয়োজন ॥৩৩॥

হিমাদ্রিতনুনির্ম্মাতাঽশ্মরেণূন্ কোঽপি চায়য়েৎ।
শিশিরশীকরৈঃ কো বা প্রপূরয়েন্ মহাম্বুধিম্ ॥৩৪॥

শঙ্কা জাগিতে পারে:—বহির্বিজ্ঞান বা scienceও তো এইরূপে বুদ্ধিতে শরণ লইয়া তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, তবে কি বিজ্ঞানের পথই অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে? তাহাতেই কি পরমার্থও লাভ হইবে? না, বিজ্ঞানের পথে পরম তত্ত্ব কোনোদিন মিলিবেনা। কারণ, বিজ্ঞান চলিয়াছে খণ্ডের পথে, অল্পের পথে, আর আর্ষজ্ঞান চলিয়াছে অখণ্ডের পথে, ভূমার পথে। বিজ্ঞান কেবল বলিতেছে—বাইরের এটা জানো, ওটা জানো, বিশ্লেষণ করিয়া চল; কিন্তু এরূপ জুড়িয়া জুড়িয়া কখনো পরম জ্ঞান লাভ হয়না, খণ্ডের সমষ্টিতে অখণ্ড মিলেনা। প্রস্তরের রেণু সঞ্চয় করিয়া কে হিমালয়ের বিরাট্ বপু তৈয়ারী করিবে? শিশিরকণা সংগ্রহ করিয়া কে-ই বা মহোদধিকে প্রপূরিত করিতে যাইবে? এগুলি যেমন বাতুলের প্রচেষ্টা, তেমনি খণ্ড জুড়িয়া অখণ্ড জ্ঞান লাভের প্রয়াসও একান্ত উপহাসাস্পদ। সেইজন্য প্রজ্ঞানের অপেক্ষায় বিজ্ঞানের এই অপরিহার্য্য ক্রুটি, কারণ তা'র methodই inadequate অনুসন্ধান-রীতিই সদোষ ও অসম্পূর্ণ॥৩৪॥

বিশারদাদিভির্ল্লিঙ্গৈঃ কৃৎস্নেষু ক্রমতে চ ধীঃ।
সমাবৃত্তাবিয়াৎ পারং স্বামতীত্য স্বতঃ পরম্ ॥৩৫॥

তাহা হইলে কোন্ উপায় অনুসরণ করা কর্ত্তব্য? বুদ্ধির মার্জ্জনের পথই আশ্রয়ণীয়। বুদ্ধিরই যে সব বিশারদ, প্রাতিভ, ঋতম্ভরা প্রভৃতি স্তর বা ভূমিগুলি রহিয়াছে, সেগুলিকে ক্রমশঃ বিকশিত করা, ফুটাইয়া তোলা প্রয়োজন। এইরূপে বুদ্ধি অর্থাৎ যে করণ দ্বারা সব কিছু জানিতেছি, তাহা বিশুদ্ধ'ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, প্রজ্ঞার সপ্তধা প্রান্তভূমি ফুটিয়া উঠিলে, অনায়াসে কৃৎস্নবিদ হওয়া যায়, সমস্ত বস্তুতে বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সমাবৃত্তিতে গিয়া পৌছিলে জানিবার চরম সীমায় অর্থাৎ জ্ঞানের পরম ভূমিতে পৌছান যায়। সেখানে আর বিশ্বের কোনো কিছু জানিতে বাকী থাকেনা। পরিশেষে, সমাবৃত্তিরও পারে যাইতে পারিলে সেই বিশ্বাতীত নিরঞ্জন, 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' কে জানা যায়। সুতরাং বুদ্ধিকে পর্ব্বে পর্ব্বে

ফুটাইয়া তুলিয়া তা'র চরম বিকাশে পৌছান এবং পরিশেষে, তা'কেও অতিক্রম করা—ইহাই যথার্থ জ্ঞানলাভের পথ ॥৩৪॥

অধ্যারোপাপবাদৌ ত্বয়ি নিগময়তঃ শুদ্ধনৈর্গুণ্যমাত্রং
জন্মাদ্যস্যাদিলিঙ্গৈস্ত্বয়ি চ নিবিশতে জ্ঞানশক্ত্যাদিকাং স্ম্যম্।
সিদ্ধঃ সন্ধানশেষাৎ ত্বয়ি চ মধুরিমা প্রেম্ন আত্যন্তিকোঽপি
কুর্য্যা গোবিন্দনাথাচ্যুতচরণদৃশো নো ধিয়স্ত্বাং প্রপন্নাঃ ॥৩৬॥

উপসংহারে, একটি প্রার্থনা দ্বারা বক্তব্য শেষ করা যাইতেছে। হে ভগবন্! বেদান্তবিচারের যে প্রসিদ্ধ রীতি—অধ্যারোপ ও অপবাদ, তাহা তোমার শুদ্ধ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ রূপকে প্রতিপাদন করিতেছে। তা' করুক্। আবার ব্রহ্মসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ', 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্', 'রচনানুপপত্তের্নানুমানম্' ইত্যাদি নানারূপ লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, জ্ঞানশক্ত্যাদির সমগ্রত্ব ও পরিপূর্ণত্ব দেখাইয়া তুমি যে অশেষকল্যাণগুণাকর ঈশ্বর—তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার সগুণরূপ দেখান হইয়াছে। তা' হোক্। আবার পরম প্রিয়তম বা মধুমত্তমের সন্ধানের অবসানরূপে তোমাতেই নিরতিশয় বা আত্যন্তিক মধুরিমাও সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ শ্রুতিতে 'মধু'র সন্ধানে তোমাকেই চরম মধুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ' ইত্যাদি বলিয়া প্রেষ্ঠতা বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তা তোমাতেই দেখান হইয়াছে। তা'ও হোক্—অর্থাৎ এ সবই তোমার নির্গুণ সগুণ বা আনন্দ রূপ—প্রতিপাদিত হউক, কিন্তু তথাপি হে গোবিন্দ! হে নাথ! তোমাতেই একান্ত প্রপত্তিযোগে সমর্পিত আমাদের বুদ্ধিকে তোমার অচ্যুত চরণ অর্থাৎ অক্ষয়, অব্যয় যে পরম পদ তা'তেই অনাকুল দৃষ্টিযুক্ত কর। তুমি নিজেই বলিয়াছ—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'; তাই তোমার নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ, রসতম প্রভৃতি রূপ শ্রুতি, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও তোমাতে একান্ত প্রপত্তিযোগ ভিন্ন, শরণাগতি ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং,' তোমার সেই পরম পদ অনুভবে আসেনা, সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়না। অতএব তুমিই আমাদের করুণা করিয়া সেই পরম পদের অনুভবভাগী কর ॥৩৬॥

জপসূত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

॥ প্রথমঃ পাদঃ ॥

১। অথ জপসূত্রম্ ॥

জন্মাদ্যস্য যতো জেন পেন চ প্রণবঃ পরঃ।
তজ্জলানীত্যুপাসীত জপাক্ষরক্রমাদিতি ॥১॥
যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যপি পেন গৃহ্যতে।
ভক্ত্যা যয়া হি জায়েত জ্ঞানং জনিনিবর্ত্তকম্ ॥২॥

১। অতঃপর জপসূত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

'জপ' এই শব্দে 'জ'কার ও 'প'কার, এই দুইটি অক্ষর রহিয়াছে। এই দুইটি অক্ষরের যেটি তাৎপর্য্য তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বভুবনের জন্মাদি যেথান হইতে হইয়াছে, সেই মূল বীজটিকে 'জ'-এই অক্ষরের দ্বারা জানিতে হইবে, এবং 'প'-এই অক্ষরের দ্বারা পরাবাক্‌রূপ যে প্রণব, তাহাকে জানিতে হইবে। এই প্রণবই জগতে জন্মাদির বীজ। সুতরাং 'জপ'-এই শব্দের দ্বারা প্রণবই লক্ষিত হইতেছে। তারপর শ্রুতি যে বলিয়াছেন— 'তজ্জলানীত্যুপাসীত'—অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকল কিছু জাত হইতেছে এবং তাহাতেই সকল কিছু লীন হইতেছে, অতএব একমাত্র তাঁহাকেই উপাসনা-যোগে আশ্রয় কর—এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যে 'জ' ও 'প'-এই দুইটি অক্ষর পূর্ব্বাপরক্রমে লইলে 'জপ'-এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং নিখিলের যিনি আশ্রয়, উপাসনাযোগে তাঁকেই আশ্রয় কর, 'জপ' শব্দের এই তাৎপর্য্যটি আমরা পাইতেছি ॥১॥

শ্রুতি আবারও বলিয়াছেন—'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' ইত্যাদি। এই বাক্যের মধ্যে 'প'-এই অক্ষরটি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই 'পরাভক্তি'র দ্বারা জন্মমৃত্যুনিবর্ত্তক যে জ্ঞান, সেটি জাত হইয়া থাকে। সুতরাং 'জ'-এই

অক্ষরটিকেও আমরা প্রসঙ্গক্রমে পাইতেছি। এ ভাবেও 'জপ'-এই শব্দটিকে বুঝিতে হইবে ॥২॥

২। জপোঽভ্যারোহবিশেষঃ ॥

অসতো মেতি মন্ত্রেণ যোঽভ্যারোহ ইষ্যতে।
ব্যাবৃত্য হি পরাগ্‌বৃত্তীঃ প্রত্যগ্‌বৃত্ত্যা স বৈ জপঃ ॥৩॥

২। অভ্যারোহবিশেষকে জপ বলে ॥

'আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া চল এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল'—অন্তরাত্মার আবেগপ্রসূত এই যে প্রার্থনা এবং প্রার্থনার মন্ত্র, সেইটিকে 'অভ্যারোহ' বলে। 'অভ্যারোহ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—'অভি', কিনা, অভিমুখী, 'আরোহ', কিনা, আরোহণ। সুতরাং 'অভ্যারোহ' শব্দটির মানে—Ascent of the Spirit, চেতনার আরোহণ। কোথা হইতে Ascent বা আরোহণ? আপন কল্পিত, অসত্য, তমঃ এবং মৃত্যুর বন্ধন হইতে। এই অভ্যারোহটি সংঘটিত হইবে কি প্রকারে? যে-বৃত্তি, আমাদিগকে 'সত্য', 'জ্যোতি' এবং 'আনন্দ' হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখে, সেটিকে বলে 'পরাগ্'বৃত্তি; এবং যে-বৃত্তি আমাদিগকে তাহার অভিমুখীন করিয়া দেয়, সেটিকে বলে 'প্রত্যগ'বৃত্তি। এখন পরাগ্‌বৃত্তিকে নিবারিত করিয়া যেটি প্রত্যগ্‌বৃত্তি প্রবাহিত করিয়া দেয়, তাহার নাম 'জপ' ॥৩॥

৩। 'ব্যাবৃত্তেঃ সমাবৃত্তিরূপঃ ॥'

ঋতং সত্যং মধুচ্ছন্দো হিত্বা বি র্ব্যাজবৃত্তিতা।
নির্ব্যাজা সা চ নির্ব্যূঢ়া হ্‌ ব্যাভিসম্পদ্যতে যয়া ॥৪॥

৩। ব্যাবৃত্তি হইতে সমাবৃত্তি যদ্দ্বারা হয়, তাহাই জপ ॥

ঋতচ্ছন্দঃ, সত্যচ্ছন্দঃ, এবং মধুচ্ছন্দঃ হইতে যে ভ্রংশ বা চ্যুতি, তাহাকে ব্যাজবৃত্তিতা বলে। সপ্তম সূত্রে এই ব্যাজের লক্ষণ দেওয়া হইবে; এক কথায়, ইহা হইল ছন্দচ্যুতিনিমিত্ত বক্রতা বা বিষমতা (Unharmony Curvature)। এই বক্রতার ফলে ঋত হইতে অনৃতে, সত্য হইতে অসত্যে এবং মধু বা

আনন্দ হইতে বিষ বা নিরানন্দে বৃত্তি হইয়া থাকে। এইটি হইল ব্যাবৃত্তি। সমাবৃত্তির রূপটি আমরা উপোদ্‌ঘাতে বিশেষভাবে দেখিয়াছি। সমাবৃত্তিতে ব্যাজ অথবা বক্রতা-বিষমতা বিদূরিত হয়, এবং সেটি নির্ব্ব্যূঢ়, কিনা, সর্ব্বথা সংশয়বিহীন হইয়া থাকে। সুতরাং অবক্রতা, অবিষমতা এবং অসন্দিগ্ধতা হইতেছে সমাবৃত্তির রূপ। শ্রুতি যে অভিসম্পন্নতার কথা বলিয়াছেন, সমাবৃত্তির দ্বারা স্বরূপের সঙ্গে সেইপ্রকার অভিসম্পন্ন হইয়া যাইতে পারা যায়। আত্মস্বরূপই হইতেছে পরম সম্পাদ্‌; এই পরম সম্পদের অভিতঃ, কিনা, অভিমুখে ("towards") ঋজু, সুষম, নিঃসংশয় যে গতি, তাহাকে সমাবৃত্তি বলে। ঋত, সত্য এবং মধু—এই ত্রিবিধ ছন্দের আশ্রয়ে এই যাত্রা সফল হইতে পারে। লক্ষ্যে সফল গতি হইল সমাবৃত্তি, এবং লক্ষ্যে বিফল, ব্যর্থ গতি অথবা বিপরীত গতি ("away from") হইল ব্যাবৃত্তি। এবংবিধ সমাবৃত্তিরূপই হইল জপ ॥৪॥ (কারিকায় 'বি' এবং 'অব্যা' লক্ষ্য কর।)

৪। বাধাবিরহবৃত্তিত্বমৃতত্বম্‌ ॥

দেশজন্যা কালজন্যা ছন্দোজন্যা চ বস্তুজা।
বাধা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়াঽবরোধপ্রতিরোধনে ॥৫॥
বিরোধশ্চ নিরোধশ্চ পণিরহ্যাদয়ঃ শ্রুতৌ।
এভ্যো মুক্তামৃতিং বিদ্যাদেভির্যুক্তাঞ্চ নির্ঋতিম্‌ ॥৬॥

৪। বাধাবিহীন যে বৃত্তি, সেইটি ঋত ॥ (The Real as Movement)

দেশনিমিত্ত, কালনিমিত্ত, ছন্দোনিমিত্ত এবং বস্তুনিমিত্ত এই—চতুর্ব্বিধ বাধা আছে জানিবে। ইহাদিগকে যথাক্রমে অবরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ ও নিরোধ বলে। ঋগ্বেদাদিতে বৃত্র, পণিঃ, অহি ইত্যাদি উপাখ্যানে বিশ্বসৃষ্টিতে দেশাদিজন্য এই চতুর্ব্বিধ বাধাই উপলক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। উপাখ্যানগুলি প্রণিধান করিলে প্রতীয়মান হইবে কোন্‌ কোন্‌ বাধা কোন্‌ কোন্‌ আকারে শ্রুতি আমাদের প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল বাধা হইতে

যেটি মুক্ত, তা'র নাম ঋতি, এবং ইহাদের সঙ্গে যেটি যুক্ত, সেটির নাম নির্ঋতি ॥৫-৬॥

৫। বাধবিরহবৃত্তিত্বং সত্যত্বম্ ॥

বিকারশ্চ বিবর্ত্তশ্চ পরিবর্ত্তশ্চ নাস্তিতা।
সদসদ্ভাব ইত্যেবমন্যথাভাবপঞ্চকম্ ॥৭॥
অবচ্ছেদপরিচ্ছেদৌ বিচ্ছেদশ্চ ততঃ পুনঃ।
উচ্ছেদশ্চ প্রতিচ্ছেদ ইতি বাধেঽপি পঞ্চধা ॥৮॥
বিকারাদ্যন্যথাভাবা বিচ্ছেদাদিনিমিত্তকাঃ।
তেষামপ্রতিযোগিত্বং সত্যত্বেন ব্যবস্থিতম্ ॥৯॥

৫। বাধবিরহ যে বৃত্তি, তাহাকে বলে সত্য ॥ (The Real as Ground or as Persistence)

কোনো বস্তুর স্বরূপের অন্যথাভাব পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে; বিকার, বিবর্ত্ত, পরিবর্ত্ত, নাস্তিতা এবং সদসদ্ভাব। বস্তুর অন্যথাভাবরূপ যে বাধ হইয়া থাকে, সে বাধটিকে পাঁচপ্রকার বলিয়া জানিবে: অবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ, উচ্ছেদ এবং প্রতিচ্ছেদ। এইগুলি যথাস্থানে বিবৃত হইবে (যথা, ৩।১।১৯)। অগ্রে যে বিকারাদি পাঁচপ্রকার অন্যথাভাবের কথা বলা হইল, সেগুলি যথাক্রমে বিচ্ছেদাদি পঞ্চ বাধনিমিত্তই হইয়া থাকে। বিকারাদি এই পাঁচপ্রকার অন্যথাভাবের, সুতরাং বিচ্ছেদাদি পাঁচপ্রকার বাধের, যেটি অপ্রতিযোগী, কিনা, তা'দের বিষয়ীভূত নয়, সেইটি সত্য বলিয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছে। কাজেই সত্য এমন এক বস্তু, যা'র সম্বন্ধে বিকার, বিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তাদি নাই, এবং যেটি অবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদাদি বাধের দ্বারা বাধিত হয় না ॥৭-৯॥

[অব = অবধারণে, সুতরাং তত্ত্বতঃ; পরি = পরিতঃ = on the surface, সুতরাং অতত্ত্বতঃ; বি = বিশেষেণ, in regard to a certain aspect or mode, কোনও বিশেষ অবস্থা বা ধর্ম্মসম্পর্কে; উৎ = ঊর্দ্ধং = vertically or longitudinally ছেদ, সুতরাং নিষেধ or negation; প্রতি = তির্য্যক্, horizontally, transversely, ছেদ (cross-section।)]

৬। ব্যাজবিঘ্নবিরহবৃত্তিত্বং ছন্দস্ত্বম্ ॥

ঋতস্বভাবনিষ্ঠা যা শৃঙ্খলা সুসমঞ্জসা ।
তস্যাং স্থিতায়ামৃতিঃ স্যা-দার্জ্জবং হি তথা স্থিতিঃ ॥১০॥
স্বাভাবিকং হি সত্যস্যানন্ত্যং যজ্ জ্ঞানভাস্বরম্ ।
আনন্দঘনতানিষ্ঠ-লীলাকৈবল্যমেবচ ॥১১॥
যদর্ত্তঞ্চ তু সত্যঞ্চাভিষ্বঙ্গিণী পরস্পরম্ ।
তয়োশ্ছন্দস্ত্বমায়াত্যনধ্যস্তবাধয়োস্তদা ॥১২॥

৬। ব্যাজ ও বিঘ্ন এতদুভয় বিরহবিশিষ্ট যে বৃত্তি, সেটি ছন্দঃ ॥

[ব্যাজ ও বিঘ্ন এ দুটির লক্ষণ পরবর্ত্তী দুইটি সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে]

আমরা পরের দুইটি সূত্রে দেখিব যে বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈরূপ্য তাহার নাম ব্যাজ এবং বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈগুণ্য তাহার নাম বিঘ্ন। ছন্দঃ হইতেছে সেই বস্তু যাহাতে এই বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্যের অভাব থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ—নিখিল বিশ্বের মূলীভূত এই ছন্দঃ। শ্রুতি বহুস্থলে, বহুধা, ছন্দঃ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ছন্দঃ হইতেই সৃষ্টি, ছন্দতেই বিশ্বের স্থিতি এবং ছন্দতেই লয়। সুতরাং এই বিশ্বের জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, ছন্দঃ সেই ব্রহ্মেরই একটি মৌলিক রূপ। আমরা পূর্ব্বে 'ঋতং' এবং 'সত্যং' এই দুইটি তত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি। জগৎ-কারণের যেটি গতিরূপ, সেইটি হইল ঋত। গতির যেটি ফল বা কার্য্য তাহাই হইল জগৎ। কিন্তু জগৎ-কারণের জগদভিমুখে এই যে গতি, সেটি কি অন্ধ, উচ্ছৃঙ্খল, অসমঞ্জস গতি? তাহা হইলে তো এই অপরূপ বিশ্বরচনার কোন প্রকার উপপত্তি হয় না। অন্ধ আকস্মিকতা (Blind chance) হইতে এই অপূর্ব্ব মহাশ্চর্য্য রচনা কোনো ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হইবে যে সুসমঞ্জস এবং সুশৃঙ্খল গতিই হইতেছে ঋতের স্বভাবনিষ্ঠ ধর্ম্ম। এই শৃঙ্খলায় স্থিত হইয়া কোন কিছু ঘটিলে সেই ঘটনাকে আমরা বলিব 'ঋতি', এবং এবংবিধ স্থিতিকে আমরা বলিব 'ঋজু স্থিতি'। বলা বাহুল্য, মূল কারণের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে দেখিলে বিশ্বের সব কিছুই এই ঋজু ঋতের পন্থা অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় যে

সকল ভ্রংশ বা চ্যুতি এবং তন্নিমিত্ত বক্রতা বিষমতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি মূল বাস্তব চিত্রে অবশ্যই নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে মূল বাস্তব চিত্রখানি যেভাবে যতটুকু প্রকাশিত হয়, তার ভিতরেই এই সকল বিষমতাদি দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণজ্ঞানে অনবদ্য ছন্দোময় এই যে বিশ্ব, সেটি স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বমহাসঙ্গীতের মাঝখানে বেসুরা, বেতালা বলিয়া কিছুই নাই। এই বিশ্বের অটন, যিনি ভীষণ ও ভদ্র সেই মহানটরাজের নটন, হংসরূপী ভগবানের ভুবনরূপে অকুণ্ঠ সঞ্চার। পূর্ণজ্ঞানে বিশ্বের ঋতের পন্থায় নিত্য ঋজু স্থিতি। অপূর্ণজ্ঞানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। কোথায়ও বা ছন্দ দেখি, কোথায়ও বা দেখি না। ছন্দগুলিকেও খণ্ডিতভাবে দেখি। খণ্ড ছন্দগুলিকে একটা অখণ্ড ছন্দে সমন্বয় করিতে অপারগ হই। আমাদের বুদ্ধি এই অখণ্ড সমন্বয়ী ছন্দকে নিরন্তর অন্বেষণ করিয়া চলিতেছে। বুদ্ধি লক্ষ্যের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সে ব্যাজ ও বিঘ্ন, কিনা, বৈরূপ্য ও বৈগুণ্য, কোন না কোন সামঞ্জস্য সূত্র দ্বারা সমাধান করিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ইহাই গতি।

আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে যে কোনও গতিরূপ দেখিতেছি (যথা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কোন গ্রহের গতি) তার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে—উক্ত গতিটির নিরতিশয় যথার্থ রূপটি অথবা স্বরূপটি কি"? আমরা চক্ষুদ্বারা এক প্রকার দেখিতেছি, যন্ত্রাদির সাহায্যে হয়তো বা অন্য প্রকার দেখিতেছি। এবংবিধ দেখার তারতম্য রহিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন করিতে হয়, গতিটির যথার্থতম রূপটি কি? বলা বাহুল্য, একমাত্র অকুণ্ঠিত পূর্ণজ্ঞানে এই যথার্থতম রূপটি প্রতিভাত, অপূর্ণ স্তর মাত্রেই সে রূপটি অল্পবিস্তর আবৃত, কুণ্ঠিত ও বিকৃত। পূর্ণজ্ঞানে গতিটিকে আবার বিচ্ছিন্ন (isolated) ভাবে আছে, ইহা মনে করিতে পারি না। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ইলেকট্রন, প্রোটনের গতি পর্য্যন্ত সমস্তই একটা অখণ্ড বিরাট গতির মধ্যে মহাছন্দের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আলাদা করিয়া দেখিলে তারা অযথার্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং যেটি ঋত সেটি অনৃত হইয়া পড়ে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ছন্দের শৃঙ্খলাটি শৃঙ্খল নয়, তন্নিমিত্ত বন্ধনটিও "নাগপাশ" নয়। ছন্দের বন্ধন—ছন্দে নিয়ত

অম্বিতত্ব। পুনশ্চ, ঋতের পন্থাকে যে ঋজু পন্থা বলা হইল, সে ঋজুত্ব জ্যামিতিক ঋজুত্ব নহে। সে ঋজুত্ব মানে ছান্দোগ্য বা ছন্দোগত্ব (Coufor-mity or Concordance)। ছন্দের যেটি স্বাভাবিক নিজস্ব রূপ তাহা হইতে একটুখানিও নড়চড় না হইলে পাই এই ঋজুতা। পক্ষান্তরে, বক্রতা মানে জ্যামিতিক বক্রতা Curvature মাত্র নহে, অছন্দোগত্বই হইল বক্রতা (unharmony rcuvature); এই প্রকার সুষমতা ও বিষমতাও আমাদের বুঝিতে হইবে। জ্যামিতিক তল ক্ষেত্রাদি সম্বন্ধে যে সুষমতা (Symmetry) সেটি মূল ছন্দোগত্বের একটা বিশিষ্ট নমুনা মাত্র। মূল ছন্দোগত্ব হইতেছে পরম বিশারদী বুদ্ধির স্বীয় বোধরূপতা, এবং সেই বোধই সত্য বিশ্ব।

অতঃপর ভাবিয়া দেখিতে হইবে সত্যের স্বরূপটি কি? গতির দিক্ দিয়া দেখিলে যেটি ঋত, বস্তুর দিক্ দিয়া দেখিলে সেইটিই সত্য। আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে যে কোন বস্তুর একটা বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্যামেরায় বস্তুর যে ছবিটি পড়িতেছে, মন আপন বিবিধ সংস্কারের দ্রাবকে সেটিকে ফুটাইয়া তুলিয়া (develop করিয়া) আমাদের কাছে উপস্থিত করিতেছে। বস্তুটি স্বরূপে যাহাই হউক না কেন, আমাদের ক্যামেরাগুলি যখন আলাদা আলাদা, এবং দ্রাবকগুলিও যখন এক রকম নয়, তখন অবশ্যই বস্তুর রূপটি আমাদের সকলের কাছে একই রকম হইতে পারে না। বিভিন্ন জীবের তো কথাই নাই। একই বস্তুর বিভিন্ন রকমের ছবি হইলে, কোন্ ছবিটিকে বস্তুর ঠিক অনুরূপ বলিব? বিজ্ঞান অবশ্য বস্তুর প্রকৃত ছবিটি তুলিয়া লইবার জন্য যত্ন করিতেছে। অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ফলে আমাদের চারিধারে এই জড় বিশ্ব ক্রমশঃ তার জড়তা পরিহার পূর্ব্বক শক্তিরূপ ধারণ করিতেছে। বিশ্বশক্তির খেলায় একটা সমন্বয়ী ছন্দের সন্ধানও আমরা পাইতেছি। সেটা সাংখ্যচ্ছন্দ :—Mathematical Harmony. সুতরাং সত্যের পানেই অগ্রসর হইতেছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু চরম সত্যটি এখনও দূরে বলিয়াই মনে হইতেছে। যে সত্যটিকে বর্ত্তমানে আমরা গণিতের সমীকরণ শৃঙ্খলের দ্বারা বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছি, সে শক্তি কি কোন প্রকার প্রাণহীন, চৈতন্যহীন বস্তু? স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কোন ভাবেই বস্তুর

যেটি 'হৃল্লেখ'। (Basic Pattern) এবং বস্তুর যেটি 'হৃৎ' অথবা 'আত্মা' (Basic Essence), সে দুইটির কোনটিই আমরা এখন পর্য্যন্ত ধরিতে পারি নাই। পূর্ণ জ্ঞান বা প্রজ্ঞান ব্যতীত বস্তুর 'হৃৎ' অথবা 'হৃল্লেখা' সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং ঋতের মতো সত্যও আমাদের বোধের আদর্শ ও লক্ষ্য (End and Ideal) মাত্র। অব্যক্তস্বভাব, নিয়তি, অসৎ বা শূন্য, কাল, যদৃচ্ছা (Chance) অথবা কোনও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ পুরুষ এবং তদিচ্ছা—এ সকলের কোনো কোনোটাকে জগতের মূলে বসাইয়াছি, কিন্তু জগতের 'হৃৎ' অথবা 'হৃল্লেখা' কি মিলিয়াছে ? মিলিয়া থাকিলে কোনটায় ?

কিন্তু তথাপি আমাদের এই বোধই হইতেছে সত্যের প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কিছুই প্রশ্ন, সংশয়, বিকল্পাদির বিষয়ীভূত হইতে পারে, কেবল যেটি সাক্ষাদপরোক্ষ বোধ ("ভান") সেইটি বাদে। সেটি নির্ব্যূঢ়রূপে (unconditionally) অস্তি এবং ভাতি। সেইটিই Fact. ইহার নিজের সম্পর্কে সত্যমিথ্যাদি কোন প্রশ্ন নাই।

রজ্জু-সর্পাদি স্থলেও ইহার ভান স্বরূপে (ভাতিতা সম্বন্ধে) কোন সংশয় বা বিকল্প নাই। ভাতিতা হিসাবে ইহাতে অবচ্ছেদ পরিচ্ছেদও নাই—অবশ্য যে বা যে সকল রূপাদি 'ভাত' (presented), তা'দের সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি আছেই। সমগ্র, অখণ্ড ভানটি স্বয়ং 'অব্যবহার্য্য', অনিরুক্ত। এই ভানরূপ বোধের পটভূমিকাতেই বিচিত্র বিশ্ব প্রপঞ্চিত হইতেছে আদি অন্তহীন এক চলচ্চিত্রের মতো। সুতরাং এই বোধের দ্বারাই সত্যকে বুঝিতে হইবে। ভান ও বোধের মধ্যে একটুখানি বিশেষ করিয়া এই বুঝটি বুঝিতে হয়। ভান অনিরুক্ত (Alogical), তাকে বোধ নাম দেই, যখন সেটাকে কোনো না কোনো নিরুক্তির (category) সাহায্যে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমিব' (as it were Logical, Thinkable) করিতে চাই। সত্যেরও এই ভানরূপ এবং এই বোধরূপ। অনিরুক্তের নিরুক্তি করিতে গিয়া স্বরূপ তটস্থাদি ভেদও করিয়া থাকি, বুদ্ধির কোনো কোনো 'সূত্র' আশ্রয় করিয়া। এক কথায় সাক্ষাদ-পরোক্ষের (Alogical Absolute Fact এর) অন্তিকতমত্ব বা গরিষ্ঠ নৈকটিকত্ব (closest possible approximation) হইল স্বরূপলক্ষণ। নচেৎ, অলক্ষণের লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতা তো নাই।

শ্রুতি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' স্বরূপলক্ষণ করিয়াছেন। অবচ্ছেদ পরিচ্ছেদাদি

যাতে নাই, কোনোও প্রকার অভাবের বিষয় যেটি নয়, সেইটি অনন্ত। সত্য এবংবিধ অনন্ত জ্ঞান। কেন? 'আমার' যেটি বোধ-ভান (Experience as Fact) সেইটিই ভাতিতা বা প্রকাশমাত্ররূপে এই অনন্ত জ্ঞান নয় কি? সে জ্ঞানের 'বিষয় বিশেষ' (Fact-section, Object-Content) সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি অবশ্য রহিয়াছে কিন্তু নির্ব্বিশেষ অস্তিতা-ভাতিতা-মাত্ররূপে ত'তে সে সব নাই। ইহার আদি, মধ্য, অন্তও কল্পনায় আনা যায় না। সমগ্র ও অখণ্ড ভাবে যেটি প্রমানযোগ্য ও নির্ব্বচনযোগ্য (Thinkable and Predicable) নয়, সেটির অসাকল্য (অংশতঃ, খণ্ডতঃ)—নির্ব্বচন হয় যে বোধের দ্বারা তাকে বলে "প্রমাতা-বোধ" ("Reviewer Fact"). Original View এবং Reviewএর এই ভেদটি মনে রাখিতে হইবে। বোধবিশ্ব এবং বিশ্ববোধ এক নয়।

অস্তি ভাতিতা বা সৎ ও প্রকাশমাত্রতারূপে এতে কোনও পরিচ্ছেদ নাই বটে, তবু 'আমার' এই বোধ ভানে একটি 'কার্পণ্য' (Intrinsic Limitationality) ও কুণ্ঠা (Strain Potential) রহিয়াছে দেখিতেছি। 'হৃৎ' এবং 'হৃল্লেখা' (ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি) 'আমার' এই অস্তি ভাতিতায় 'অস্তি এবং ভাতি' হইতেছে কৈ? নিশ্চয়ই একটা 'অবগুণ্ঠক' (Veil) রহিয়াছে। এই অবগুণ্ঠকটিও অনির্ব্বচনীয় (Inscrutable)। কেবলমাত্র অবগুণ্ঠক নয়, অবমর্শক (Stress Potential)। এর ফলে আমার বোধ ভান একটা বিশিষ্ট আকার প্রকারের 'বোধ বিশ্ব' (A Universe of Experience with a given reference System) হইতেছে। সে 'বিশ্ব' ঋত ও সত্যস্বরূপের একটা ব্যবহারিক প্রতিচ্ছেদ (Practical Cross-Section). এই প্রতিচ্ছেদে হৃৎ এবং হৃল্লেখা এবং তাদের হৃচ্ছন্দঃ মিলিতেছে না দেখিতেছি। অথচ মিলাইবার প্রয়াসটি রহিয়াছে, তাও দেখিতেছি। যে পন্থায় (বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষদ্ দ্বারা) সেটি মিলে, তাহাই সমাবৃত্তি। পদার্থ বিজ্ঞান ইহার বহিরঙ্গ, অপূর্ণ সাধন, জপ এবং উপাসনা অন্তরঙ্গ সাধন।

সমাবৃত্তি সমাপনে বিশ্বের যেটা 'হৃৎ' বা আত্মা সেটা আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। আনন্দের 'সিন্ধু' (আকাশ বা নাদ) রূপ, ও বিন্দু (ঘন) রূপ। ঘন বা বিন্দুরূপেও সেটি সিন্ধু। বিন্দু রূপেও স্বরূপতঃ যেটি অমেয়—সেটি মেয় হয় না, কেবলমাত্র সম্ভাব্য-নিখিল-ক্রিয়োৎপত্তি-সামর্থ্যোর্জ্জিত

হয়। বিন্দুরূপেও দেশ-কাল-কারণতাজন্য 'নিরুক্তি' নাই। বিন্দু স্বয়ং 'নিষ্কল', কিন্তু অনন্ত কলনবৃত্তিতা, কিনা, কলার সম্ভাব্য-সম্ভাবন-সামর্থ্যরূপ। ঘনরূপতাই নিখিল অভিব্যক্তির মূলীভূত বীজরূপতা (হ্রীঁ)। এটি পরম ও অবম—এই দ্বিবিধ কেন্দ্রাশ্রয়িণী, যেটি 'নৈষ্কল্য' তার 'সাকল্য' দৃষ্টিতে। যাতে কলা—(Aspect বা Partial) নাই সেটি নৈষ্কল্য, কলন বৃত্তিতায় তাতে কলা ফুটিলে, সেটি হয় সাকল্য। পরম-কেন্দ্রাশ্রয়িনী আনন্দঘনরূপতাই পরমেশ্বরের (ওঁঙ্কারের) "বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" এই সৃষ্টিবীজ "কাম" (ক্লীঁ)। অবম কেন্দ্রে "বিন্দু" অবগুণ্ঠক অবমর্শক দ্বারা অবচ্ছিন্ন। পরমেশ্বরের লীলা কৈবল্য (শ্রীঁ, ঐঁ) (Pure Unfettered Action or Play) অবম সকল কেন্দ্রে 'কৈবল্য' লক্ষণটি হারাইয়া "লীলা" স্বরূপটিও লুকাইয়াছে। অথচ, কোথাও (এমন কি জড় পরমাণুতেও) একান্তভাবে সেটি বাধিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই চতুষ্পাৎ সত্য অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং সত্যের দৃষ্টিতে বিশ্বের 'হৃৎ' যেমন আনন্দ, 'হৃল্লেখা' তেমনি লীলাকৈবল্য প্রসূত, আবার প্রকারতা বিশিষ্ট আনন্দের উল্লাস এবং বিলাস। পরের কোনও কোনও সূত্রে—আনন্দের উল্লসিত্ব বিলসিত্ব এবং অলসিত্বের অবস্থাগুলি বিবৃত হইবে। 'ম'='আমি'র কোনও অনিরূপিত কিন্তু নিরূপণযোগ্য সংস্থা ; তার অব (Sub=নীচে) হইল 'অবম' ; আর 'পর' (Super বা Supra=ঊর্দ্ধে) হইল 'পরম'।

অতএব 'সত্য' বলিতে (১) অনন্ত অকুণ্ঠ জ্ঞান, (২) অপরিসীম, অপরিমেয় আনন্দ, (৩) আনন্দের বিন্দুঘনরূপতা এবং (৪) লীলা কৈবল্য, সুতরাং (৫) অনিরুক্ত-নিষ্কলের নিরুক্ত-সকলরূপে (কলাবিশিষ্ট) অভিব্যক্তি —এই কয়টি পাইতেছি। এ অভিব্যক্তি 'অতাত্ত্বিক' অর্থাৎ দেশ কালাদি দ্বারা তত্ত্বতঃ 'অন্তরিত' (Interjected, Projected) হইয়া অনিরুক্ত-নিষ্কল নিরুক্ত-সকল হয় না। একটি অবোধবগাহ্য (কিনা, অবুদ্ধিগ্রাহ্য= Alogical) রূপ, অপরটি বোধবগাহ্য (কিনা, বুদ্ধিগ্রাহ্য=logical) রূপ।

শ্রুতি "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ"—অর্থাৎ ঋত এবং সত্যকে (দুইটি 'চ'কার দ্বারা) পরস্পর অভিষঙ্গিভাবে বলিয়াছেন। ৯ সূত্রের কারিকায় এই অভিষঙ্গ আলোচিত হইয়াছে এবং আসঙ্গ (ব্যাসঙ্গ), অনুষঙ্গ, প্রতিষঙ্গ, ইত্যাদি রূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্বঞ্জ' ধাতু আলিঙ্গন অর্থে। ফলে ঋত ও সত্য

অন্যোন্যাসঙ্গি ('interlocked') হয়। অর্থাৎ ঋত শুধু ঋজু, সুষমশৃঙ্খলা মাত্র ('Law') থাকে না, সেটি হয় অনন্ত জ্ঞান-আনন্দ-লীলা-কৈবল্যের নিজ অভিব্যক্তিরূপ—('Own absolute manifestation), আর সত্যও তখন অনন্তজ্ঞানাদিলক্ষণ বস্তু মাত্র নয়, (একটা Absolute Conscious Subsistence মাত্র নয়); কিন্তু সেটি হয় একটা 'অমান-মানদা' পরম স্বতঃস্ফূর্ত্ত (Self-determined) ধারা (as Self-determined Process measureless in itself but evolving measure)। এই প্রকার ঋত ও সত্যের পরস্পরের "অভিতঃ" যে স্বজমানতা, তাহাই হইল স্বভাবছন্দঃ, বা স্বচ্ছন্দঃ, হৃচ্ছন্দঃ। বাধা ও বাধদ্বারা স্বভাবতঃ অনধ্যস্ত, অনাক্রান্ত ঋত ও সত্যের পরস্পর অভিষঙ্গজনক ও তজ্জন্য যে স্বচ্ছন্দঃ, তার সম্বন্ধে ব্যাজ বিঘ্ন অনবকাশ। কিন্তু অবম দৃষ্টিতে স্বজমানতাটি (অর্থাৎ সত্যের আপন ঋত এবং ঋতের আপন সত্য, এই অবিনাভাবটি) "অভিতঃ" (কিনা, ঠিক congruent, in complete correspondence) না হইলে "হৃচ্ছন্দঃ" অবগুণ্ঠিতাদি হইয়াও পড়ে, তার ফলে 'বিশ্ব জাড্য' (অচেতন জড়রূপতা) 'বিশ্ব তাড্য' (blind cosmic determinism) ইত্যাদি অহৃচ্ছন্দঃ (যাহা হইতে অরিচ্ছন্দ) এবং বৈরূপ্য, বৈগুণ্যাদি আক্ষেপিত হয়।

[জপসূত্রে ৪।১।১৬ সূত্রে প্রকৃতিচ্ছন্দঃ, আকৃতিচ্ছন্দঃ, প্রকৃতি-বিকৃতিচ্ছন্দঃ এবং বিকৃতিচ্ছন্দঃ—এই প্রকার ছন্দের চাতুর্ব্বিধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ১৭ সূত্রে স্বভাব-বিভাবাদি ভেদে পঞ্চবিধতা, এবং, ১৮, ১৯ সূত্রে সপ্ত-বিধতাও কথিত হইয়াছে; ২১-২৫ সূত্রে জগত্যাদি সপ্তচ্ছন্দের রাহস্যিক লক্ষণ, এবং অন্য অন্য স্থলে মধুচ্ছন্দাদির প্রসঙ্গ রহিয়াছে] ১০।১১।১২ ॥

৭। বাধবাধাজন্যবৈরূপ্যং ব্যাজঃ ॥

ভ্রংশাপভ্রংশবিভ্রংশা ইতি ব্যাজো ভবেত্ত্রিধা।
চ্যুত্যপহ্নুতি-বিচ্যুতি-সংজ্ঞাভিরুচ্যতেঽপি সঃ ॥১৩॥
ভ্রংশেন ব্যভিচারিত্বং সামান্যতঃ প্রসজ্যতে।
অপেন চাপনীতত্বং বৈপরীত্যং পুনর্বিনা ॥১৪॥

সাকল্যেনাংশতোবাপি দ্বিধা ব্যাপ্তির্ভবেত্রিষু ॥১৫॥
ভ্রংশঃ সাংসিদ্ধিকো জ্ঞেয়ঃ প্রমাণৈরুপপাদিতঃ।
সাংকল্পিকস্তু সংকল্পাদ্ বৈকল্পিকো বিকল্পবান্।
আভাসিকশ্চ জানীহ্যাকস্মিক ইতি পঞ্চধা ॥১৬॥

৭। **বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈরূপ্য তার নাম ব্যাজ ॥**

[ব্যাজ = Unharmony Curvature]

পূর্ব্ব সূত্রের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে ঋত ও সত্য পরস্পরের অন্বিত না হইলে অন্ধ জগৎ, বদ্ধ জগৎ ইত্যাকার জগতের যথার্থরূপ সম্বন্ধে বৈরূপ্য উপস্থিত হয়। কেবল তাহাই নহে, দ্বৈধ বা দ্বৈত জগতের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। বিশ্ব একরূপ না হইয়া দ্বিরূপ অথবা বহুরূপ হইয়া পড়ে। ইহাকে Dual অথবা Plural Universe বলা যাইতে পারে। যথা, এই বিশ্ব ঠিক ছন্দোবদ্ধভাবে চলিতেছে অথবা ইহার কোথাও ছন্দের অভাব আছে? Nature কি Law এবং Chanceএর mixture? যে-শক্তিদ্বারা জগৎ চালিত হইতেছে, সেই শক্তি কি দেবশক্তি, না অসুরশক্তি, না উভয়ই? জগতের মূলে এই যে দ্বন্দ্ব, সেটি কি মৈত্র দ্বন্দ্ব (Concordant Duality) অথবা বৈর দ্বন্দ্ব (Discordant Duality.)? এই ভাবের নানা আশঙ্কা উদিত হইয়া থাকে। ঋত এবং সত্যের যে পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, আমাদের বিশ্ববোধে সেটির ভ্রংশাদি লক্ষিত হইলেই এই সকল প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা উত্থিত হইয়া থাকে। যে ভ্রংশাদির ফলে যথার্থ-রূপে বিরূপতা দেখা দেয়, তাহাকেই বলে ব্যাজ। 'আবিঃ'র যেটি 'বি' অর্থাৎ ঋত এবং সত্যের বিশ্বতোমুখতা, অর্থাৎ বিশ্বাকারে আবির্ভাব, সেটিকে আবৃত করিয়া অন্য আকারে অথবা রূপে যেটি জাত হয়, তাকে বলে ব্যাজ— বি+আ+জ। ঋত এবং সত্য দৃষ্টিতে যেটি রজ্জু, সেটি ব্যাজ-দৃষ্টিতে সর্পরূপে দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে ৪ ও ৫ সূত্রে যে বাধ ও বাধার কথা বলা হইয়াছে, তাদের নিমিত্তই এবংপ্রকার আবরণ ও বিক্ষেপটি ঘটিয়া থাকে। ভ্রংশ, অপভ্রংশ এবং বিভ্রংশ অথবা চ্যুতি, অপহ্নুতি এবং বিচ্যুতি এই তিন প্রকার ব্যাজ (Unharmony Curvature) আমাদের বিবেচনা করিতে হয়। এর মধ্যে

'ভ্রংশ' এইটির দ্বারা সামান্য ভাবে ব্যভিচারিত্ব (Departure, Deviation, Exception) বুঝিতে হইবে; 'অপভ্রংশ' এটির দ্বারা যথার্থ রূপটি অপনীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে (Negation or Elimination); 'বিভ্রংশ', ইহার দ্বারা বৈপরীত্য (Contrary or Contradictory) বুঝিতে হইবে। এই ত্রিবিধ স্থলেই প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল তার ব্যাপ্তি কতটা? যথার্থ রূপটি কি সমগ্র ভাবে অথবা আংশিক ভাবে ব্যভিচার প্রাপ্ত হইল? ভ্রংশ বা চ্যুতি সম্বন্ধে এবংপ্রকার সাকল্য ব্যাপ্তি এবং অংশতো ব্যাপ্তি সর্ব্বক্ষেত্রেই বিচারযোগ্য। অন্যভাবে দেখিতে গেলে ভ্রংশ বা চ্যুতি হইতেছে পাঁচ প্রকার—সাংসিদ্ধিক, সাংকল্পিক, বৈকল্পিক, আভাসিক এবং আকস্মিক।

আমাদের ব্যবহারিক (সুতরাং আপেক্ষিক, নির্ব্ব্যূঢ় নয়) প্রমাণ দ্বারা যে ভ্রংশ অথবা চ্যুতি উপপাদিত (কিনা, সিদ্ধ) তাকে সাংসিদ্ধিক বলে। যেমন, 'স্থান' বা Space এর বক্রতা; আলোকাদি বিকিরণের যুগপৎ রেণুরূপ এবং ঊর্ম্মিরূপ; অণুর অভ্যন্তরে ঋণাত্মক তড়িদণু (Electron) এর গতি স্থিতির 'অনিয়তত্তা' (Indeterminacy); রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে 'অদৃষ্টবশতঃ' (যেন লটারি করিয়া) কতকগুলির বিকিরণ, অপরগুলির নিশ্চেষ্টতা; ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে 'লম্ফ', আলোক-রশ্মি বেগের এবং শক্তিকণিকার মানের (Quantumএর) 'অক্ষরতা' (constancy); ইত্যাদি। প্রাণিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অপরাপর ক্ষেত্রেও এই প্রকার 'ব্যাজ'এর দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে ও মিলিতেছে। পূর্ব্বেকার প্রমাণ সিদ্ধ অনেক কিছুই বর্ত্তমানে নাকচ হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে যেগুলি 'সিদ্ধ' তারা অথবা তাদের কোনো কোনওটি, ভবিষ্যতে অসিদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। পূর্ণজ্ঞানে যেটি নির্ব্ব্যূঢ় প্রমাণ, তার পরিভাষা 'বেদ'। নির্ব্ব্যূঢ় প্রমাণে যেটি সিদ্ধ, তার অসিদ্ধ হবার আশঙ্কা নাই। সেটি আর 'ব্যাজ' নয় তখন। তখন বাধ-বাধা-বিরহবিশিষ্ট 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' সেটি। তখন ভ্রংশ বা চ্যুতি তত্ত্বতঃ নয়। ছন্দঃ সেস্থলে স্বরূপেই অচল-প্রতিষ্ঠ। আমরাও ব্যবহারিক জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে ছন্দের আপাত-ভ্রংশগুলি বৃহত্তর ছন্দের দ্বারা সারিয়া লইতে চেষ্টিত আছি—যথা কোন জ্যোতিষ্কের গতিবর্ত্মের অতর্কিত চ্যুতি বা বক্রতা। লক্ষ্য এবং আদর্শ হইল—'ঋতং বৃহৎ' ও 'সত্যং মহৎ'।

সাংকল্পিক—সংকল্প বা ইচ্ছাদ্বারা যে ভ্রংশ বা চ্যুতিটি ঘটিয়া থাকে। পরীক্ষাস্থলে এটি হইতে পারে। যেমন, একটা লাটিম বেশ ঘুরিতেছে, তাকে আঙ্গুল দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া দেখিলাম—কি হয়; 'ইন্দ্রশত্রু' এই মন্ত্র যে 'স্বরে' উচ্চারণ করিতেছি, স্বর বদলাইয়া দেখিলাম, তাতে শক্তির বা ফলের কি ব্যতিক্রম হয় না হয়, ইত্যাদি। তা ছাড়া ইহাতে বিবেচ্য—জীবের ইচ্ছার ফলে জীবের যেটি যন্ত্র (যথা Brain) তার নিজস্ব গতিচ্ছন্দে কোনও পরিবর্ত্তন (শক্তির মান অথবা দিক্ সম্বন্ধে) ঘটিতেছে কি না। যদি ঘটে তবে সেটি কি সত্যই ব্যাজ, না বৃহত্তর ঋতেরই সেটি অনুগত? সুতরাং সাংকল্পিকস্থলেও ঋতের আনুগত্য অথবা তার অভাব হইল বিচার্য্য বিষয়। বৈকল্পিক—যাতে বিকল্প,—সুতরাং প্রশ্ন ও সংশয় আছে। যেমন, বিবৃদ্ধিশীল (বিবর্দ্ধিষু) বিশ্ব (Expanding Universe) কি প্রমাণিত না প্রতীয়মান মাত্র? কোনও জপক্রিয়ার ফলে ঠিক যেটি শিষ্ট-সম্মত ফলশ্রুতি আছে, তার ব্যতিক্রম দেখিলাম। এই ব্যতিক্রম কি সত্যই ঘটিল অথবা ঘটে নাই এবং ঘটিলে, সেটি সত্যই ব্যতিক্রম কিনা? সুতরাং বৈকল্পিকস্থলে এই দ্বিবিধ সংশয় এবং দ্বিবিধ প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক।

আভাসিক,—যে ভ্রংশ বা ব্যতিক্রম আভাস মাত্র। ভ্রান্তি বা প্রমাদবশতঃ, 'অনুক্রমে'ও ব্যতিক্রম বুদ্ধি ঘটিতেছে। যেমন, জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত এক ঋজু দণ্ড বক্র দেখায়। উদয় বা অস্তের সময় (বিশেষ সমুদ্রবক্ষ হইতে) সূর্য্যকে বড় দেখায়। ব্যাজ কথাটার এক মানে ভাণ, কপট, ছল,—এ স্থলেও প্রশ্ন দ্বিবিধ—সত্যই ভ্রান্তি হইয়াছে কিনা,—হইয়া থাকিলে, কিরূপে হইল এবং যথার্থ রূপটি কি? (Correction of Apparent Error)। আকস্মিক—আমাদের ব্যবহারিক বিশ্ববোধে 'সম্ভাব্যতা' (Probability) বলিয়া এক 'বস্তু' রহিয়াছে; ব্যষ্টিভাবে (individually) প্রতিটি ঘটনা (event) ইহার 'নিয়মে' (by laws of probability) ঘটিতেছে মনে হয়; সমষ্টি ভাবে (on the average) সেটি 'নিশ্চিত' (certain) দেখিতে পাইলেও—দৃষ্টান্তস্বরূপে Kinetic Theory of Gases চিন্তা কর। আমরা যেটিকে নিরূপিত অথবা নিরূপণীয় বিশ্ব ভাবিতেছি, সেটি কি মূলতঃ (basically) সম্ভাব্যজগৎ (Statistical Universe) মাত্র? যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে—সম্ভাব্যতা কি উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ খেয়াল? কোনও

কিছুই ঠিক-না-থাকা থেকেই সব কিছু ঠিক হইতেছে? Primordial Night কি Original Chaos? Primordial Creativityর মূল কি Primordial Lawlessness? না, তাতো নয়। সম্ভাব্যতা (Probability Function) স্ব-নিয়মেই (অর্থাৎ আপন নিয়মানুবর্ত্তী হইয়াই) অবশ্য বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তের ঘটনাপুঞ্জকে "ঢালা-উবুর" করিতেছে। একান্ত উদ্ভট, আকস্মিক কিছুই ঘটিতেছে না। সংখ্যাবিজ্ঞানের মূলসূত্র এবং সমীকরণগুলি সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে অনবকাশ নহে। সম্ভাব্যতার উর্ম্মিভঙ্গিমা ("Probability Waves") কোনও ঘটনার সম্ভাব্যতার মাত্রা নিরূপণে অবশ্য আলোচ্য ও বিবেচ্য। বায়ুতরঙ্গের বেলা যেমনধারা বায়ুকণাপুঞ্জের স্থানিক ঘনতা এবং স্থানিক বিরলতা দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভাব্য তরঙ্গেরও তেমনি ধারা কোথাও গাঢ়তা কোথাও বিরলতা কল্পিত হইতে পারে। কোনও ঘটনা যদি গাঢ় অংশে থাকে তবে সেটার ঘটিবার সম্ভাবনা না ঘটিবার চাইতে অনেক বেশী; ঘনতার কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রসান্নিধ্যে থাকিলে সেটি এক প্রকার নিশ্চিতই। সম্ভাব্যতার যেটি পূর্ণাঙ্গচিত্র (complete curve) সেটি অবশ্য পূর্ণজ্ঞানেই ব্যবস্থিত। আমাদের চলতিজ্ঞানের আকস্মিক (accidental), বিজ্ঞানের সম্ভাবিত (probable), প্রজ্ঞানের নিশ্চিত বা নিশ্চিতপ্রায় (certain or almost so)—সবই এই চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া যাচাই করিতে হইবে। চলতি জ্ঞানের যেটি ব্যাজ, সেটি বিজ্ঞান শোধন করিয়া দেয়; বিজ্ঞানের ব্যাজ শোধন করে প্রজ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান ॥১৩।১৪॥১৫।১৬॥

৮। বাধ বাধাজন্যবৈগুণ্যং বিঘ্ন

উরূর্জ্জিতোজ্জ্বলোৎকর্ষে সীমা যত্র নিরূপিতা।
বৈগুণ্যহানিঃ সিধ্যেত তত্রৈব বিঘ্নবাধনম্ ॥১৭॥
গুণাৎ সংজায়তে বিঘ্নশ্চলচপলচঞ্চলাৎ।
স্তব্ধাস্তমিতধর্ম্মাচ্চ গুণাৎ স্তিমিততাভৃতঃ ॥১৮॥
উর্ব্বাদীনাং চলাদীনাং স্তব্ধাদীনাঞ্চ সঙ্করাৎ।
বৈগুণ্যং বহুধা জাতং বিঘ্নৌঘশ্চাপি তজ্জনিঃ ॥১৯॥

উপমর্দ্দশ্চাপমর্দ্দো বিমর্দ্দশ্চাপি বিক্রিয়াঃ।
পরস্পরানুপাতিত্বে গুণানামসমঞ্জসাঃ ॥২০॥
অনুপাতঃ স বিজ্ঞেয়ো নির্বিঘ্নশ্চ সমঞ্জসঃ।
উর্ব্বাদীনাং সমুৎকর্ষে য এব সংহতক্রিয়ঃ ॥২১॥
দৈশিকঃ কালিকশ্চাপি বাস্তবচ্ছান্দসৌ পুনঃ।
ইতি বিঘ্নানাং চত্বারো ব্যূহান্যাপ্যাসতে গণাঃ ॥২২॥
যন্ত্রেণ দৈশিকং বিঘ্নং মন্ত্রেণ কালিকং তথা।
তন্ত্রেণ ছান্দসং নশ্যেদন্ত্রেণ বাস্তবঞ্চ যৎ ॥২৩॥
যন্ত্রং তন্ত্রঞ্চ বুধ্যস্ব বিদ্যারূপং বিশেষতঃ।
শ্রদ্ধারূপং হি মন্ত্রঞ্চ চান্ত্রমুপনিষদ্ধি যা ॥২৪॥
ত্রিবেণীসঙ্গমে তাসাং কিংবা প্রণবরূপিণি।
স বিঘ্নপারিপারীণঃ স্নাতনিষ্ণাত এব যঃ ॥২৫॥
ধনুর্যন্ত্রমিষুর্মন্ত্রং তন্ত্রং সন্ধানপাটবম্।
যদন্তঃস্থং পুনশ্চান্ত্রে তল্লক্ষ্যং পরমুচ্যতে ॥২৬॥
ত্রিপুরং নিপুরং হিত্বা নাদনূপুরনিক্বণ-।
নিঃশ্রয়ণীং সমারুহ্য নিঃশ্রেয়স-পদং ব্রজ ॥২৭॥

৮। বাধ ও বাধা নিমিত্ত বৈগুণ্যকে বলে বিঘ্ন॥

[বিঘ্ন—Unharmony Complex]

এ দেশের শাস্ত্রে তিনটি গুণের কথা আছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এর মধ্যে সত্ত্বের লক্ষণ দেওয়া হয়—ইহা প্রখ্যা অথবা প্রকাশধর্ম্মী। নৈসর্গিক সকল বস্তুতেই এই তিন গুণের অনুপাত রহিয়াছে। সে অনুপাতটি স্থির নয়, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কোনও পদার্থের সত্ত্বগুণের অনুপাতটি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, সেটির ব্যাপ্তি বাড়ে। সেটি উর্জ্জিত হয় এবং সেটির উজ্জ্বলতা বা প্রকাশধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে পদার্থটির যথার্থরূপে অভিব্যক্তি বা প্রকাশের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল,

সেগুলি ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতেছে। এইটিকে বলে পদার্থের গুণের বা ধর্ম্মের উৎকর্ষ। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এবংপ্রকার উৎকর্ষের সীমা কোথায়? অর্থাৎ, কতটা উৎকর্ষ হইলে আমরা বলিতে পারি যে বস্তুটির যথার্থরূপ প্রকাশ এইবার হইল? যেখানে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বা শেষ সীমা সেইখানে বৈগুণ্য একান্তভাবে তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং সেখানেই বিঘ্নরূপ অন্তরায় সর্ব্বথা বাধিত হইয়াছে ॥১৭॥

কিন্তু সত্ত্বগুণ তো একা নাই। সঙ্গে রজোগুণ রহিয়াছে; তার ধর্ম্ম হইতেছে প্রবৃত্তি। রজোগুণ চল, চপল, চঞ্চল স্বভাব। ইহা হইতে ঘোরবৃত্তি বিঘ্ন বা অন্তরায়, সুতরাং বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে। এ দুটি ছাড়া জড়-স্বভাব তমোগুণ রহিয়াছে; এই তমোগুণের দ্বারা বস্তু স্তব্ধ, স্তিমিত এবং অস্তমিত এই ত্রিবিধ মূঢ়বৃত্তি বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৮॥

উরুস্বভাব, চলস্বভাব এবং গুরুস্বভাব এই ত্রিবিধ গুণের পরস্পর মিশ্রণ এবং সে সকলের অনুপাত-বৈচিত্র্যের ফলে বৈগুণ্য বহু প্রকারের এবং তজ্জন্য বিঘ্নরাশিও বহু আকারের সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥১৯॥

গুণত্রয়ের পরস্পর মিশ্রণে অসমঞ্জসতা (Disharmony) থাকিলে সঙ্ঘাত ফলে বিক্রিয়া দেখা দেয়। গুণ সকলের পরস্পর অনুপাতে যদি সমঞ্জসতা (Harmony) রক্ষিত হয় তবে অবশ্য সঙ্ঘাতফলে বিক্রিয়া দেখা দেয় না। কোন্ অনুপাতটি সমঞ্জস, কোনটি বা নয়—সেটি অবশ্য ঋত এবং সত্যের আলোকসূত্র (Leading Light) সাহায্যেই যথাসম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। স্বচ্ছ এবং প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণের পোষণ এবং প্রভুত্ব হইতে থাকিলে এই অত্যাবশ্যক আলোকসূত্রটি সহজে আমাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রজঃ এবং তমঃ এই দুইএর প্রাধান্য থাকিলে চাঞ্চল্য এবং মালিন্যবশতঃ সে আলোকসূত্রটি আমরা একরূপ হারাইয়াই বসি। অসমঞ্জস অনুপাতের ফলে যে বিক্রিয়াগুলি উপস্থিত হয়, সেগুলি উপমর্দ্দ, অপমর্দ্দ এবং বিমর্দ্দ এইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 'উপ' কিনা, সমীপে স্থিতিবশতঃ যে মর্দ্দ; 'অপ' কিনা অপনীত করিয়া বা সরাইয়া যে মর্দ্দ; এবং 'বি', কিনা, বিরুদ্ধ বা বিপরীত করিয়া যে মর্দ্দ ॥২০॥

['চল' = নিয়তগতি (Continuous) দিগ্‌দেশ-কাল-বস্তু-ছন্দঃ সম্পর্কে; 'চপল' — অনিয়তগতি (Discontinuous); 'চঞ্চল' — পূর্ব্বোক্ত দুটির

মিশ্রণবশতঃ অব্যবস্থিত (Uncertain)। ঘোরবৃত্তি এই প্রকারে ত্রিবিধ—Continuous Function, Discontinuous Function, Erratic Function হইলেও শেষোক্ত দুইটিতে ঘোররূপতার প্রাবল্য। 'চল' এটি মৌলিক (Basic)। ইহার 'আধারেই' অপর, দুটি সম্ভাবিত হইতে পারে। সুতরাং এটিকে 'শূন্য' করিলে ঘোর যেটি সেটি 'অঘোর' হয়। এই শূন্যের সাধন হইল জপকর্ম্ম এবং যোগের সাধন। 'মহানাদ' এবং 'মহাবিন্দু'—এই দুইটিই শূন্যতার সীমা।

'স্তব্ধ' = বেগবান্ অথচ প্রতিহত (Arrested, Repressed or Suppressed Momentum); 'স্তিমিত' = অপক্ষীয়মাণ বেগ (Reduced Momentum); 'অস্তমিত' = প্রক্ষীণবেগ (Resolved Momentum)। বহির্ব্বিশ্বে 'জড়শক্তি'র অবস্থিতি-পরিস্থিতিতে, প্রাণের ও মনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে (আবেগ-সংস্কারাদির পরস্পর সংঘাতে) এই ত্রিবিধ 'মূঢ়বৃত্তি' নিয়ত উদাহৃত হইতেছে। দিগ্‌দেশ-কাল-বস্তু-ছন্দঃ এগুলি সবই এই মূঢ়বৃত্তি দ্বারা 'আক্রান্ত' অথবা 'আক্রম্য'। তিন প্রকারের মধ্যে 'স্তব্ধ' হইল মৌলিক। ইহার শূন্যীকরণ হয় পূর্ণ প্রতিপক্ষভাবন দ্বারা। 'ভাবন' মানে 'ভাবনা' মাত্র নয়, (৪।১।৩০), উদ্ভাবন = actual creation। প্রতিপক্ষ = প্রতিযোগী = counter-action।] (এ সবের সবিস্তার বিশ্লেষণ পরে আছে।)

উরু, উর্জ্জিত (উ+উর্জ্জিত), এবং উজ্জ্বল—প্রণবের 'উ'কার মাত্রা দ্বারা উপলক্ষিত, এই তিনটি গুণের সমুৎকর্ষ হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ খ্যাতি হইতেছে। ইহাকে বলে প্রখ্যা। এইটি সত্ত্বগুণের পরিণাম। কিন্তু এই পরিণামটি হইতে হইলে রজঃ এবং তমোগুণের সহযোগিতা থাকা চাই। রজঃ হইতেছে চল অর্থাৎ প্রবৃত্তিধর্ম্মী। এটি না থাকিলে প্রকৃতির সকল ব্যাপারই অচল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এটি সঙ্গে না থাকিলে সত্ত্বগুণের প্রখ্যারূপ পরিণামটিও সম্ভবে না। পুনশ্চ তমোগুণও সঙ্গে থাকা চাই। তমোগুণের ধর্ম্ম হইতেছে স্থিতি। কাজেই এ গুণটির একান্ত অভাব হইলে কোনো কিছুই স্থির হইয়া দাঁড়াইবে না, বিরোধী প্রতিপক্ষকে বাধা দিবে না। অতএব দেখিতেছি যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্থলেও সেটির অনুগত ভাবে অপর দুটি গুণও বিদ্যমান থাকা চাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে—অনুগত হওয়া অথবা সহকারী হওয়া বলিলে কি বুঝিব? তিনটি

গুণের পারস্পরিক যে অনুপাত, সেই অনুপাত একটি বিশেষ সামঞ্জস্যরূপ ধারণ করিলে তবে গুণগুলি 'সংহতক্রিয়' হয়। সুতরাং তার ফলে, উরু, উর্জ্জিত এবং উজ্জ্বল এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের নির্ব্বিঘ্নে সমুৎকর্ষ ঘটিতে পারে। গুণত্রয়ের অনুপাতে অসমঞ্জসতা নিবন্ধন, যদি তারা ঠিক এই উদ্দেশ্যে সংহতক্রিয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে পরিণামটি বিঘ্নসঙ্কুল রহিয়াছে ॥২১॥

[দুইটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। রাসায়নিক সংযোগের ক্ষেত্রে এই অনুপাত নিয়মটি বিশেষভাবে সামর্থ্যযুক্ত দেখিতে পাই। দুটি বা তিনটি বা ততোধিক অণুর যে অনুপাতে মিলনে যে অভীষ্ট বস্তু বা ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, সে অনুপাতের ব্যতিক্রমে সেটি হয় না, এমন কি, তার বিপরীতও হইতে পারে। সংখ্যা এবং অনুপাতই বস্তুর স্বরূপ, গুণ এবং ক্রিয়ার নিয়ামক। মধু এবং ঘৃত কোনও এক প্রকার মিশ্রণে বিষক্রিয় হইতে পারে, অন্য প্রকার মিশ্রণে মেধ্য। শরীরের পাচক রসগুলি যে অনুপাতে নিঃসৃত এবং মিলিত হইলে পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল, অন্য অনুপাতে সেগুলি প্রতিকূল হইতে পারে। বিশ্বের ঘটনাগুলি অবশ্য একটা 'ঋত' অনুসারেই ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক যে সকল রেডিয়াম জাতীয় বস্তু তাদের তেজোবিকিরণ (অণু বিশীর্ণ হবার ফলে) নিয়ত ঘটিতেছে, তার ফলে প্রকৃতিতে নূতন প্রকার পদার্থের উদ্ভব হইতেছে, এবং নিয়ত অপক্ষীয়মাণ যে তাপ তারও সমতারক্ষার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে হইতেছে ; এবং এই প্রকার সমতারক্ষার ফলে ধরিত্রীয় জীবন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় অগ্রগতিলাভের সুযোগ পাইতেছে। রেডিয়ামের তেজোবিকিরণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং নিয়ত হইলেও "ভীষণ বিপ্লবী" নয়। প্রকৃতির গতিচ্ছন্দঃ তদ্দ্বারা রক্ষিতই হইতেছে। কোনও কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে (যেমন সূর্য্য) অণুসমূহের উগ্র বিপ্লবী কাণ্ডও সম্ভবতঃ ঘটিতেছে, কিন্তু তার ফলে ("কসমিক রে" ইত্যাদির বিকিরণে) বিরাট্ বিশ্বে শক্তি সামঞ্জস্য (Balance of Power) ক্ষুণ্ণ না হইয়া রক্ষিতই হইতেছে। অবশ্য এসব মৃদু অথবা উগ্র বিধান থাকা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিশ্বের "জরা" আসিতেছে (Entropy or "Universal running down") সেটা ঋতের অনুবর্ত্তনেই। কিন্তু আমরা যখন ইউরেনিয়াম ("লঘু সংস্করণ") অথবা অপর কোনও রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের কেন্দ্রীণসত্তাশক্তিটিকে প্রচণ্ড অভিঘাতে চূর্ণ করিয়া ("by fission") তার বিপুল ঘনীভূত শক্তিকে মুক্ত করিতে যাই,

তখন (যেমন এটম্ বোমার ক্ষেত্রে) একটা সর্ব্বধ্বংসী প্রলয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া বসি কেন? কেন্দ্রীণ সত্তায় (নিউক্লিয়াসে) ঐ বিপুল শক্তি রহিয়াছে 'স্তব্ধ' হইয়া। এটি তমোগুণের কাজ। কোনও কোনও রেডিয়াম অণুর একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ও ছন্দে স্বতোবিকিরণ—এটা রজের কাজ। প্রকৃতিতে এ দুয়ের অনুপাত সুসমঞ্জসভাবে রক্ষিত হইতেছে উক্ত ছন্দঃ দ্বারা। উক্ত ছন্দঃ প্রকৃতির বিধানে যে সত্ত্বগুণের প্রভুত্ব, সেই সত্ত্বগুণের দেওয়া। সেই ছন্দের শাসনে প্রকৃতিতে কেন্দ্রীণসত্তাশক্তির আয়-ব্যয়ের অনুকূল অনুপাত রক্ষিত হইতেছে। আমরা 'ফিশন' দ্বারা আণবিক শক্তির বিপুল ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া এই ছন্দের শাসন বর্ত্তমানে লঙ্ঘন করিতেছি। শক্তির 'অবষ্টম্ভক' যে তমোগুণ তাকে প্রবল প্রচণ্ড রজের দ্বারা একেবারেই চূর্ণ করিতেছি। পক্ষান্তরে, সে ঘোর রুদ্রশক্তিকে অঘোর শান্ত করিয়া আত্মবশে আনার কোনও কৌশল (সত্ত্বের সূত্র) এখনও মিলে নাই। হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতিও এই দৃষ্টিতে বিবেচ্য।

প্রাণের ক্ষেত্রে নানা প্রকার 'সিন্‌থেটিক্ পয়জেন' এবং ব্যাকটিরিয়া তাদের স্বভাবস্বচ্ছন্দতার কক্ষচ্যুত করিয়া ব্যাপক সৃষ্টিতে আমাদের মারণকর্ম্মে বিনিয়োগ করিতেছি। প্রকৃতিতে তাদের বিকাশ-প্রবৃত্তি-স্থিতির একটা বিশ্বানুগ ছন্দঃ রহিয়াছে (যেমন, পেনিসিলিন প্রভৃতি এণ্টিবাওটিক ভেষজে)। সেটি আমরা ভাঙ্গিতেছি।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ"—কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। আমাদের প্রকৃতিতে এদের সত্যই একটা স্থান ও প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ছন্দের (অর্থাৎ সত্ত্বের) শাসনেই রহিয়াছে।' তাদের গতি, স্থিতি এবং পরিবর্ত্তনের রেখাচিত্রটি (curve) ঐ নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। নিয়ন্ত্রিত হইলে তারা বৈরী নয়, মিত্র। অন্যথা 'মহাশন' হইলে 'মহাপাপ্মা', সুতরাং ঘোর বৈরী।

অতএব পূর্ব্বে যে ঋত-সত্য-ছন্দের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তাহার শাসনের অনুবর্ত্তনই হইল মুখ্যভাবে গুণত্রয়ের 'অনুকূল' অনুপাত, অনুপাত-সমতা। এ সমতা সংখ্যা বা পরিমাণের সমতা নয়। এ ছাড়া যে-কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুপাতের অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা যদি বিচার করি, তবে সেটা হয় 'গৌণ'। যেমন ইন্দ্রকে সংহার করা তো স্বভাবের অনুবর্ত্তন

নয়। তথাপি কেহ সেই উদ্দেশ্যেই 'ইন্দ্রশত্রু' ইত্যাদি মন্ত্রে হবন করিতে থাকিল। এ ক্ষেত্রে তার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, যদি ঐ মন্ত্রাদির স্বরাদিগত 'সমতা'টি (appropriateness) রক্ষিত হয় তবেই। নচেৎ উল্টা উৎপত্তি। সুতরাং 'সংহতক্রিয়' মানে শুধু একযোগে কাজ করা নয়, ব্যূহরূপে (as organised according to plan) কাজ করা। ব্যূহ বলিলে কোনটি তার কেন্দ্রে, কোনগুলি পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ইত্যাদি ভাবে শক্তি সংস্থান ও বিন্যাসের একটা নিরূপিত রূপ (definite picture) বুঝিতেই হয়।

বিঘ্নসমূহকে আবার সমষ্টির দিক দিয়া তিন ভাবে বলা যাইতে পারে—ওঘ, গণ এবং ব্যূহ। 'ওঘ' অর্থে সাধারণ ভাবে সমষ্টি ; 'গণ' অর্থে দলবদ্ধভাবে সমষ্টি, এবং 'ব্যূহ' অর্থে ব্যূহবদ্ধভাবে (কোন কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া কোন এক কৌশলে) সমষ্টি। অন্যভাবে দেখিতে গেলে বিঘ্ন চারি প্রকার—দৈশিক, কালিক, ছান্দস এবং বাস্তব। এই সকল প্রকার বিঘ্নকে জড়াইয়া যেটি হয়, সেটিকে এক কথায় বলা যায়—বিঘ্ন সন্দোহ ॥ ২২ ॥

যন্ত্রের দ্বারা দৈশিক বিঘ্ন নাশ করিবে, মন্ত্রের দ্বারা কালিক বিঘ্ন, তন্ত্রের দ্বারা ছান্দস বিঘ্ন এবং অস্ত্রের দ্বারা বাস্তব বিঘ্ন নাশ করিবে ॥ ২৩ ॥

যন্ত্র এবং তন্ত্রকে বিশেষভাবে বিদ্যারূপ বলিয়া জান, মন্ত্রকে শ্রদ্ধারূপ এবং অস্ত্রকে উপনিষদ্রূপ বলিয়া জান ॥ ২৪ ॥

এই বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষদ্রূপ ত্রিবেণী-সঙ্গমে অথবা এই তিনের প্রতিনিধি প্রণবে যিনি স্নান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, তিনি বিঘ্নপারাবার গোষ্পদের ন্যায় পার হইতে পারগ বা ক্ষম ॥ ২৫ ॥

যন্ত্র হইতেছে ধনুঃ, মন্ত্র, শর, তন্ত্র, সন্ধানপটুতা, এবং অস্ত্রে, কিনা, একেবারে অন্তস্তলে যে বস্তুটি রহিয়াছেন সেই বস্তুটিকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বাদি গুণত্রয়রূপ অথবা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ যে ত্রিপুর, সেটিকে পরিহার কর, অর্থাৎ তাতে তাদাত্ম্য বুদ্ধি রাখিও না। নিপুর, অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট যে লিঙ্গশরীর তাকেও ঐভাবে পরিহার কর। নাদ-নূপুর-নিক্কণ-মুখরিত যে সাধনের সোপান শ্রেণী সেই সোপান সমারোহণ পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স পদ লাভ কর ॥ ২৭ ॥

৯। ব্যাজবিদ্ধস্য ছদ্মত্বম্।

আদাবৃতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽধ্যজায়ত।
ঋতেন ত্বনভিষ্বক্তং সত্যং ন স্পন্দিতুং ক্ষমম্ ॥২৮॥
স্পন্দাভাবে ন চাবিষ্টং ব্যোমত্বাদিজনিঃ পুনঃ।
অসঙ্গে তু বিনা সঙ্গং স্পন্দঃ প্রসজ্যতে কুতঃ ॥২৯॥
স আসঙ্গো হি কামো যঃ সূক্তে আথর্ব্বণে শ্রুতঃ।
আসঙ্গে সত্যভিষ্বঙ্গ শ্চানুষঙ্গজনিস্তু যঃ।
দ্বৈতং সম্পুটিতং যস্মিন্ দ্বে বীজে চণকে যথা ॥৩০॥
শক্যনির্ব্বচনং দ্বৈত মভিষ্বঙ্গো ন বৈ ত ।
মায়াবীজমিমং বিদ্ধি হরৌ স্তো যত্র গর্ভিতৌ ॥৩১॥
নিঃস্পন্দঃ খনিভো হশ্চ সস্পন্দো রোহি বহ্নিবৎ।
ঈকারেণ সমীক্ষেতে নাদবিন্দুবিলক্ষণৌ ॥৩২॥
আদাবসঙ্গমদ্বৈত মবাঙ্‌মনসগোচরম্।
বহুস্যামিতি কামে ত্বসঙ্গস্যাসঙ্গতাগতিঃ ॥৩৩॥
কামবীজ মেবাসঙ্গং লীলাবীজবিকল্পকম্।
বিদ্ধি তস্মাদভিষ্বঙ্গ স্ততোঽনুষ্বঙ্গ ইষ্যতে ॥৩৪॥
অসঙ্গে তু ন বেধোঽস্তি নাপ্যাসঙ্গে স্ফুটক্রিয়ঃ।
অভিষ্বঙ্গে হি বেধস্য প্রাপ্তাবকাশতা ভবেৎ ॥৩৫॥
আসঙ্গে জায়ত আবির্দ্বন্দ্বস্ত্বং ততোঽপি চ।
দ্বন্দ্বান্নিরোধিকা রাত্রি র্যা সর্ব্বাম্নায়-গোপিতা ॥৩৬॥
উদারবৃত্তিতাং প্রাপ্য চৈকেনান্যন্ নিরুধ্যতে।
স্বেতররোধভেদাচ্চ রোধিকাপি ভবেদ্দ্বিধা ॥৩৭॥
ব্রহ্মাস্মীতি রুণদ্ধীমান্ বোধঃ শোকাদিবিভ্রমান্।
চরমবৃত্তিতাকারো রুদ্ধে স্বমপি যঃ সকৃৎ ॥৩৮॥

রোধপ্রসক্তিরাসঙ্গাদ্ বোধোঽভিষ্বঙ্গতঃ পুনঃ।
রোধো বোধায়তে ক্বাপি বেধো যাতি বিবিক্ততাম্ ॥৩৯॥
ব্যাজবিদ্ধত্বমাপন্নে ছন্দো ভ্রশ্যতি বক্রগম্।
রোধবেধক্ষমং স্যাত্তু ধৃতবজ্রতনুচ্ছদম্ ॥৪০॥
বেধমূষিকমন্বিষ্যোরগশ্চলতি বক্রগঃ।
অহিঞ্চ বাধতে বর্হী স্কন্দশ্ছন্দোগ-বাহনঃ ॥৪১॥

৯। ব্যাজ দ্বারা যেটি বিদ্ধ তাহাকে বলে ছদ্ম।

(Hypothetical and uncertain Harmony)

ব্যাজের লক্ষণ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে তাহার দ্বারা বিদ্ধ হওয়া মানে কি? বেদ বলিতেছেন আদিতে তপস্যা হইতে ঋত এবং সত্য জাত হইলেন। বেদ ঋত এবং সত্যের উল্লেখ কবিতে গিয়া দুইবার 'চ'-কারের প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার প্রয়োগের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ঋত এবং সত্য পরস্পরের সঙ্গে কোন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন আবদ্ধ হইতেছেন। শিব ও শক্তি যেমন পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, ঋত এবং সত্যও তেমনিধারা। অথচ পরস্পরের এই সঙ্গটিকে ধারণায় আনা যায়না এবং ভাষাতেও প্রকাশ করা যায় না। বন্ধন বা আলিঙ্গন যেটি আসলে বুঝার নয় সেটিকে কোন গতিকে কোন সঙ্কেতের দ্বারা বুঝার একটা বিফল প্রয়াস মাত্র। যে মহা রহস্য আমাদের বুদ্ধি ও বাক্যের পরপারে রহিয়াছে সেটিকে বুদ্ধি ও বাক্যের ব্যবহারের গণ্ডীতে কোন না কোন ফিকিরে আনিতে চাই; অথচ ঠিক আনিতে পারিও না। এই প্রয়াস করিতে যাইয়া কতকগুলি লক্ষণ, নিরুক্তি, প্রতীক এবং সঙ্কেতের আশ্রয় লইতে হয়। এমন দুইটি 'চ'-কার প্রয়োগ করিয়া বেদ ঋত ও সত্যের মধ্যে যে পারস্পরিক সঙ্গের কথা আমাদের বলিলেন সেটিকেও কোনও এক প্রতীক বা সঙ্কেতের সাহায্যেই আমাদের ধারণা করিতে হয়। আদিম বস্তু 'ন রেমে' অথবা 'ভয়ঙ্কার'—তিনি সুখ পাইলেন না অথবা যেন ভীত হইলেন—সুতরাং তিনি অদ্বিতীয় এক হইয়াও মিথুন হইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা দ্বারা যেটি অসঙ্গ তাহাতে সঙ্গের ইচ্ছা হইল, ইহাই আমাদের মনে করিতে হয়। কিন্তু অসঙ্গ হইতে

সঙ্গ যে কি প্রকারে আসিতে পারে তার কোন নিরুক্তি আমরা দিতে অপারগ। কেন না, সঙ্গ দেখা দিবার পরই বুদ্ধির ব্যাপার আরম্ভ হইতে পারে, তার পূর্ব্বে নয়। ঋত এবং সত্যের এই অনিরুক্ত সঙ্গটিকে আমরা "অভিষঙ্গ" নাম দিয়াছি। এই অভিষঙ্গটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেটি সত্য তাতে স্পন্দ অথবা স্পন্দনের সম্ভাবনা হয় না। আনন্দলহরী-স্তব যেরূপ বলিয়াছেন যে শক্তি বিনা শিব একটুও নড়িতে চড়িতে অক্ষম, সেইরূপ ঋতের অভিষঙ্গ বিনা সত্যের কোনরূপ স্পন্দ সম্ভব হইতে পারে না ॥২৮॥

স্পন্দ বলিতে কি বুঝিব? স্থূলে যেটিকে স্পন্দন (vibration) রূপে দেখিতেছি, সেটি এবং সৃষ্টির গোড়াকার এই স্পন্দ এক বস্তু নয়। বাইরের স্পন্দনের বেলায় দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু যে মূল স্পন্দনের কথা হইতেছে তাতে সে অপেক্ষা নাই। সত্য যখন ঋতের সংসর্গে স্পন্দিত হইল, তখন দেশই বা কোথায়, কালই বা কোথায়, নিমিত্তই বা কোথায়? অথচ সঙ্গ বলিতে কিসের বা কাহার সঙ্গ—এ জিজ্ঞাসা করিতেই হয়। সেই অপরটি কি? এক অদ্বিতীয় আত্মা ছাড়া অপর যখন আর কিছুই নাই, তখন মনে করিতে হইবে যে সেই এক আত্মাই আপনাকে যেন 'পর' করিয়া দেখিতেছেন। আমাদের অনুভবের দৃষ্টান্তে বুঝিতে গেলে যেন এই ভাবে বলিতে হয়—আমার যেটি সমগ্র বোধ সেইটিকে 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছি। পরক্ষণেই 'আমি'র সাক্ষিস্বরূপ 'আমি' হইয়া আমার বোধ বিষয়গুলিকে দৃশ্য (object) রূপে, সুতরাং 'আমি নয়' এই ভাবে দেখিতেছি। এ স্থলে এক অখণ্ড 'আমি' যেন নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একজন দ্রষ্টা বা সাক্ষী 'আমি' হইতেছে এবং অপর 'আমি'টাকে যেন দৃশ্য, করিয়া, পর করিয়া দেখিতেছে। এইটি 'আমি'র আপনাকে 'বলি'। ইহাই আদি যজ্ঞ। এই প্রকার 'আত্ম' এবং 'পর'—এই দ্বৈত আশ্রয় করিয়াই বিশ্বের মূল সঙ্গ এবং স্পন্দ সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গ মানে এবংপ্রকার দ্বৈতলেশ। 'লেশ' বলা হইতেছে এই জন্য যে এখন পর্য্যন্তও 'অহং'এবং'ইদং' পরস্পরের সঙ্গে যেন আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে, যেমনধারা চানার বীজের মধ্যে তার দুইটি দানা একই আবরণে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকে। এ প্রকার দ্বৈত সমানাধিকরণ; ব্যধিকরণ নয়। এই প্রকার সঙ্গ অথবা দ্বৈতলেশ দেখা দিলেই স্পন্দের সম্ভাবনাটি ঘটিয়া থাকে, অন্যথা নহে। পুনশ্চ, যতক্ষণ স্পন্দ

না ঘটিতেছে ততক্ষণ আদিম বস্তুর যেটি 'আবিঃ', কিনা বিশ্বতোমুখ অভিব্যক্তি সেটি সম্ভবে না, সুতরাং ব্যোম, বায়ু ইত্যাকার আবির্ভাবগুলিও সম্ভবপর হয় না ॥২৯॥

কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে বা রীতিতে অসঙ্গ হইতে সঙ্গ না হয় হইল, কিন্তু যে "অভিষঙ্গ" সম্বন্ধের কথা আমরা বলিতেছি, সেটি কি সঙ্গের একেবারে আদিম অবস্থা? না, তাহা নয়। ইহার পূর্ব্বে 'আসঙ্গ' বলিয়া আর এক অবস্থা আছে মনে করিতে হইবে। সুষুপ্তি অথবা গাঢ় মূর্চ্ছায় অজ্ঞানের ভান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে সুখেরও ভান হইয়া থাকে। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থা—যার ভান এবং যেটির ভান, সেই দুইটি এরূপ ভাবে জড়াইয়া থাকে যে দুটিকে দুইটি বলিয়া ভানই হয় না। এমন কি চৈতন্য তৎকালে নিজেকে সাক্ষী এবং সাক্ষি-ভাস্য এই ভাবে দুই করিয়া দেখে না। আমাদের জাগ্রৎ অবস্থাতেও এইরূপ। যেমন, সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি। যতক্ষণ তদ্গত হইয়া দেখিতেছি ততক্ষণ বৃক্ষটি আমার জ্ঞেয় এবং আমি তার জ্ঞাতা এই ভাবে অনুভবটির বিভাগ করি না। তখন ঐ বৃক্ষটিই অনুভব। যখন অনুভবটি সম্বন্ধে মনন করি (অর্থাৎ সে সম্বন্ধে কোন judgment হয়) অথবা সে সম্বন্ধে যখন কিছু বলিতে যাই (discourse) তখন অবশ্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানকে আলাদা করিয়া ভাবিতে এবং বলিতে হয়। পুনশ্চ, সূর্য্যে তাহার তেজ এবং অগ্নিতে তাহার দাহিকা শক্তি কি ভাবে রহিয়াছে—ভাবিয়া দেখ। এসব স্থলেও বলিতে গেলে "সূর্য্যের তেজ" অথবা "অগ্নির দাহিকা শক্তি" এই-ভাবে পৃথক্ করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা পৃথক্ কোথায় ও কিভাবে? এই সব দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বুঝিতে পারি যে চানার মধ্যে তার দুইটি বীজের একত্র অবস্থানের চাইতেও আরো সূক্ষ্মতর এক প্রকার সঙ্গ আছে। সেই প্রকার সঙ্গকে আমরা 'আসঙ্গ' নাম দিতেছি। এই 'আসঙ্গে' কি দ্বৈত আছে অথবা নাই এই প্রশ্নের 'হাঁ' অথবা 'না' কোন উত্তরই দেওয়া যায় না। অদ্বৈত এবং দ্বৈতের একটা অব্যক্ত সন্ধির মতো যেন এটা। সন্ধি-রেখার একদিকে দ্বৈত মোটেই নাই, অপরদিকে দ্বৈত দেখা দিতেছে। মাঝখানে এ অবস্থাটিও অবাঙ্মনসগোচর। সন্ধিরেখাটি বা কোথায় টানিতেছি? দেশে? না। কালে? না। বস্তুতে? না। সম্বন্ধে? না, তাও না। কেননা, যেটি সকল সম্বন্ধাতীত (Alogical Absolute),

সেটি সম্বন্ধভাক্ হইতেছেন, সম্বন্ধে 'অবগাহন' করিতেছেন (Logical হইতেছেন), এই পরমাশ্চর্য্য রেখাটি পার হইয়াই। 'আ' এই উপসর্গ, সঙ্গে মর্য্যাদা এবং অভিবিধি এ দুইএরই ইঙ্গিত করিতেছে। এই অবধি অথবা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বৈতের এবং সম্বন্ধের উৎপত্তি হইতেছে, এই একটা ইঙ্গিত। এবং এখান হইতে যাহা কিছু জন্মাদি হইতেছে সে সমস্তই ব্যাপিয়া দ্বৈত সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইটি অপর ইঙ্গিত। অথর্ব্ব বেদের কামসূক্তে যে বস্তু 'কাম' এই নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি সৃষ্টির আদিভূত এই আসঙ্গ।

'সোঽকাময়ত' এই বলিয়া শ্রুতি অসঙ্গ ব্রহ্মে এই আসঙ্গের প্রসঙ্গই করিতে চাহিয়াছেন। এটি অচিন্ত্যভেদাভেদের অচিন্ত্য মূল। এই আসঙ্গের এক রূপ ব্যাসঙ্গ। এই ব্যাসঙ্গ অবস্থায় আত্মা নিজেই নিজের সঙ্গ পাইয়া যেন জাগরূক হয়। জাগরূক হইয়া যেন নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করে—এই তো আমি একাই রহিয়াছি, অপর কেহ বা কিছু তো নাই। এস্থলে আত্মাই স্বয়ং সাক্ষী এবং স্বয়ং সাক্ষি-ভাস্য। 'ব্যাসঙ্গ' এই কথাটির আদিতে যে 'বি' রহিয়াছে, সেটি 'আবিঃ'র 'বি' তো বটেই, তাছাড়া সেটি বিবিক্ত-লক্ষণে যে 'বি' তাই। বিবিক্তলক্ষণ মানে যেটি আপনাকে বিবিক্ত, কিনা, স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছে, অন্য কিছুর সহিত কাবক সম্বন্ধ জড়াইয়া দেখিতেছে না। ব্যাসঙ্গের এই পরিভাষা স্মরণযোগ্য।

তারপর আসঙ্গ হইতে 'অভিষঙ্গ', যার কথা আমরা আগে আলোচনা করিয়াছি, ইহাতে চণকের বীজের দুইটি দানার মত দ্বৈত সম্পুটিতভাবে বিদ্যমান থাকে। এই 'অভিষঙ্গ' হইতে আবার 'অনুষঙ্গ' এবং 'প্রতিষঙ্গ' আসিয়া থাকে। এদের কথা পরে আলোচিত হইবে ॥৩০॥

দ্বৈত পরিস্ফুট হইলে নির্ব্বচনযোগ্য হয়, অন্যথা হয় না। অভিষঙ্গে দ্বৈত পরিস্ফুট নহে। সুতরাং অভিষঙ্গ নির্ব্বচনের অযোগ্য, অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে মায়া বীজ 'হ্রীঁ' বলিয়া জান—যে বীজে হ'কার এবং 'র'কার গর্ভিত হইয়া আছে ॥৩১॥

স্পন্দহীন আকাশের মত 'হ'কার, সম্পন্দ বহ্নির মত 'র'কার। এই 'হ'কার এবং 'র'কার নাদ এবং বিন্দু দ্বারা বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া 'ঈ'কারের দ্বারা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে সম্যক্‌রূপে ঈক্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ 'হ'কারের সঙ্গে নাদ-শক্তি এবং 'র'কারের সহিত বিন্দু-শক্তি সংযুক্ত হইয়া

যেটি নিস্পন্দ সেটিকে সম্পন্দ করিয়া তোলে এবং তাহারই ফলে বিশ্বসৃষ্টিরূপ যে ঈক্ষণ সেটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে ॥৩২॥

বলা বাহুল্য যে মূলে অসঙ্গ অদ্বৈত, যেটি অবাঙ্‌মনসগোচর। তাহাতে অনির্ব্বচনীয় রূপেই আবার 'বহু হইব' এই প্রকার কাম উদিত হইয়া থাকে —যে কাম 'আসঙ্গ' এই নামে অভিহিত হইতেছে ॥৩৩॥

এই 'আসঙ্গ' হইতেছে কাম বীজ 'ক্লীঁ'। এই কামকে আবার লীলারূপে দেখিলে আমরা আর দুইটি বীজ পাই, "শ্রীঁ" এবং "ঐঁ"। লীলার অভিব্যক্তির দুইটি দিক্—একটি হইতেছে অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য, অপরটি হইতেছে অপূর্ব্ব রচনা-সৌষ্ঠব। প্রথমটি মহাসরস্বতী, অপরটি মহালক্ষ্মী। "আসঙ্গ" হইতে "অভিষঙ্গ" এবং "অভিষঙ্গ" হইতে "অনুষঙ্গ" এবং "প্রতিষঙ্গ" হয়, ইহা জানিবে। যে স্থানে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধটি গাঢ় এবং পরস্পরের অনুগত, সে স্থলে 'অনুষঙ্গ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর যে স্থলে পরস্পরের সম্বন্ধ গাঢ় হইয়াও পরস্পরের প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, সে স্থলে 'প্রতিষঙ্গ'। অনেক স্থলে 'অনুষঙ্গ এবং 'প্রতিষঙ্গ' যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। যেমন শিষ্য গুরুর সমীপে যখন কোন মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে, তখন সেই মন্ত্রে শিষ্যে আগ্রহশক্তি এবং গুরুর অনুগ্রহশক্তি অনুষঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিষ্যের নিজের ভিতরে যে সমস্ত বিরোধী সংস্কার রহিয়াছে, সেগুলির শক্তি সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতাও (reaction) সৃষ্টি করিতে থাকে। এইগুলি বন্ধন-সংস্কার, অনাদি ও প্রবল। এগুলিরও ক্রিয়া করিবার একটা নিজস্ব ছন্দঃ আছে। সে ছন্দঃ হইতেছে সাধন সম্বন্ধে বিষচ্ছন্দ ও অরিচ্ছন্দ। শিষ্যের সাধনশক্তির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ গাঢ়, অথচ সেটি অনুগত, অনুকূল নহে; এই প্রকার সম্বন্ধকে 'প্রতিষঙ্গ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'অনুষঙ্গ'টি বলবান্ হইলে এ প্রতিষঙ্গ-নিমিত্ত যে বাধা বা অন্তরায় উপস্থিত হয়, সেটি অশুভের নিমিত্ত না হইয়া শুভের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অর্থাৎ বন্ধন-সংস্কারগুলির বেগ হইতে যে বাধা উপস্থিত হয়, সে বাধা দূর করিবার নিমিত্ত শিষ্যের আগ্রহ বা সাধনশক্তি আরো উদ্দীপিত হইয়া ওঠে এবং সেটি যে পরিমাণে উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, সেই পরিমাণে গুরুর অনুগ্রহ-শক্তিও সজাগ হইয়া তার সহায় এবং সুহৃৎ হইয়া থাকে। এই হেতু 'প্রতিষঙ্গ' মাত্রেই অশুভ নয়, পরিপন্থী নয় ॥৩৪॥

লক্ষ্য কর যে আসঙ্গের যেটি 'স' তাতে 'ব' ফলা নাই 'অভিষঙ্গ' ইত্যাদিতে 'স'কারে 'ব' 'ফলা রহিয়াছে। এই 'ব'টিকে বুঝিতে চেষ্টা কর। 'সঃ' বলিলে সে বুঝায় কিন্তু 'স্ব' বলিলে নিজেকে বুঝায়। প্রথমটিতে সেটিকে আমরা অনেকের ভিতর একটা মাত্র করিয়া দেখিতেছি, তাকে বিশেষভাবে বা গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতেছি না, তার যেটি নিজস্ব বা স্বভাব সেটি সম্বন্ধে আমরা তৎকালে উদাসীন। কিন্তু যখন 'স্ব' বলিলাম, তখন তার নিজস্ব বা স্বভাবই আমাদের অভিনিবেশের বিষয়ীভূত হইল। এইভাবে 'অয়ং' এবং 'স্বয়ং' এই কথা দুইটিকেও ভাবিয়া দেখ। 'আহা' বলিলে একটা বিস্ময় প্রকাশ করি মাত্র, কিন্তু 'স্বাহা' বলিলে প্রাণের সেই মুখ্য ব্যাপারটি বুঝায় যদ্দ্বারা এই বিশ্বযজ্ঞে সর্ব্ববিধ আহুতি অর্পিত হইতেছে। প্রণবের মধ্যে যে 'উ'কার রহিয়াছে, তাঁর সঙ্কোচনে 'ব'কার, সম্প্রসারণে সেটি আবার 'উ'কার। 'ব'কারের দ্বারা এই সঙ্কোচন বৃত্তি সূচিত হয়। আসঙ্গে 'ব'কার নাই, সুতরাং তাতে কোনওরূপ সঙ্কোচন বৃত্তি এখনও দেখা দেয় নাই। অভিষঙ্গাদিতে 'ব'কার আছে, কাজেই এসব ক্ষেত্রে সঙ্কোচনও কোনো না কোনো আকারে ঘটিতেছে। সঙ্কোচনের ফলে যেটি অসীম তাতে সীমা বা গণ্ডী দেখা দেয়। সুতরাং অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তির স্থলে অবচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি দেখা দিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সত্তা অথবা শক্তি অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তিতে রহিয়াছে, ততক্ষণ সেটি আর কিছুকে বিদ্ধ করে না, অথবা অপর কিছুর দ্বারা সেটি বিদ্ধও হয় না। ততক্ষণ সেটি অমৃত ও বজ্র। অসঙ্গ অবস্থায় বেধ ঐকান্তিক নাই। 'আসঙ্গ' অবস্থায় বেধের নৈকটিক সম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটি এখন পর্য্যন্ত বাস্তববৃত্তিতায় স্ফুটক্রিয় হয় নাই। অভিষঙ্গে বেধ প্রাপ্তাবকাশ হয়, অর্থাৎ তখন আর বেধ বা বিদ্ধ হওয়া অথবা বিদ্ধ করার সম্ভাবনা মাত্র নয় ॥৩৫॥

['বেধ' কি বস্তু? 'পাপ্মা বিদ্ধ' 'অসুরবিদ্ধ' ইত্যাদিতে যে বেধ লক্ষিত হইতেছে, সেটি আসলে কি? দুইটি বস্তুর, ধর, ক ও খ এর, পরস্পর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তার ফলে ক'এর সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং ধর্ম্ম যেন 'খ'এর মধ্যে আপনাদের 'প্রবিষ্ট' করিয়া দিতেছে। ক এবং খ দুটি 'বৃত্ত' যেন কেবল স্পর্শমাত্র না করিয়া পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। ফলে, 'ক'এর সত্তাদির 'খ'তে সংক্রমণ এবং 'খ'এর সত্তাদির 'ক'তে সংক্রমণ হইতেছে। বিপরীত

তাড়িতপূর্ণ দুটি মেঘে তড়িতের আদান-প্রদান হইল, তারপর তারা যেন অংশতঃ অথবা সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া এক হইয়া গেল। রাসায়নিক সংযোগাদির স্থলেও অণুগুলির (এমন কি, তাদেরও সূক্ষ্মতর উপাদানগুলির) এই ভাবে পরস্পরের পুরাতন 'ব্যূহভেদ' এবং নূতন 'ব্যূহরচনা' ব্যাপারটি ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। তাছাড়া 'রাসায়নিক চাপ' (Osmotic Pressure) বলিয়া একটা ব্যাপারও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণীর রাজ্যেও এইপ্রকার নূতন ব্যূহসৃষ্টি ব্যাপারটি অহরহঃই ঘটিতেছে। পুংবীজ এবং স্ত্রীবীজের সম্মিলনে যে প্রজনন হয় তা'তো এই বেধেরই ব্যাপার। মানস ক্ষেত্রে এই বেধের দৃষ্টান্ত সহজেই মিলিবে। স্পষ্ট চেতনাতেও যেমন, মগ্ন বা অবচেতনাতেও তেমনি বেধ (Interference, penetration ইত্যাদিরূপে) নিয়তই ঘটিতেছে। সত্ত্বের কাজ হইল ভাব ও সংস্কারগুলিকে (শুদ্ধ ও মলিন উভয়ই) পরস্পর হইতে আলাদা করিয়া 'শুদ্ধ' ভাবে উপস্থিত করা, রজঃ তাহাদিগকে (বক্রগতিতে) পরস্পরের 'ঘাত' এবং 'প্রতিঘাত' দেওয়ানোতে প্রবৃত্তি দেয়। ফলে, বেধ এবং পরস্পরের গ্রন্থি বা 'গাঁঠ' সৃষ্টি হইয়া থাকে। তমঃ সে গাঁঠগুলি আড়ষ্ট করিয়া রাখে, খুলিতে দেয় না।

দুইটি বৃত্তের সাদৃশ্য লইয়া বেধকেও আমরা চারি ভাগে ভাগ করিতে পারি :—(১) স্পর্শবেধ (touching), (২) অবচ্ছেদবেধ (intersecting), (৩) তাদাত্ম্যবেধ (coinciding), এবং (৪) গর্ভিত বা অন্তর্ভাববেধ (falling within)। সর্ব্বক্ষেত্রেই এদের দৃষ্টান্ত মিলিবে। যেমন, ওঙ্কারের ধ্বনি শুনিতেছি। অন্য কোন শব্দ হয় (১) তাকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাইতেছে, নয়তো (২) সে ধ্বনি ছেদ করিতেছে, কিংবা (৩) সেই ধ্বনিতেই মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইতেছে, অথবা (৪) সেই ধ্বনির গর্ভেই যেন স্থান পাইতেছে। শব্দাদির মূলে যে উর্ম্মিভঙ্গী (wave pattern), সেটিরও চতুর্বিধ অবস্থা ঘটিতে পারে। পুনশ্চ, অভিষঙ্গের বেলা যেমন, এ স্থলেও তেমনি 'অনুবেধ' ও প্রতিবেধ' আমরা ভাবিতে পারি। যে বেধের ফলে 'ক' ও 'খ'-এর সত্তাদির পারস্পরিক 'সমৃদ্ধি' (summation and progression) হয়, তাকে 'অনুবেধ' বলিব, আর যার ফলে, পরস্পরের 'কুণ্ঠা ও কার্পণ্য' (detraction and distortion) ঘটে, তাকে 'প্রতিবেধ' বলিব। অনুষঙ্গ এবং প্রতিষঙ্গের বেলা যেমন, এস্থলেও তেমনি অনুবেধ

মাত্রই শ্রেয়স্কর এবং প্রতিবেধ মাত্রই বিপরীত—এটি মনে করিলে ভুল হইবে। যেমন ধর—মন্ত্র জপ। বৃক্ষলতাদির মতো মন্ত্রেরও শৈশব, তারুণ্য এবং জরা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়মেই উপস্থিত হইয়া থাকে। 'শিশু' মন্ত্রের একটা স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য এবং কুণ্ঠা। সাধনের দ্বারা তার (দৌর্ব্বল্যের) বিবৃদ্ধি হইলে শিশু শুধু শিশু রহিবে না, 'মরিয়া' যাইবে। অতএব সাধনের ফলে মন্ত্রের শৈশব-দৌর্ব্বল্যের 'প্রতিবেধ' হওয়াই আবশ্যক, অনুবেধ নহে। মন্ত্রের 'জরা' আসিতেছে বুঝিলেও প্রতিবেধ। পরে, কোনও কোনও সূত্রে তল, লম্ব এবং বেধ এই তিনটি আমাদের সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।]

অসঙ্গে আসঙ্গ দেখা দিলে পর বিশ্বতোমুখ যে আবিঃ সেটি দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু আবিঃ বিশ্বতোমুখ এবং বিশ্বও দ্বৈত ব্যতীত সম্ভবে না, সেই হেতু আবিঃ দেখা দিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্বন্দ্বভাব (Polarity Principle) দেখা দিয়া থাকে। রহস্য ভাষায়, এটি 'মিথুন' অথবা যুগ্ম। এই যুগ্ম তত্ত্বের (Polarity) ফলে 'আবিঃ' আর কেবল 'আবিঃ' রহে না, সেটি হয় 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি'। 'আবিঃ' হইতেছে প্রকাশরূপ এবং 'রাত্রি' হইল নিরোধরূপ। এই নিরোধিকা রাত্রি বেদাদিতে গোপিতা (গুপ্তা) হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বে এই বিকাশ এবং নিরোধশক্তি পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া ক্রিয়া করিতেছে। বিকাশশক্তির ফলে যেটির উদারবৃত্তি হইতেছে, নিরোধশক্তির দ্বারা সেটির আবার সংকোচাদিও ঘটিতেছে। একান্তভাবে উদারবৃত্তির কোন কিছুই হইতেছে না, পক্ষান্তরে, কোনো কিছুই আবার বিশ্বে একান্তভাবে নিরুদ্ধ হইয়া নাই। দেশ সম্বন্ধে, কাল সম্বন্ধে এবং নিমিত্ত সম্বন্ধে এই বিকাশ নিরোধের যে অনুপাত তদ্দ্বারাই বিশ্বের এবং বিশ্বান্তর্গত যাবতীয় বস্তুর অবস্থিতি, পরিস্থিতি নিরূপিত হইতেছে। প্রকাশিকা যেমনধারা আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে তেমন আবার অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে, নিরোধিকাও তেমনিধারা আপনাকে নিরোধ করিতে পারে অথবা অপরকেও নিরোধ করিতে পারে। সুতরাং এটিও স্বনিরোধিকা অথবা অন্য-নিরোধিকা এই ভাবে দ্বিবিধ ॥ ৩৭ ॥

একটা দৃষ্টান্ত লও। যখন "ব্রহ্মাস্মি" এই বোধটি হয়, তখন সেই বোধ

শোকাদি বিভ্রম সমূহকে একান্তভাবে রোধ করিয়া থাকে; আবার যেহেতু এই বোধটি চরম বৃত্তি সুতরাং সেটি উৎপন্ন হইয়াই নিজেকেও রোধ করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমি ব্রহ্মই' এই বৃত্তিটি রহিয়াছে অথবা এবংবিধ অন্য কোনো বৃত্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ আমার ব্রহ্মস্বরূপতা হয় নাই। একান্তভাবে সকল বৃত্তির নিরোধ বা শূন্যতা না হইলে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই পরম প্রাপ্তিটি ঘটে না। "আমি ব্রহ্ম" এইটিকে ব্রহ্মাকারা চরমবৃত্তি বলা হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এটি নয়। অগ্নি যেমন ইন্ধনকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া নিজেও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনিধারা এই ব্রহ্মাকারা চরম বৃত্তিটি নিঃশেষে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়—এই চারিটি ভবেন্ধন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং অস্তমিত হয়। নদী যেমন নদীনাথের সন্ধানে ছুটিয়াছে, ঋজু কুটিল নানা পথ ধরিয়া। যখন সাগরসঙ্গমে আসিয়া নদী উপস্থিত হয় তখন সে সকল বাঁধন হারাইয়া সাগরের উদ্দেশ্যে যেন বলে—"এই তো মহান! তুমিই যে আমি আর আমিই যে তুমি, আমাদের ভেদ কোথায়!" এখনও কিন্তু নদী সাগরের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে হারাইয়া ফেলে নাই। সে অসীম অগাধ গাম্ভীর্য্যের ভিতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলে তখন আর কোনো বৃত্তিই থাকে না, কোনও ভাষাও থাকে না ॥ ৩৮ ॥

আসঙ্গ হইতে রোধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় এবং অভিষঙ্গ হইতে বেধ আসিয়া থাকে। রোধ এবং বেধ উভয়ই যে দুই প্রকার তাহা আমরা দেখিয়াছি। একপ্রকারকে বলা যায় স্ব-প্রতিযোগিক। এস্থলে রোধ অথবা বেধ নিজেই নিজেকে প্রতিযোগী অথবা বিষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ রোধ আপনাকেই রুদ্ধ করে এবং বেধ আপনাকেই বিদ্ধ করে। অপর প্রকারটি হইতেছে, ইতর-প্রতিযোগিক। এস্থলে রোধ অথবা বেধ অন্য কোনো বস্তুকে বিষয় করে। যেমনধারা মেঘের দ্বারা সূর্য্যের রশ্মি রোধ হইল অথবা শরের দ্বারা কোনো লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। রোধ এবং বেধে এ দ্বিবিধ বৃত্তি আছে বলিয়া কোথাও কোথাও রোধও বোধের হেতু হইয়া থাকে এবং বেধের দ্বারাও বিবেক এবং কৈবল্য সম্ভাবিত হইতে পারে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত আমরা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান নাশের স্থলে দেখিয়াছি। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই। যেমন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ দুঃখ ইত্যাদি পুরুষে অধ্যস্ত হওয়ার ফলে পুরুষ

আপনাকেই সুখী দুঃখী এই প্রকার মনে করিতেছে। আবার পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া জড় যেটি দৃশ্য সেটিকে যেন দ্রষ্টার মতন চেতন করিয়া দেখাইতেছে। আমাদের লক্ষণ অনুসারে প্রকৃতি পুরুষের এবংবিধ সংযোগকে বেধ বলিতে হয়। সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা এই বেধ যদি আপনাকেই বিদ্ধ করিতে কিংবা নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হয়, তবে তার ফলে বিবেক খ্যাতি হইয়া থাকে এবং সেটি হইলে প্রকৃতি-বিবিক্ত-পুরুষ-সাক্ষাৎকার রূপ কৈবল্য হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ভক্তি সিদ্ধান্তে এই বেধের দৃষ্টান্ত বিশেষ ভাবেতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত অথবা মায়িক। অন্তরঙ্গা শক্তি অপ্রাকৃত এবং নির্ম্মায়িক। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। তটস্থা বলিয়া জীবে তার স্বরূপগত অপ্রাকৃত, নির্ম্মায়িক সত্তা প্রাকৃত ও মায়িক ধর্ম্মের দ্বারা যেন আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। জীব তার অমায়িক শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা মায়ার কবলে যেন হারাইয়া আপনাকে এই প্রাকৃত জড় বিশ্বের সামিল মনে করিতেছে। এইটি হইল মায়িক ও প্রাকৃতের দ্বারা যেটি অমায়িক ও অপ্রাকৃত সেটির 'বেধ'। এই বেধ হইতেই জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য, ভব-বন্ধন-নিমিত্ত ক্লেশ। এই বেধই তাহাকে এক অনাদি অনন্ত প্রাকৃত ধারার মধ্যে পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। তার উদ্ধারের উপায়, এই বেধকেই আবার বিদ্ধ করা। পুনশ্চ, প্রণব ধনুঃ, আত্মা শর ইত্যাদি শ্রুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মতো বেধের বস্তু ন'ন্, তবে সেটিকে লক্ষ্য করিয়া শরদ্বারা কিরূপে বিদ্ধ করিব? বলা বাহুল্য, ব্রহ্ম স্বয়ং বেধযোগ্য না হইলেও তাঁর যেটি অচিন্ত্য মায়াশক্তি যদ্দ্বারা "ত্বং" পদার্থের এবং "তৎ" পদার্থের ভেদ কল্পিত হইতেছে, সেটি, কিনা ভেদটি, অবশ্যই বেধযোগ্য বটে। আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও "ত্বং" পদার্থরূপে আপনাকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ ইত্যাদি মনে করিতেছে এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদি। ব্রহ্মের বেলায় তার এইরূপ মনে করাটি অবশ্য তার আপন কল্পনা নয়। শুদ্ধ, অক্ষর ব্রহ্ম আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্‌রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন; এটি যদি কল্পনাই হয় তা হইলেও সেটি জীবের কল্পনা নয়, ব্রহ্মেরই স্ব-কল্পনা। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ'। এই কল্পনার দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম আপন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়াও যেন

লুকাইয়াছেন। যেমন আবার ভক্তি সিদ্ধান্তে ভগবত্তার যেটি স্বরূপ মাধুর্য্য সেটি ঐশ্বর্য্যের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। "রসো বৈ সঃ" এই পরম অনুভূতির দ্বারা ঐশ্বর্য্যের ভিতরে মাধুর্য্যকে পাইতে এবং আস্বাদন করিতে হয়। রসানুগ সাধন দ্বারাই এটি সম্ভবপর। সুতরাং ব্রহ্মের অথবা "তং" পদার্থের এবংবিধ এক অনির্ব্বচনীয় 'বেধ' রহিয়াছে। জীবের পক্ষে তার স্বরূপের বেধ হইতেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান জন্য। ব্রহ্ম অথবা ভগবত্তার সঙ্গে জীবের যেটি প্রকৃত সম্বন্ধ তার অভান হইতেছে এই অজ্ঞান নিবন্ধন। এই বেধটিকে বিদ্ধ করিতে হইবে—সেইটি হইল "ত্বং" পদার্থের শোধন। আবার ব্রহ্মের যেটি আপন 'আবরণ' (যেমন অন্তরঙ্গ রসাশ্রিত সাধনেও বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য) সেটিকেও বেধ করিতে হইবে—ইহাই হইল "তং" পদার্থের শোধন। এই দ্বিবিধ শোধন হইলে বেধ' আপনিই বিদ্ধ হইয়া যায় এবং "আত্মা" রূপ শর "প্রণব" রূপ ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যটিকে বেধ করে, এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া যায় ॥৩৯॥

ছন্দঃ যদি ব্যাজ দ্বারা বিদ্ধ হয় তবে সেটি ঋজুগতি না হইয়া বক্রগতি হইয়া থাকে। ব্যাজের এবং বিঘ্নের দ্বারা বিদ্ধ না হইলে ছন্দঃ হয় বজ্রসত্ত্ব, বজ্রায়ুধ এবং বজ্রবর্ম্ম। সুতরাং সে ছন্দকে (যেমন কিরাত-বেশী পশুপতিকে) অন্য কিছু বেধ করিতে পারে না, অথচ সে স্বয়ং রোধজন্য সকল বাধা বেধ করিতে সমর্থ হয় ॥৪০॥

বেধরূপ মূষিককে অন্বেষণ করিয়া একটি সর্প বক্রগতিতে চলিতেছে। একটি বর্হী, কিনা, ময়ূর, সর্পটিকে বাধা দিতেছে। দেব সেনাপতি স্কন্দ এই ছন্দোগ ময়ূরটিকে আপনার বাহন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোনরূপ অশুভ-বেধ দূরীকরণের জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করি, সে উপায় যদি ঋজু না হইয়া বক্র হয় তবে সেটি হেয় বেধটি অপেক্ষাও গুরুতর অশুভের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যেমনধারা মূষিককে বধ করিয়া সর্প যদি মূষিকের গর্ত্তে বাস করিতে থাকে তবে সেটা আরো ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য দেখিতে হইবে যাহাতে অশুভ নিবৃত্তির উপায়টি নিজে বৃহত্তর অশুভের সম্ভাবনা না ঘটায়। যদি ব্যাজবিদ্ধ হইয়া অবলম্বিত উপায়টি বক্র এবং কুটিল হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্যাজ-ব্যাল উপস্থিত হয়, তবে সেটিকে পরিহার অথবা সংশোধন করিবার উপায় কি? বলা বাহুল্য ছন্দকে আশ্রয়

করাই হইল সেই উপায়। ছন্দের প্রতীক হইল বর্হী, যার বর্হকে নিখিল ছন্দের পরম মধুরিমা মূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপন চূড়ায় বাঁধিয়াছেন। এই বর্হী হইতেছে ছন্দোগ, কিনা, ছন্দই ইহার গতি, ছন্দ-ছাড়া হইয়া ইহার গতি হয়না। সুরসেনাপতি স্কন্দ এই ছন্দোগটিকেই আপন বাহন করিয়াছেন এই জন্য যে সুরের দ্বারা অ-সুরের জয়টি ছন্দের সাহায্যেই হওয়া সম্ভবে। জীবের মন বিষয়বিদ্ধ, সুতরাং 'রসো বৈ সঃ' যে ভগবান্ তাঁতে বিমুখ। ভগবানের স্মরণ, নামকীর্ত্তনাদি (জপ) হইল এই বেধ নিরাকরণের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অবলম্বিত উপায়টি যদি ব্যাজ (কিনা, কৈতব কাপট্য কৌটিল্য) দ্বারা বিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যাজ-ব্যাল হয় তবে সেটি বর্হী না হইয়া উরগ (অর্থাৎ বিষয়-বিষের বর্দ্ধক) হইতে পারে। বিষয়াসক্তির বেধ নিরাকরণের প্রকৃষ্ট উপায় ঋজু এবং নির্ম্মল ভগবদাসক্তি—ভগবানে রুচি, রতি, প্রীতি, প্রেম। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-লালসারূপ কামকেও জয় করার প্রকৃষ্ট উপায় সেটিকে 'ভস্ম' করার চেষ্টা করা (Elimination) নহে, কিন্তু যিনি স্বয়ং 'মন্মথ-মন্মথ' তদীয় কামে 'বিবর্ত্তিত' (with the 'sign' completely changed) করিয়া নেওয়া (Sublimation)। তথাপি কোনও প্রতীক (যথা প্রাকৃত নাগর অথবা পরকীয়াভাব ইত্যাদি) আশ্রয়ে এই 'পাঁচের পিঠে শূন্য' দেওয়ার সাধনটি করিতে যাইয়া ব্যাজ-ব্যাল বিদ্ধ হইয়া মহাপরাধে নিপতিত হ'বার ভয় খুবই আছে। অতএব সাধু সাবধান্॥৪১॥

১০। বিঘ্নবিদ্ধস্য ছদিত্বম্॥

দৈশিকাদি-বিঘ্নজালৈরাচ্ছাদয়তি ছন্দসম্।
চলতা-স্তব্ধতা-ভেদাজ্জায়েতে তে ছদিশ্ছদী ॥৪২॥

১০। বিঘ্নের দ্বারা বিদ্ধ হইলে, সেটি হয় ছদি। (Harmony as Veiler)।

বিঘ্নের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে দৈশিকাদি ভেদে চারি প্রকার বিঘ্ন আছে। এই সকল বিঘ্নজালের দ্বারা ছন্দের যেটি স্বরূপ সেটি যদি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে তবে সেটি ছন্দঃ আর থাকে না, সেটি হয় ছদি। "ছদ্"

ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন। সুতরাং ছদি হইল আচ্ছাদিত ছন্দঃ। আচ্ছাদনে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে সেটি হয় চল স্বভাব এবং তখন তাহাকে বলে ছর্দিঃ (Dynamic Veiler)। আর যদি আচ্ছাদনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে সেটি স্তব্ধ স্বভাব। এরূপ হইলে তাহার নাম হয় বিসর্গবিহীন ছদি (Static Veiler)। একটি ক্ষিপ্ত, অপরটি পঙ্গু। এই উভয়কেই (অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য) বর্জ্জন করিয়া সত্ত্বপ্রধান যে ছন্দঃ—যে ছন্দঃ ধীর অথচ উদাত্ত, উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রমণীয়, ঋজু অথচ উদার, নিরপেক্ষ অথচ দক্ষ, সেইটিকে সমাশ্রয় কর ॥৪২॥

১১। ওজোরাহিত্যে ছন্দত্বম্ ॥

ব্যাজবিঘ্নবিহীনস্য সাংসিদ্ধিকং হি ছন্দসঃ।
ওজস্বিত্বং বজ্রসত্ত্বং বাধাবেধক্ষমং মহৎ ॥৪৩॥
শ্রেয়সে প্রেয়সে ছন্দঃ প্রেয়সেঽন্যস্তু কেবলম্।
স্বৈরচ্ছন্দঃ পরচ্ছন্দঃ স্বচ্ছন্দ ইতি স পুনঃ ॥৪৪॥
প্রণবপুটিতং বীজ মোজস্বভরতাং ব্রজেৎ ॥৪৫॥

১১। ছন্দঃ যদি ওজোরহিত হয়, অর্থাৎ ওজস্বী না হয়, তবে সেটি হয় (বিসর্গ বিহীন) ছন্দ। (Harmony as Pleasure.)

ব্যাল অথবা সর্প হইল ব্যাজ এবং আখু বা মূষিক হইল বিঘ্ন। সারা প্রকৃতির এলাকা ব্যাপিয়া এটি খনন করিতেছে বলিয়া এই মূষিকের নাম আখু (আ+খন্+ডু)। এই ব্যাল এবং আখুকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে যে ছন্দঃ তাহাতে স্বাভাবিক ওজস্বিতা ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে এবং সেটি মহৎ বজ্রসত্ত্ব হয়, তন্নিবন্ধন সর্ব্ববিধ বাধা বেধক্ষম সেটি হইয়া থাকে ॥৪৩॥

এইরূপ যে ছন্দঃ সেটি শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এতদুভয়ই দোহন করিতে সমর্থ; পক্ষান্তরে বিসর্গবিহীন ওজোরহিত যে ছন্দ সেটি কেবল প্রেয়ের নিমিত্তই (agreeable) হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকারের যে ছন্দ সেটি ত্রিবিধ—স্বৈরচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ এবং স্বচ্ছন্দ। অন্য কোন ব্যাপক বা বৃহত্তর ছন্দের শাসন

না মানিয়া যে ছন্দ উচ্ছৃঙ্খল গতি হয়, তাহাকে বলে স্বৈরচ্ছন্দ। ফলে নিয়মানুগতার অভাব হয়। অপরের দ্বারা বাধ্য যে ছন্দ, সুতরাং যে ছন্দে আনন্দ এবং লীলার কোন লেশ নাই, তাকে বলে পরচ্ছন্দ। ফলে, স্বচ্ছন্দানুগতার অভাব হয়। স্বৈরগতি না হইয়া অথবা অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়া যে ছন্দটি স্বভাবে থাকে অথচ আপনার ওজস্বিতা হারাইয়া ফেলে, তাহাকে বলে স্বচ্ছন্দ। ফলে, বলিষ্ঠছন্দানুগতার অভাব হয়। এক্ষেত্রে যথার্থ যেটি ছন্দঃ তাহার আকৃতির ভ্রংশ অথবা বিকার হয় নাই বটে, কিন্তু সেটি যেন জড়তা প্রাপ্ত হইয়া আড়ষ্টবৎ হইয়াছে, কাজেই প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি বলে "আমি স্বচ্ছন্দে আছি"। এ স্থলে "স্বচ্ছন্দ" কথাটায় বুঝিতে হইবে যে বিশেষ কোন ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট সে ব্যক্তির তৎকালে নাই। কিন্তু যথার্থ স্ব বা আত্মার ছন্দঃ হইলে সেটি আর 'নির্জ্জীব ঢেঁড়া সাপের' মতন একটা কিছু হইতে পারে না। কূপমণ্ডূকের স্বচ্ছন্দবৃত্তি রসায়ন হয় না। আত্মা যেরূপ বলহীনের দ্বারা লভ্য হয়েন না, তদ্রূপ আত্মার যেটি নিজস্ব ছন্দঃ সেটিও কখনও বলহীন হয় না। সে ছন্দে যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি হন স্বরাট্, আত্মরাট্। কোন বীজ মন্ত্রের আশ্রয়ে জপাদি সাধন করিতে গিয়া ওজোবিহীন ছন্দ এবং তার এই তিনটি রূপই আমাদের পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। স্বৈরচ্ছন্দে কিংবা পরচ্ছন্দে জপ হইলে সে জপ অক্ষেমঙ্কর, এমন কি ভয়ঙ্করও হইয়া থাকে; জপটি স্বচ্ছন্দে চলিতেছে এটি মনে করিয়াও আবার নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। দেখিতে হইবে সেখানে ছন্দটি ওজস্বী অথবা ওজোবিহীন, তার নিজের বীর্য্য বা 'রোখ্'টি সে বজায় রাখিয়াছে, অথবা রাখে নাই। যে বীজে বীর্য্য রহিয়াছে সে বীজের দ্বারা মহাশৈলোৎপাটনও সম্ভব হইতে পারে। লঙ্কাধীশ দশাননের বীর্য্য ছিল, তাই সে সাক্ষাৎ কৈলাসও উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিল। জপ তার ওজোগুণ হারাইতেছে বুঝিলেই ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু ওঙ্কারই প্রাণরূপে এই বিশ্বভুবন সঞ্জীব করিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বে যাহা কিছু স্পন্দিত হইতেছে তাহা প্রাণ স্পন্দনের ফলেই। এজন্য আদিতে এবং অন্তে প্রণব পুটিত করিয়া কোন বীজের অথবা মন্ত্রের জপ হইলে তখন তার ওজস্বিতা ব্যক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি সপ্ত-ব্যাহৃতি জপে যদি প্রণবপুটিত হয়, তবে সে জপ প্রাণবান্ হইয়া অমোদের এই ব্যাজ-বিম্ব-

বিদ্ধ সঙ্কীর্ণ ত্রিপুটি বা ত্রিপুর হইতে মুক্ত করিয়া সপ্ত মহাব্যাহৃতির যে অকুণ্ঠ অক্লিষ্ট, বিরাট অনুভূতি তা'তে উপনীত করিয়া দিতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

১২। উর্জ্জোরাহিত্যে বন্ধত্বম্ ॥

ঊর্জ্জস্বতা হি ধর্ম্মেণ সর্ব্বং বৃদ্ধি-বিকাশভাক্।
সাধিষ্ঠমপি তদ্ধীনং ছন্দোঽপি বন্ধনায়তে ॥৪৬॥

১২। উর্জ্জোরহিত হইলে ছন্দঃ হয় বন্ধ॥ (Enchaining Enslaving Harmony)

উর্জ্জস্বতা এই ধর্ম্মটি আছে বলিয়াই সকল পদার্থের বিশেষরূপে বৃদ্ধি এবং বিকাশ হইয়া থাকে, সে ধর্ম্মটি না থাকিলে হয় না। উর্দ্ধগ যে রজঃ, তাহাই হইতেছে উর্জ্জঃ। চলস্বভাব রজোগুণ যখনই নিম্নাভিমুখ না হইয়া উর্দ্ধাভিমুখ হয়, তখন সেটি হয় উর্জ্জঃ। তখন সেটি প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের সাধক হইয়া থাকে, বাধক হয় না। এই উর্জ্জের অভাব হইলে শ্রেষ্ঠ ছন্দও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। কল্পবৃক্ষেরও একটা বীজ যদি আমরা রোপন করি, কিন্তু সে বীজে যদি উর্জ্জের অভাব ঘটে, তবে সেটি কল্পবীজই রহিয়া যাইবে, তাহা হইতে বাস্তব অঙ্কুরোদ্গমাদি হইবে না। উর্জ্জঃ হইতেছে—বারাহী শক্তি, যে শক্তিদ্বারা অবনত অথবা নিমজ্জিত সত্তা উন্নীত এবং উত্তোলিত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা পদার্থের Energy Level উপচিত, বর্দ্ধিত হয়। কোন একটি বীজ হইতে যখন অঙ্কুর, প্ররোহ এবং পাদপের উৎপত্তি হয়, তখন আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই কোন্ এক রহস্য শক্তি যেন পাদপের অবয়বের উপাদান সমূহ এবং রস-ধারা মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে বহন করিয়া দিতেছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকেই। এই রহস্য শক্তি—উর্জ্জঃ। অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট কোন্ বিশেষ সাধনের সাধিষ্ঠ বিদ্যা পাইলাম এবং তার উপনিষৎও শুনিলাম। কিন্তু যদি শ্রদ্ধাবীর্য্যের অভাব আমার থাকে, তবে দেখিব পূর্ব্বোক্ত উর্জ্জের অভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং সে বিদ্যা আমার অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের উপায় না হইয়া প্রকারান্তরে বন্ধনেরই কারণ হইতেছে। শ্রদ্ধাবীর্য্যহীন সাধন—এইভাবে

একটা বন্ধন-সংস্কার শৃঙ্খলে পরিণত হইতে পারে। কোন না কোন প্রকার সাধনের প্যাঁচানো বাঁধনে, কোন না কোন 'বিদ্যা' অথবা 'অনুষ্ঠানে'র 'ঘানিগাছে' বদ্ধ অনেকেই আমরা আজীবন ঘুরিয়াই মরিতেছি। এই প্রকার বিদ্যা, বীর্য্য অথবা রস অথবা অমৃত লাভের হেতু হয় না ॥ ৪৬ ॥

১৩। বর্চ্চোরাহিত্যে তস্যান্ধ্যম্ ॥

আদাবন্তেচ মধ্যে চ কৃৎস্না সংপৃক্তশৃঙ্খলা।
ক্রান্তদৃষ্ট্যা যতো দৃষ্টা তচ্ছন্দো জায়তে কবিঃ ॥৪৭॥
ঋতস্যাধ্বনি পান্থো যঃ পাথেয়দীপবর্জ্জিতঃ।
অন্ধং তমো বিশত্যেব ছন্দঃশৃঙ্খলচালিতঃ ॥৪৮॥

১৩। বর্চ্চোরহিত হইলে ছন্দ হয় অন্ধ ॥
(Harmony as Brute Blind Law)

পুরাণে অন্ধকাসুরের উপাখ্যান আছে। এই অসুরের প্রাদুর্ভাব হইলে "জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত"—এই জগৎই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেরূপ হইলে বিশ্বে দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন বলিয়া কিছু থাকে না। মহাদেব এই দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মহাদেবের এক নাম 'অন্ধকারি'। মহাদেবের ত্রিশূলে প্রণবের তিনটি মাত্রায় এই ত্রিবিধ দৃক্‌শক্তির সন্নিবেশ রহিয়াছে। পুরাণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে অন্ধকাসুরের একটি তনয়, তার নাম 'আবি'। লক্ষ্য কর যে এই আবি বিসর্গবিহীন, আবিঃ, সুতরাং সে আবিতে জ্যোতিঃ, ওজঃ এবং বর্চ্চের অভাব। এখন বিচার করিয়া দেখ, বিশ্বে যে ছন্দঃ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, এই বিশ্বই যে ছন্দের ব্যক্ত বিগ্রহ, সে ছন্দঃ কিরূপ? সেটি কি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্? চক্ষুষ্মান্ হইলে সেটি নিজেকেও দেখিতে পায় এবং নিজের অভিব্যক্ত যে বিশ্ব তাকেও সে দেখিতে পায়। যদি সেটি অন্ধ হয় তবে সে এই উভয় সম্বন্ধেই অন্ধ। কোন্ কোন মতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতে, এই বিশ্ব ছন্দের অভিব্যক্তি এবং ছন্দের দ্বারা শাসিত বটে, কিন্তু সে ছন্দ অন্ধ, সে আপনাকেও দেখে না, আর এই অপরূপ বিশ্বকেও দেখে না। তার অভিব্যক্ত এই বিশ্বে যেখানে একটু-

খানি চৈতন্যের আলো ফুটিয়াছে সেইখানেই সেই আলোর সাহায্যে সে নিজে প্রকাশিত হইতেছে এবং তার অপরূপ রচনাটিও প্রকাশিত হইতেছে। যেখানে মস্তকমণিপ্রভাপ্রবর্ত্তিত সে দীপটি নাই অথবা যেখানে সে দীপের আলো পৌছায় না, সেখানে অন্ধতমিস্রা ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান নাই। একটা জড় পরমাণুর ভিতরে যে অপূর্ব্ব ছন্দ বিরাজ করিতেছে অথবা এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে যে ছন্দের সুসমঞ্জস শাসন দেখা যাইতেছে, সেটি দেখিতেছে কে? আবার ধর যে কোন এক প্রাণীদেহের অপূর্ব্ব গঠন এবং গতিকৌশল! মানুষ ছাড়া এই গঠন এবং গতিকৌশলের বেত্তা এবং বোদ্ধা অপর কেহ কি আছে? পাদপ কি নিজেই জানে কি বিচিত্র ছন্দে তার বিকাশ ও পরিণতিটি ঘটিতেছে? জড়বিজ্ঞান এ প্রশ্নসমূহের "হাঁ" উত্তর দিতে এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে—অভিব্যক্তির কোন এক বিশেষ স্তরে উঠিয়াই বিশ্বছন্দঃ যেন আলোর মুখ দেখিতে পায়, আত্মসংবিৎ লাভ করে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে জগতের আধাররূপে এবং প্রশাসনরূপে যে মহাছন্দঃ রহিয়াছে, সেটি চেতনছন্দঃ নয়, আনন্দছন্দঃ ও সেটি নয়, প্রাণচ্ছন্দঃ ও নয়। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনের মধ্যে সতের সন্ধান সেটি দেয় অথবা দিতে চায় বটে, কিন্তু চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান সেটি দেয় না। চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান দেয় না বলিয়া সেটি ছন্দঃ হইয়াও একটা বিরাট জড়শৃঙ্খল মাত্র। এইরূপ ছন্দকে অন্ধকাসুরের তনয় বিসর্গবিহীন 'আবি' বলিলে চলে। কেননা, প্রাণ, চৈতন্য এবং আনন্দ মূলে রহিলেই সর্ব্বত্র 'জ্যোতিঃ,' ওজঃ এবং বর্চ্চঃ সম্ভাবিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। সূর্য্যের বা বহ্নির জ্যোতিঃ আছে আমরা ভাবি বটে, কিন্তু সে জ্যোতিঃ তাদের আপন জ্যোতিঃ নয়। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—চৈতন্য ব্যতীত জ্যোতিঃ অথবা প্রকাশ কথাটাই নিরর্থক।

পক্ষান্তরে যে ছন্দ ক্রান্তদর্শী সে ছন্দ কবি। এই বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তে পরস্পর-সুষম সম্পর্কে যে অপূর্ব্ব ঘটক-ঘটিত-ঘটনা শৃঙ্খলাটি রহিয়াছে দেখিতেছি, সেইটিকে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় যে, তাকে বলে ক্রান্তদর্শী। সকল ভূত পদার্থই অব্যক্তাদি এবং অব্যক্তনিধন, কেবলমাত্র ব্যক্ত-মধ্য। জন্ম এবং মৃত্যুর যবনিকা সরাইয়া কোন কিছুরই সমগ্র চিত্রটি আমরা দেখিতে পাই না; যেটুকু দেখিতে পাই সেটুকুও আংশিক, খণ্ডিত,

কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিতভাবে। এরূপ দর্শনকে ক্রান্তদর্শন বলে না। যে ছন্দঃ কবি তার দর্শনে এবংপ্রকার কুণ্ঠা এবং কার্পণ্য নাই।

সুতরাং ছন্দকে দুই ভাবে দেখিতে পারি। আবি ও কবি। যদি আবির আশ্রয় করিয়া চলি তবে ঋতের সাধনে চলিতে গিয়া আমরা পথের প্রদীপ সাথে তো লইলাম না, সুতরাং অন্ধকাসুরের তনয় যে 'আবি' তার বজ্রনিগড়ে বদ্ধ হইয়া অমরমী-অদরদী-যন্ত্রতাড়িত হইয়া ঘোর তমিস্রার মাঝারেই পতিত হইতে চলিলাম ॥৪৭ ৪৮॥

১৪। তেজোরাহিত্যে মান্দ্যম্ ॥

সমারম্ভক-দৌর্ব্বল্যাৎ সমবায়-বিলম্বনাৎ।
সহায়সমূহাভাবাদ্ বৈলক্ষ্যস্য ব্যপাশ্রয়াৎ ॥৪৯॥
প্রতিবন্ধকবাহুল্যাৎ প্রতিরোধস্য স্বপাটবাৎ।
তেজোমান্দ্যঞ্চ কল্প্যেত সমাপকপরাভবাৎ ॥৫০॥

১৪। তেজোরহিত ছন্দকে বলে মন্দ ॥
(ছন্দোমান্দ্য—Insufficient, Ineffectual Harmony)

ছন্দের মান্দ্য, কিনা, মন্দ হওয়ার কারণগুলি অতঃপর নিরূপিত হইতেছে। ক্রিয়ামাত্রেরই কতকগুলি হেতুর অপেক্ষা থাকে। অন্য হেতুগুলি রহিয়াছে কিন্তু যে হেতুটি না রহিলে ক্রিয়াটির আরম্ভ হয় না, সেই হেতুটিকে আরম্ভক হেতু বলা যায়। ক্রিয়োৎপত্তির পূর্ব্বে যে বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকে সেটির নিবৃত্তি হয় এই সমারম্ভকের দ্বারা। যেমন একটি কাঁচের পাত্রে দুইটি গ্যাস কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু তাদের রাসায়নিক মিশ্রণটি ঘটিতেছে না। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে সে মিশ্রণটি ঘটিতে পারে বটে কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক সে পরিমাণে যদি প্রযুক্ত না হয় তবে মিশ্রণটি ঘটিবে না। এ স্থলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ রাসায়নিক মিশ্রণের আরম্ভক বটে কিন্তু তার দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন মিশ্রণটি ঘটিতে পারিল না। জপাদি সাধনের বেলায় সাধকের শ্রদ্ধা বা আগ্রহশক্তি হইল সমারম্ভক হেতু। এটির দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, অর্থাৎ শ্রদ্ধা-বীর্য্য, ভাব-ভক্তি না

আসিলে, জপাদি ক্রিয়া তার অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না। অতএব দেখিতেছি যে ছন্দের মান্দ্যের একটি কারণ হইল **সমারম্ভক দৌর্ব্বল্য**।

দ্বিতীয় কারণ হইল সমবায় বিলম্বন। সমারম্ভক হেতুটি বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু অপরাপর হেতুগুলির সমবায় বা সমাযোগ ঘটে নাই বা ঘটিতে বিলম্ব হইতেছে। যেমন পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক দৃষ্টান্তে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ উপযুক্ত ভাবেই ঘটিতেছে, কিন্তু যাদের উপর সে শক্তির প্রয়োগ হইবে সেগুলি যথানুরূপভাবে সমবেত হইয়া নাই। এই ক্ষেত্রে অভীষ্ট মিশ্রণটি ঘটিবে না। সাধনের বেলাতেও সাধকের আগ্রহের প্রাবল্য সত্ত্বেও যদি বিদ্যা এবং উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) উপযুক্তভাবে উপস্থিত না থাকে অথবা সেরূপ উপস্থিতিতে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে অভীষ্ট ফলটি মিলিবে না। অতএব সমবায় বিলম্বন হইল ছন্দের মান্দ্যের দ্বিতীয় কারণ।

প্রত্যেক ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ কারণগুলি ব্যতীত কতগুলি সহকারি কারণও বিদ্যমান থাকে, যেমনধারা বীজের বিকাশে আলোক বাতাস এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environmental conditions)। জপাদি সাধনে সাক্ষাৎ কারণ সাধকের আপন বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ এবং ভগবানের অনুগ্রহশক্তি—যেটি গুরুশক্তিরূপে শিষ্যের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ কারণগুলি ব্যতীতও অপর কতকগুলি সহকারি কারণেরও অপেক্ষা থাকে—যথা দেশকালাদির অনুকূলতা,—সংশয়স্থলে ইতিকর্ত্তব্যনিরূপণের নিমিত্ত উপযুক্ত সঙ্গ এবং উপদেশ লাভ, ইত্যাদি। এই সহায়ক হেতুগুলি যদি যথেষ্টভাবে বিদ্যমান না থাকে অথবা তাদের যেটি "সমূহ" সেটির অভাব ঘটে, তাহা হইলে ছন্দের মান্দ্য ঘটিবে। "সমূহ" এই কথাটি কেবলমাত্র সমষ্টি অর্থে গ্রহণ করিলে হইবে না। 'সম্' কিনা, সম্যক্ এবং সঙ্গতভাবে যে "উহ" কিনা, চেষ্টা তাহাকে বলে 'সমূহ'। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে শুনিতে পাই— "সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্" ইত্যাদি। এ স্থলে 'সম্' এই উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া শ্রুতি কেবলমাত্র মিশ্রণ অথবা মিলিত হওয়ার কথাই বলেন নাই, কিন্তু কোনও মহান্ লক্ষ্যের উদ্দেশে আমাদের বাক্য, মন, এবং ক্রিয়াদিকে ছন্দোবদ্ধ এবং সংহতভাবে শক্তিমান্ করিয়া তোলার কথাই বলিয়াছেন। সেরূপভাবে শক্তিমান্ হইলে তাহারা হয় 'সমর্থ' এবং যে পারস্পরিক ব্যবস্থা অথবা বিন্যাসের ফলে সেই ফলটি লাভ হয় তাহাকে বলে "সমূহ"। বিজ্ঞানের

একটা দৃষ্টান্ত লও। প্রাণে যেটি মূল বস্তু বা উপাদান তার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রোটোপ্লাজম্—Protoplasm। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই পদার্থটির মূল উপাদানগুলি এবং তাদের মিশ্রণের অনুপাত আমরা জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু যে রহস্য মিশ্রণ অথবা "সমূহের" ফলে সেগুলি প্রাণশক্তির আধার, বাহন এবং যন্ত্র হইয়া থাকে, সেই 'সমূহ'টিকে আমরা এখনও ঠিক ধরিতে পারি নাই। ধরিতে পারিলে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারেও সজীব প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হইতে পারিত। জপাদি সাধনেও এই "সমূহের" অভাব আংশিক অথবা একান্তভাবে ঘটিতে পারে। মন্ত্রের যেগুলি অক্ষর এবং তাদের যেটি মিলন সেটি এই "সমূহ" স্বরূপে পৌছায় না বলিয়াই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে না—যথার্থ মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্য হয় না। "সমূহ" হইলে তবে হয় "সমর্থ"। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমূহ হইল স্বরছন্দাদির ঠিক ঠিক লয়। সুতরাং মন্ত্রাদির সাধন 'সমূহ' সাধন। শ্রদ্ধাবীর্য্য দ্বারা অনুগ্রহ শক্তির প্রসাদ লাভ করতঃ জপাদির এই 'সমূহ' সাধনটি করিতে হয়। কেবলমাত্র আপন চেষ্টাতেই এটা হবার নয়; আগ্রহশক্তি এবং অনুগ্রহশক্তির পূর্ণ সহযোগেই এটা সম্ভাবিত হইয়া থাকে। "সমূহ" যদি স্তব্ধ হয় তবে হয় ব্যূহ এবং যদি ব্যাহত হইয়া পড়ে তবে তার ফল হয় ব্যামোহ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে ছন্দের মান্দ্যের **তৃতীয় কারণ হইতেছে এবংবিধ সমূহের অভাব, স্তব্ধ ব্যূহ অথবা ব্যামোহ।** অতএব জপাদি সাধনে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হয় যাহাতে সাধনটি কোনও স্তব্ধব্যূহে (static habit or complexএ) আবদ্ধ না হয় অথবা কোন ব্যামোহ (morbid functioning or activisationএ) পতিত না হয়। এইরূপ হইতে থাকিলে 'সমূহ'তে—ফিরিবার উপায় আশ্রয় করিতে হয়।

চতুর্থ কারণ—বৈলক্ষ্য ব্যপাশ্রয়। যেটি লক্ষ্য অথবা অভীষ্ট তাহা হইতে ন্যূন, এবং সেটি লাভের যেটি ঋজু ঋত পন্থা তাহাতে আশ্রিত নয়, তাহা হইতে বিচ্যুত, বক্রগ এবং বক্রতাজনক যে লক্ষ্য, তাহাকে বলে বৈলক্ষ্য। যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে যাইয়া তন্নিকটস্থ কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে অগ্রে অভিনিবেশ করিলে বৈলক্ষ্য ঘটিল না; অন্ধকারে মণিপ্রভায় মণিভ্রমে ধাবিত হইলেও বৈলক্ষ্য ঘটিল না; কিন্তু অন্যরূপ করিলে বৈলক্ষ্য ঘটিতে পারে। জপাদি সাধনে যেটি মুখ্য লক্ষ্য সেটির অনুসরণে 'পথিমধ্যে' কোন

কোন লাভ বা প্রাপ্তি ঘটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনও ন্যূন, অবান্তর প্রাপ্তি যদি পরমপ্রাপ্তির পথভ্রষ্ট করিয়া দিতে যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে বৈলক্ষ্য আসিতেছে। কোনও প্রবল প্রারব্ধবশতঃও বৈলক্ষ্য আসিতে পারে—যথা তপস্যায় ভোগেচ্ছা। সমূহের অভাবে যেমনধারা স্তব্ধব্যূহ এবং ব্যামোহ, লক্ষ্যের ব্যতিক্রমেও সেরূপ দ্বিবিধ বৈলক্ষ্য—একটি মূঢ় বৈলক্ষ্য, অপরটি ঘোর বৈলক্ষ্য। মধু ও কৈটভ। বৈলক্ষ্য ব্যপাশ্রয় বর্জ্জনীয়।

পঞ্চম কারণ—প্রতিবন্ধকবাহুল্য—সমারম্ভক হেতুটি গোড়ায় প্রতিবন্ধক দূর করিয়া ক্রিয়াটি চালু করিয়া দেয় বটে, কিন্তু প্রতিবন্ধক 'পদে পদে' উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ক্রিয়ার যেটি গতিরেখা (curve) সেটিকে প্রতিবন্ধকপরম্পরা 'চূর্ণ' (blasting the rocks of resistance) করিয়াই চলিতে হয়। প্রতিবন্ধকও নানাবিধ—(যথা, ব্যাজ-বিঘ্ন, অবরোধ, প্রতিরোধ ইত্যাদি)। যদি প্রতিবন্ধকের বাহুল্য ঘটে তবে বাস্তব গতিবেগ (momentum) কমিয়া থাকে। যদি এই বাস্তব বেগটি না বাড়াইতে পারা যায় তবে মান্দ্য (slowing down) আসিবেই।

ষষ্ঠ কারণ—প্রতিরোধের অপাটব। প্রতিবন্ধকপরম্পরা যেরূপ আসিতেছে তাদের প্রতিরোধ ঠিক সেই ভাবে না হইলে প্রতিবন্ধকের 'গোড়া' ও 'শেষ' রহিয়া যায় এবং এই প্রতিবন্ধকের সংস্কার এবং অবশেষগুলি সম্মিলিতভাবে একটি প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে। প্রতিবন্ধকগুলিরও পরস্পর মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটা প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিবার 'প্রবণতা' আছে। এই প্রবণতা হইতেই হয় রাক্ষসদের, অসুরদের ও দৈত্যদের ব্যূহ অথবা দুর্গ। এই ব্যূহ বা দুর্গ যাহাতে নির্ম্মিত না হইতে পারে, সেদিকে পূর্ব্বাপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, কেননা, সেটি নির্ম্মিত হইলে তাকে ভেদ করা অনেক সময়ে সুর বা দেবপক্ষের অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইজন্য প্রতিবন্ধক দূরীকরণের নিমিত্ত আমাদের যেটি প্রতিরোধ, সেটিকেও সঙ্ঘবদ্ধ, কিনা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ মত—'সমূহ' করিয়া লইতে হইবে। প্রতিরোধের 'সমূহ' দ্বারাই প্রতিবন্ধকের ব্যূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিরোধগুলির এবংবিধ 'সমূহতা'কে (strategic dispositionকে) বলে পাটব। এইটির অভাব হইলে প্রতিবন্ধকের উপচয় নিবন্ধন সাধকের তেজোমান্দ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

সপ্তম কারণ—সমাপকের পরাভব। ক্রিয়ামাত্রের যেমন আরম্ভক আছে তেমনি তার আবার সমাপক আছে। এই সমাপক দ্বারা ক্রিয়ার সমাপ্তি এবং চরিতার্থতা ঘটে। কিন্তু এই সমাপকটি যদি কোন কারণে পরাভূত হইয়া যায় তবে ক্রিয়াটি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষরক্ষা করিতে পারে না। যেমন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাবীর্য্যাদি সহকারে প্রায় শেষ সোপানের কাছাকাছি যাইয়া উপনীত হইলাম, কিন্তু যদি সেখানে দম্ভ বা অভিমান আসিয়া পাইয়া বসে, সুতরাং সাধকের আগ্রহশক্তির এবং ভগবানের অনুগ্রহশক্তির পরিপূর্ণ সম্মিলনটি ঘটিতে না দেয়, তবে সেই সাধনের যেটি সমাপক, সেটির পরাভব ঘটিল। সাধনের চরম ভূমিকাগুলিতে অহমিকার বীজ কোন প্রকারে অঙ্কুরিত হইলে এই মহান্ অনর্থটি ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—আত্মার এই পূর্ণাহুতিটি আর তাঁহাতে সমর্পিত হইতে পারিল না। সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে আবার কাঁচিয়া গেল। মান্দ্যের এইটি শেষ কারণ ॥৪৯-৫০॥

১৫। তেজীয়স্ত্বে পুনরিদ্ধত্বম্ ॥

সমারম্ভকমারভ্য সপ্ত স্থানানি তেজসে।
সমিধ্রূপাণি কল্পধ্বং যানি জাড্যায় চাসতে ॥৫১॥
সপ্তব্যাহৃতিভিস্তানি সমিধ্যন্তে হি বর্হিষি।
সপ্তার্চ্চিষো ভবেয়ুস্তেঽগ্নয়শ্ছন্দাংসি সপ্ত বা ॥৫২॥
সমারম্ভকভূতং ভূঃ সমবায়করং ভুবঃ।
সুবঃ সমূহমূলঞ্চ মহতি লক্ষ্যতা মহঃ ॥৫৩॥
সর্ব্বজনি-নিধানত্বাজ্জনো নিষ্প্রতিবন্ধকঃ।
তেজসোঽভীদ্ধতায়াশ্চ প্রতিরোধশূরং তপঃ ॥৫৪॥
সত্যং সমাপনস্থানং সত্যে নাস্তি পরাভবঃ।
ভূরাদিভিরিতো ধীর জুহুধি সমিধঃ ক্রমাৎ ॥৫৫॥
সমারম্ভং জগত্যা চ সমবায়মনুষ্টুভা।
ত্রিষ্টুভা চ সমূহঞ্চ গাঙ্ক্ত্যা সংলক্ষ্যমেব যৎ ॥৫৬॥

বৃহত্যাহ্ ব্যাজবিপ্লস্ব মুষ্ণিগভীদ্ধতেজসে।
গায়ত্র্যা চ সমাবৃত্ত্যা কল্পয়স্ব সমাপনম্ ॥৫৭॥

১৫। তেজের বিবৃদ্ধি হইলে ছন্দঃ হয় ইদ্ধ। ("Kindled Fire or Flame")

সমারম্ভক দৌর্ব্বল্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপক পরাভব পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত এই সাতটি হইতেছে জাড্য অথবা মান্দ্যের স্থান। এই সাতটি স্থানে ছন্দের যেটি শক্তি তার অপচয় ঘটে। কিন্তু শক্তি বা তেজের উপচয় সাধিত হইবে কি উপায়ে? নিজের মধ্যে যিনি প্রাণব্রহ্মরূপে রহিয়াছেন তাঁহাকে 'বর্হি'— অগ্নিরূপ ভাবনা কর। 'ব্রহ্ম' এবং 'বর্হিঃ' একই 'বৃহ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'বৃহ' ধাতুর আদিতে 'ব কার' বিন্দু এবং অন্তে 'হকার' মহাপ্রাণরূপ নাদ, এবং মধ্যে 'ঋকার' হইতেছে 'ঋতম্'। নাদ বিন্দু মিথুন এবং অভিন্নরূপে 'সত্যম্'। ব্রহ্মে এই ঋতম্ এবং সত্যম্ এক অখণ্ড অভিন্ন আধাররূপে বর্ত্তমান; কিন্তু বর্হিঃতে ঋকার 'ইদ্ধ' (ইকার বিশিষ্ট) হইয়াছে এবং বিসর্গকে (বিশেষভাবে সর্গবৃত্তিকে) আশ্রয় করিয়াছে। এই নিমিত্ত বর্হিঃ হইলেন প্রাণব্রহ্ম। শ্রুতির রহস্যবাণীতে অগ্নি। ক্রিয়া কারক ফল রূপে ইনি 'যজ্ঞ'। যজ্ঞ শব্দের 'য' (বায়ুবীজ) হইল গতি অথবা ক্রিয়া; 'জ' (জনিবীজ—'জন্মাদ্যস্য যতঃ') হইল কারক অর্থাৎ যার সঙ্গে ক্রিয়ার অন্বয় আছে; আর 'ন' (দান) 'জ' কার যোগে 'ঞ' হইয়া হয় 'মখদ' অর্থাৎ, মখ, কিনা, যজ্ঞ যাহা দান করিয়া থাকে; অতএব ফলই বুঝাইল।

প্রাণকে অগ্নিভাবনা করিয়া তাতে অগ্নিহোত্র হবন কর। এ হবনে সমিধ্‌রূপে কল্পনা কর ঐ সপ্তবিধ—মান্দ্য, জাড্যের স্থান বা আশ্রয়কে। অর্থাৎ মান্দ্য বা জড়তার ঐ সাতটি রূপকেই সপ্ত সমিধ্ ভাবনা কর। সপ্ত সমিধ্‌কে যথাক্রমে ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি প্রণব পুটিত সপ্তব্যাহৃতি যোগে হবন করিলে তাহা আর মান্দ্য বা জাড্যের স্থান থাকেনা, তাঁরা 'সমিদ্ধ' কিনা, সম্যক্‌রূপে ইদ্ধ হইয়া উঠে। সম্ × ইন্ধ্ ধাতু × ক্বিপ্ = সমিধ্ বটে, কিন্তু সে অবস্থায় সমিদ্ধ, কিনা উদ্দীপিত হবার সম্ভাবনা মাত্র আছে বিদ্যমান, বস্তুতঃ সমিদ্ধ হইয়া সেটি নাই, প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান রহিয়াছে। সপ্তব্যাহৃতিতে যে সপ্তপ্রকার তেজঃ (পরে নিরূপিত হইয়াছে), বিদ্যমান, সেগুলি প্রণব সহযোগে 'ব্রহ্ম-ভাবতা' (সুতরাং অবাধিত, অকুণ্ঠিত সত্যপ্রকাশ) লাভ করে, সুতরাং তারা,

মান্দ্যের সমিধ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চোদ্বারা সমিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। অতএব প্রাণাত্মার যে শাশ্বত সন্দীপন জ্যোতিঃ (Unkindled Flame) তাহাতেই আহুতি দাও এই জড় সমিধ্। ফলে তাহাও উদ্দীপিত হইবে (Kindled Flame)। এই প্রকার আন্তর অগ্নিতে হবনই হইল সব কিছুকে অগ্নীন্ধন এবং অগ্নিবীর্য্য করিবার উপায়। উপক্রমণীর ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় হবনমন্ত্রের রূপ দেখান হইয়াছে। সেরূপ হইলে ঐ সপ্ত সমিধ হয় সপ্তার্চ্চিঃ—"Seven Flames or Seven-fold Flame." সপ্ত অগ্নি, সপ্তার্চ্চি এবং সপ্তছন্দঃ—এই তিনরূপে প্রাণযাগের ক্রিয়া-কারক-ফলরূপত্ব ভাবনা কর। কারিকার শ্লোকে কোন্ ব্যাহৃতি এবং কোন্ ছন্দের সঙ্গে কোন্ মান্দ্য বা জাড্যরূপ সমিধের বিশেষ উপযোগ সেটি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ভূঃ' এটি মূলতঃ সমারম্ভের সূচক—"হও" এই অনুজ্ঞাটি উহাতে নিহিত। 'ভুবঃ' এটি সমবায় সূচক—যেটি অব্যক্ত (Unmanifest) এবং যেটি অভিব্যক্ত সে-তুটির মাঝে সেতুরূপ ইহা ; ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্তির অবকাশ প্রাপ্তি ঘটে। 'স্বঃ'—হইতেছে পূর্ব্বব্যাখ্যাত সমূহের মূল। 'মহঃ' হইল মহৎ, মহত্তর, মহত্তম প্রকাশ-বিকাশের অভিমুখে প্রবণতার সূচক। 'জনঃ'—যাহা হইতে সমস্ত জাত হইতেছে, তাহা হইতে নিঃসৃত যে মূল আবেগ (Original Urge), কাজেই ইহা নিষ্প্রতিবন্ধকতার সূচক। 'তপঃ'—অভীদ্ধতেজের প্রকর্ষভূমি, সুতরাং সর্ব্ব-ব্যাজবিঘ্ন প্রতিরোধে 'শূর'। শেষে 'সত্যম্'—সর্ব্ববিধ প্রকর্ষের (Ascending Process) সমাপনস্থান, সুতরাং সত্যে আর পরাভব নাই। অতএব হে বীর সাধক, ভূরাদি ব্যাহৃতি যোগে ক্রমান্বয়ে হবন কর। হবন কালে তাদের এই রহস্যসঙ্কেত অবশ্য স্মরণীয়। পরে বিশেষ বিশেষ সূত্রে ব্যাহৃতিসম্পৃক্ত সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইভাবে, সমারম্ভে জগতী, সমবায়ে অনুষ্টুপ্, সমূহে ত্রিষ্টুপ্, সংলক্ষ্যে পঙ্‌ক্তি, অব্যাজবিঘ্নত্বহেতু বৃহতী, অভীদ্ধতেজের নিমিত্ত উষ্ণিক্, এবং সমাপনের নিমিত্ত সমাবৃত্তিমূর্ত্তি গায়ত্রী ছন্দঃকে ভাবনা কর।

এগুলিও এই গ্রন্থে যথাস্থানে সূত্রিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রাণহোমটী 'ক্রিয়াঙ্গ'রূপে প্রদর্শিত হইল বটে কিন্তু ভাবাঙ্গ এবং জ্ঞানাঙ্গ রূপেও প্রদর্শিত হইতে পারে। ভাব ও জ্ঞানেরও সাতটী মান্দ্যের স্থান আছে এবং সেগুলিকেও পূর্ব্বোক্ত ক্রমে সমিধ্ কল্পনা করিয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠা রুচ্যাদি এবং শুভেচ্ছা বিচারণা তনুমানসাদি সহকৃত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা শুদ্ধভাব

এবং শুদ্ধ জ্ঞানাগ্নিতে হবন করিতে হইবে। যথা, শ্রদ্ধাহানিস্থলে—"ওঁ যদিদং ময়ি অশ্রদ্দধানত্বরূপং মান্দ্যং তদহং হব্যং কল্পয়ামি, তচ্চ শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষ ইতি—(শ্রীশ্রীইষ্টদেবতা) শ্রদ্ধারূপোপলক্ষিত-পরম-জ্যোতিষি জুহোমি—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥—ওঁ ভূঃ স্বাহা।" (৫১-৫৭)

ইতি জপসূত্রে

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে পঞ্চদশসূত্রম্।

সমাপ্তোঽয়ং খণ্ডঃ॥

পরিশিষ্ট

চিত্র নং ১
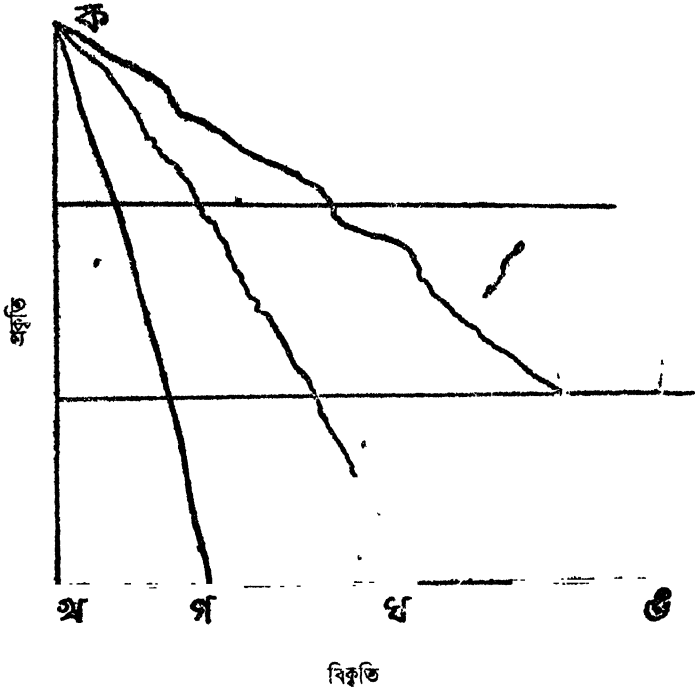
দ্রষ্টব্য :—'কখ' প্রকৃতি নির্দ্দেশক সরল রেখা।

'কগ' রেখার বিকৃতিলেশ নিমিত্ত অল্প বক্রতা আসিয়াছে।

'কঘ', 'কঙ' ইত্যাদিতে বিকৃতির আধিক্য, সুতরাং বক্রতা দু[illegible]তারও আধিক্য

পরিশিষ্ট

চিত্র নং ২
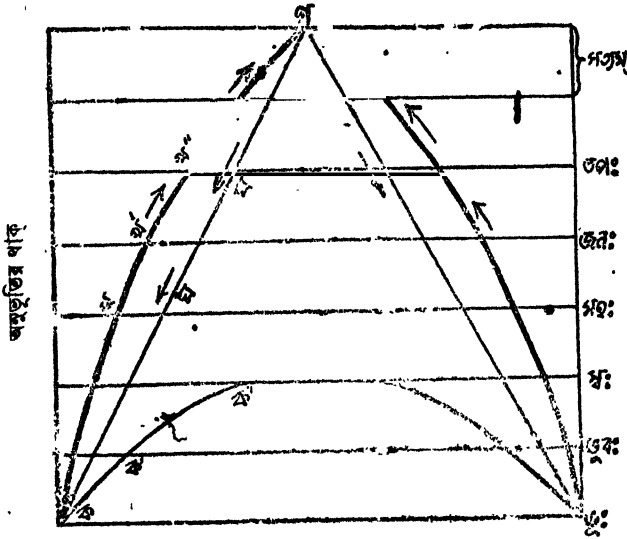
ক সাধারণ অনুভূতি (Normal Experience)

দ্রষ্টব্য :—ক = "এই রূপে গোচর যে সাধারণ অনুভূতি (Normal Experience)

ক′ = "না-এই-না-সেই" রূপে যাহা গোচর সাধারণ অনুভূতিকে আপন অভিব্যক্তির অবকাশ দেয় (Medium of Subconscious Mind)

ক″ = "সেই" রূপে সেটি থাকে গোচর সাধারণ অনুভূতির মূলে; তার মৌলিক আকৃতিরূপ Basic Pattern)—(Root or Ground Consciousness)

খ ... ভূতির 'অতিগ' যেটি হইয়া থাকে, অথচ তার সঙ্গে আনুরূপ্য ... রে (Yogic Experience which transcends the habitual limitations of normalcy, yet generally conforms to its objects')

খ′ = 'খ' এর 'জনি' রূপ (Yogic Experience which goes to the root of things and can, therefore, inform the material)

খ″ = সমৃদ্ধ এবং সমর্থ শক্তিরূপ (তপঃ)—(... Experience which as Power can *transform* and create)

গ = সত্যম্ = The Highest Altitude or Plane of Experience

ঘ = ঋজুরেখায় 'গ' এর নিম্নতলগুলিতে 'অবতরণ' (Descent of the Highest Dynamic Experience on the planes below)